অমল দাশগুপ্ত

মানুষের ঠিকানা

মানুষের ঠিকানা

মানুষের ঠিকানা

অমল দাশগুপ্ত

লেখাপড়া । কলকাতা-১২

লেখাপড়া পরিবর্ধিত সংস্করণ

ভাদ্র ১৩৭৬

প্রকাশক

রাখাল সেন

১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতা-১২

মুদ্রাকর

যুগলকিশোর রায়

শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস

৫২এ, কৈলাস বসু স্ট্রীট

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ শিল্পী

পূর্ণেন্দু পত্রী

দাম দশ টাকা

ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ সেন

ডাঃ শিবেন্দ্রমোহন লাহিড়ী

করকমলেষু

এই লেখকের বিজ্ঞানের বই

মহাকাশের ঠিকানা (তৃতীয় সংস্করণ) ৬·০০

পৃথিবীর ঠিকানা (তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

প্রাণের ইতিবৃত্ত ৫·০০

সূচীপত্র

পিকিং মানুষ (সিনানথ্রপাস)

জাভা মানুষ (পিথিকানথ্রপাস)

অস্ট্রালোপিথেকাস

ক্রো-মাঞঁ মানুষ

নেয়ানডার্থাল মানুষ

হরপ্পার সীলমোহর
(ওপরে) ষাঁড় ॥ শিঙওলা দেবতা (নিচে) বাঘের সঙ্গে লড়াই ॥
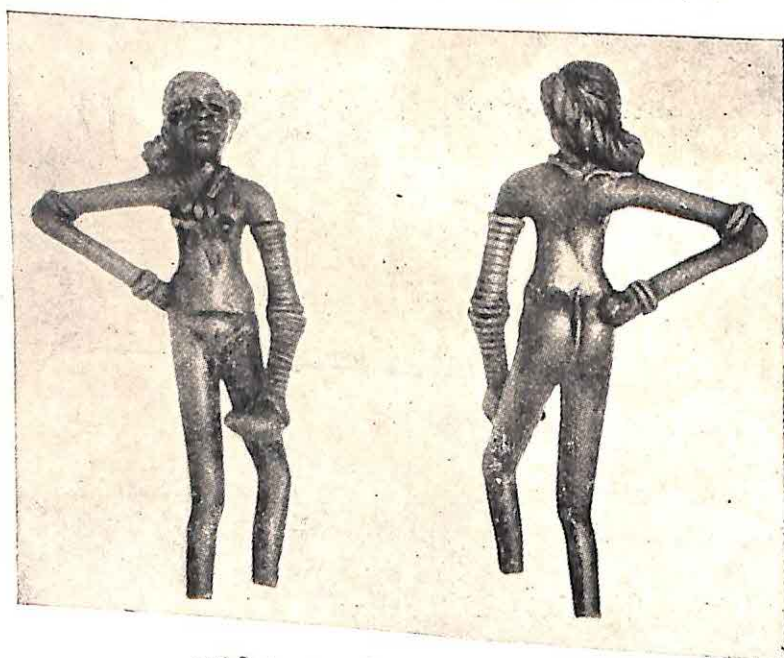
নর্তকী (ব্রোঞ্জ মূর্তি—মোহেন-জো-দড়ো)

ক্রমবিকাশের সূত্র

নাম কি ? নাম—মানুষ।

ধাম ? ধাম—পৃথিবী।

ঠিকানা ?

এ-প্রশ্নের জবাব এককথায় দেওয়া যাবে না। এ-প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যেই এই বই।

পৃথিবীতে মানুষ আছে প্রায় ৩০০ কোটি। তাদের নাম আলাদা, ধাম আলাদা, বংশ আলাদা। কিন্তু যতোই আলাদা হোক, নিয়মছাড়া সৃষ্টিছাড়া কিছু নয়। কেননা মানুষ জন্মায় তার পূর্বপুরুষের পরিচয় নিয়ে। একটু অভিজ্ঞতা থাকলে একজন মানুষের শুধু চেহারা দেখেও বলে দেওয়া যায় যে কোন্ দেশের মানুষ, কোন্ জাতির। তার মুখের ভাষা শুনেও তার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা সম্ভব। এমনকি একজন মানুষের শুধু নামটুকুও তার সম্পর্কে অনেক খবর দিতে পারে। তবে নামের ওপরে খুব বেশি নির্ভর না করাই ভালো। যেমন, ধরা যাক একজন পরিচিত লেখকের নাম : রিচার্ড রাইট। নাম শুনে কি বোঝা যাচ্ছে ইনি মার্কিন না ইংরেজ ? সাদা না কালো ? কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ? এ-নাম আমাদের নিজেদেরই নাম। সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারি, বাঙালী। চেহারা না দেখে ফটো না দেখেও মোটামুটি বাঙালীর

চেহারাগত এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে পারি যা এই নামের অধিকারীর মধ্যেও থাকার কথা।

এমনিভাবে চেহারাগত মিল খুঁজে খুঁজে যদি এগুনো যায় তাহলে দেখা যাবে বাঙালীরা একা নয়, বিচ্ছিন্ন নয়, বাঙালীর চেহারার সঙ্গে অন্য দেশের অন্য জাতির মানুষের চেহারার মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এই মিলগুলো খুঁজে খুঁজে একটা হয়তো নাম দেওয়া হল। তখন আরো একটু ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, বিশেষ একটা নামের মধ্যে বিশেষ একদল মানুষকে কিছুতেই আটকে রাখা যাচ্ছে না। অন্য বিশেষ একটা নামের অন্য বিশেষ একদল মানুষের সঙ্গেও তাদের মিল। এখানেই শেষ নয়। এই বড়ো মাত্রার মিলের ওপরে রয়েছে আরো বড়ো মাত্রার মিল। এমনিভাবে মিলের সঙ্গে মিল টানতে টানতে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে হয় যেখানে সব মানুষের একটিই জাতি— মানবজাতি।

এখানেই কি শেষ? তাকানো যাক জীবজগতের দিকে। পৃথিবীতে জীব রয়েছে অসংখ্য। কত মাছ, কত কীটপতঙ্গ, কত জন্তুজানোয়ার—গুনে শেষ করা যাবে না। মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব সন্দেহ নেই। অন্য যে-কোনো জীবের নাম করা যাক না কেন— বাঘ, সিংহ, হাতি, গণ্ডার, এমনকি গোরিলা, শিম্পাজী, ওরাং-ওটাং জাতীয় বনমানুষ পর্যন্ত—সকলের চেয়ে মানুষ অনেক অনেক বড়ো। তবুও খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে স্বীকার করতে হয় মানুষের সঙ্গে অন্যান্য জীবের মিলও অনেকখানি। মানুষের মাথার খুলি ও কঙ্কাল নিম্নতর জীবের মতো একই ধরনের হাড় দিয়ে তৈরি। তাদের শরীরে একই ধরনের মাংসপেশী, হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহী নালী। এমনকি একই ধরনের মস্তিষ্কের উপাদান। আবার যদি সাধারণভাবে জীবের সঙ্গে তুলনা না করে বিশেষভাবে বনমানুষের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে লক্ষ করা যাবে, মানুষের সঙ্গে বনমানুষের প্রচুর মিল। এত প্রচুর মিল যে মানুষ ও বনমানুষকে জীবজগতের একই

পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। এক্ষেত্রে মানুষকে আর পৃথক করে দেখা চলে না, জীবজগতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হয়।

এমনিতে মনে হতে পারে, মিল যে আছে তা তো চোখেই দেখা যাচ্ছে। অবশ্যই যাচ্ছে। কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত মানুষ এই মিলের ব্যাপারটা স্বীকার করে নিতে পারে নি। কেননা নিম্নতর জীবের সঙ্গে মিল স্বীকার করা মানেই সম্পর্ক স্বীকার করা। বহুকাল পর্যন্ত—সঠিকভাবে বলতে গেলে একশো-দশ বছর আগে পর্যন্ত—মানুষ বিশ্বাস করত যে সৃষ্টির প্রথম দিনটি থেকে মানুষ এই পৃথিবীতে বাস করছে মানুষ হিসেবেই। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগ্রন্থে মানুষের জন্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে মানুষকে ঈশ্বর গড়েছেন নিজের মতো করে। মানুষ তার ধর্মবিশ্বাস থেকে কিছুতেই ভাবতে পারে না যে নিম্নতর জীবদের সঙ্গে তার কোনো রকমের সম্পর্ক আছে।

ভাবা সম্ভবও ছিল না। ভাবতে হলে ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে যেতে হয়। সেজন্যে অনেকখানি জোর পাওয়া দরকার। কিসের জোর? জ্ঞানের জোর, যুক্তির জোর। যাদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা বলা হচ্ছে, খুঁটিয়ে জানতে হয় তাদের সম্পর্কে, খুঁটিয়ে জানতে হয় নিজের সম্পর্কেও। নিজের সম্পর্কে জানতে চাওয়াটা সব মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের শরীরটা যে অলৌকিক কোনো ব্যাপার নয়, বস্তুজগতেরই নিয়মাধীন, এই ধারণাটুকু লাভ করতেও অপেক্ষা করতে হয়েছে অ্যাণ্ড্রিয়া ভেসালিয়াস (১৫১৪-১৫৬৪) ও উইলিয়ম হার্ভি (১৫৭৮-১৬৫৭) * পর্যন্ত। এ-থেকে একথা মনে

---

* অ্যাণ্ড্রিয়া ভেসালিয়াস থেকেই আধুনিক অ্যানাটমি বা শারীরবৃত্তের সূত্রপাত। তাঁর জন্ম ব্রুসেল্‌স্‌-এ, লেখাপড়া ফ্রান্সের লুভ্যাঁ ও পারী বিশ্ববিদ্যালয়ে, অধ্যাপনা ও গবেষণা ইতালীর পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৫৪৩ সালে তাঁর বয়স যখন মাত্র ২৯, প্রকাশিত হয় তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ *De fabrica corporis humani*। তাঁকে আধুনিক অ্যানাটমির জনক বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। উইলিয়ম হার্ভির জন্ম ফোকস্টোনে, লেখাপড়া কেমব্রিজে গন্‌ভিল ও কিস কলেজে ও পরে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, চিকিৎসা-

করবার কোনো কারণ নেই যে যুক্তি-তর্ক বিচার-বিশ্লেষণ সহ কোনো একটি বক্তব্য কেউ উপস্থিত করলেই তা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেওয়া হয়, বিশেষ করে সেই বক্তব্য যদি হয় ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী। বেশি দূরে যাবার দরকার নেই। উইলিয়ম হার্ভির সময়েই লুচিলিও ভানিনি (১৫৮৫-১৬১৯) নামে একজন বিজ্ঞানীকে ধর্মগুরু পোপের বিচারালয়ের রায়ে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। কেন? তিনি বলেছিলেন যে মানুষের জন্মটা অলৌকিক কোনো ব্যাপার নয়, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটি প্রাকৃতিক ঘটনা।

মানুষের বিশ্বাসকে টলাতে না পারলেও মানুষের সঙ্গে অন্যান্য জীবের শরীরের মিল ও অমিল সম্পর্কে আলোচনা অনেক আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল। যীশুখ্রীষ্টেরও জন্মের আগে থেকে। এ-প্রসঙ্গে একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। তিনি হচ্ছেন গ্রীক বিজ্ঞানী অ্যারিস্টট্‌ল (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২)। মানুষের শরীর সম্পর্কে তিনি খুঁটিয়ে জানতে চেষ্টা করেছিলেন ও জীবজগতে মানুষের স্থান নির্দেশ করেছিলেন। জীবজগতের প্রায় পাঁচশোটি নমুনার বর্ণনা তিনি লিখে রেখে গিয়েছেন তাঁর কয়েকটি গ্রন্থে। বিজ্ঞানের যে শাখাকে আমরা বলি জীববিদ্যা, বলতে গেলে তাঁর সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন অ্যারিস্টট্‌ল। আরো একজনের নাম উল্লেখ করা দরকার: ক্লডিয়াস গ্যালেন (১৩০-২০০)। শরীরের গড়নের দিক থেকে মানুষ ও বানরের মধ্যে যে অনেকখানি মিল, সাক্ষ্য প্রমাণসহ তিনি তার বিবরণ দিয়েছিলেন। মানুষের সঙ্গে অন্যান্য জীবের শরীরের মিল ও অমিল কতখানি—তাও খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

ব্যবসায় লণ্ডনে। ১৬২৮ সালে, তাঁর বয়স যখন ৫০, প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *De Motu Cordis et Sanguinis*। মানুষের শরীরে কিভাবে রক্ত-চলাচল করে তার রহস্যটি এই গ্রন্থেই প্রথম পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়।

কথাটা নতুন কিছু নয়। মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর জীবের শারীরগত মিলের ওপরে অনেকেই জোর দিয়ে গিয়েছেন। সুইডেনের বিজ্ঞানী কার্ল লিনিয়াস বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন জীবজগতের শ্রেণীবদ্ধ তালিকা প্রণয়নের জন্যে। তাঁর এই তালিকায় মানুষ ও বনমানুষের স্থান পাশাপাশি। কিন্তু এই লিনিয়াসও বিশ্বাস করতেন যে মানুষের প্রজ্ঞা বা বোধি হচ্ছে একটা অলৌকিক ব্যাপার। এই অলৌকিকত্ব মানলে মানুষের একটা বিশেষ স্থান থেকেই যায়। মানুষের মানুষ হবারও যে একটা ইতিহাস থাকতে পারে, এ ভাবনার কোনো ভিত্তিভূমি তৈরি হয় না।

অবস্থার পরিবর্তন শুরু হল উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে। ততোদিন পৃথিবী মানুষ ও জীবজন্তু সম্পর্কে বহু খবর জানা হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে অ্যান্‌থ্রোপয়েড এপ্‌ বা বনমানুষ সম্পর্কে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী বই লিখেছেন এবং মানুষের সঙ্গে বনমানুষের মিলের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করেছেন। জীবজন্তুর ফসিল বা জীবাশ্ম সম্পর্কেও ব্যাপক খোঁজখবর ও বিচার-বিশ্লেষণ শুরু হয়ে গিয়েছে। জর্জ কুভিএ (১৭৬৯-১৮৩২) ও চার্লস লায়ল (১৭৯৭-১৮৭৫)-এর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে জীব ও জীবাশ্ম সম্পর্কে অনেক নতুন খবর জানা যাচ্ছে।

এই সময় থেকেই অনেককালের একটা পুরনো ধারণা ভেঙে পড়তে শুরু করল। এক কথায় বলা চলে প্রজাতির অপরিবর্তনীয়তা। মানে কি? যে জীব যে-চেহারায় দেখা যাচ্ছে—তেমনটিই ছিল, তেমনটিই থাকবে, এর কোনো হেরফের নেই। কুভিএ ছিলেন এই মতের একজন বড়ো প্রবক্তা। তিনি একা নন, এতদিন পর্যন্ত প্রায় সকলেই। উনিশ শতক শুরু হতেই নানা দেশের জীববিজ্ঞানী মহলে বেশ জোরালো গলায় ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত কথাবার্তা শোনা যেতে লাগল। ক্রমবিকাশ—অর্থাৎ একটু একটু করে ফুটে ওঠা। জীবজগতের চেহারা অনেক বদলেছে এবং বদলাতে বদলাতে আজকের দিনের চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছে। না, দাঁড়িয়েছে

বলা ভুল হল, পৌঁছেছে। কেননা চেহারাটা এখনো বদলাচ্ছে, বদলাবেই। যাঁদের পর্যবেক্ষণে ও গবেষণায় এই মতের সূত্রপাত তাঁদের মধ্যে উনিশ শতকের গোড়ার দিকের সবচেয়ে বিখ্যাত নামটি হচ্ছে জাঁ লামার্ক (১৭৪৪-১৮২৯)। ১৮০৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'প্রাণিবিদ্যার দর্শন'। প্রাণিজগতে ও উদ্ভিদজগতে ক্রমবিকাশের প্রমাণ তিনি উপস্থিত করেন তাঁর এই বিখ্যাত গ্রন্থে। বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করেন।

তাঁর ঘোষণা ছিল স্পষ্ট। আজকের দিনে যেখানে যতো প্রাণী দেখা যাচ্ছে, যে আকারে যে চেহারায়, তাদের পিছনে রয়েছে বিবর্তনের ধাপ, অন্যতর প্রাচীন আকার ও চেহারা। সাহসের সঙ্গে মানুষ সম্পর্কেও একই কথা বললেন। মানুষও বোধ হয় এসেছে কোনো এক ধরনের এপ্ বা নরসদৃশ বানর থেকে। এরা এক সময়ে হয়তো বাধ্য হয়ে গাছ থেকে মাটিতে নেমে এসেছিল (জঙ্গল পাতলা হয়ে যাওয়ার দরুনই হোক, বা অন্য যে-কোনো কারণে), তারপরে দু-পায়ে খাড়া হয়ে চলাফেরা করেছে। এই অভ্যাসের ফলে পরিবর্তন এসেছে তার মেরুদণ্ডে, মাংসপেশীতে, হাতে, পায়ে, চোয়ালে, দাঁতে ও মস্তিষ্কে। দলবদ্ধ জীবন যাপন করতে গিয়ে কথা বলতে শিখেছে। মানুষ যে কি করে মানুষ হল সে-সম্পর্কে অনেক সঠিক কথা লামার্ক-ই প্রথম বলেছিলেন।

তিনি আরো বললেন যে পরিবেশ ও অভ্যাসের প্রভাব থেকে জীব মুক্ত নয়। ফলে সে কিছু বিশেষত্ব অর্জন করে, যা তার সন্তানরাও লাভ করে থাকে। সে-সময়ের পক্ষে এ বড়ো ভয়ানক কথা, একেবারে বৈপ্লবিক কথা। মার্কসবাদের অন্যতম প্রবর্তক ফ্রীডরিখ এঙ্গেলসও ক্রমবিবর্তন তত্ত্বে লামার্কের অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে গিয়েছেন।

লামার্কের অনুগামীর সংখ্যাও সে-সময়ে কম ছিল না। কিন্তু তাঁদের হাতে এত প্রচুর তথ্য ছিল না যার সাহায্যে এই বিবর্তন-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অন্যদিকে এঁদের সকলের প্রবল প্রতিপক্ষ

ছিলেন স্বয়ং জর্জ কুভিএ। যিনি বলতেন যে জীবজগতের চেহারায় কোনো পরিবর্তন নেই, জগতের সৃষ্টিকাল থেকে চিরন্তন একটি চেহারাতেই জীবজগৎকে দেখা যাচ্ছে। কুভিএ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও জীবাশ্মবিদ। তাঁর গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র ছিল অতি ব্যাপক। লামার্ক ও তাঁর অনুগামীরা এই প্রবল প্রতিপক্ষের সামনে দাঁড়াতে পারেন নি।

লামার্কের 'প্রাণিবিদ্যার দর্শন' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০৯ সালে। বিবর্তনতত্ত্বের সূত্রপাত, বলা চলে, এই গ্রন্থ থেকেই। সূত্রপাত কিন্তু প্রতিষ্ঠা নয়। প্রতিষ্ঠার জন্যে সময় লেগেছিল আর মাত্র পঞ্চাশটা বছর! এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিবর্তনবাদের পক্ষ নিয়ে কথা বলার মতো বিজ্ঞানীর কখনো অভাব ঘটে নি। এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে চার্লস লায়লের কথা আরেক বার উল্লেখ করতে হয়। তাঁর ভূতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় জগতের তাবৎ ব্যাপারে নিয়ত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। অবিরাম একটা ভাঙাগড়া। এমনকি পৃথিবীর মাটি সমুদ্র ও আবহাওয়া পর্যন্ত চিরকাল একই রকম নয়। মাটির স্তরে স্তরে যে-সব জীবাশ্ম পাওয়া যাচ্ছে তাতেও জীবজগতের অবিরাম ভাঙাগড়ার সাক্ষ্য। একযুগের জীব অন্যযুগে অস্তিত্বহীন, জলের জীব উঠে আসছে ডাঙায়, ডাঙার জীব আকাশে। আবার একই জাতের জীবের মধ্যে স্থানভেদে ও সময়ভেদে চেহারার কত অদলবদল! কিছুই অপরিবর্তনীয় নয়। কিছুই চিরন্তন নয়।

কিন্তু জৈব ও অজৈব জগতের বিকাশের সূত্রের ভিত্তিতে সমস্ত তথ্যকে যিনি একটা গোটা রূপ দিতে পেরেছিলেন তিনি হচ্ছেন চার্লস ডারউইন। ১৮৫৯ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে ১১০ বছর আগে প্রকাশিত হয় তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'অরিজিন অফ স্পিসিস'। পৃথিবীর মানুষকে সবচেয়ে বেশি ভাবিয়েছে ও আলোড়িত করেছে এমন দুটি বইয়ের নাম যদি উল্লেখ করতে হয় তাহলে একটি হচ্ছে কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল' ও অপরটি এই

'অরিজিন অফ স্পিসিস'। মানুষ কি করে মানুষ হল, মানুষের পূর্বপুরুষ কারা, এককথায় মানুষের ঠিকানার হদিশ পাওয়া যায় ডারউইনের এই গ্রন্থ থেকে।

আমাদের যাত্রাও এই ঠিকানার উদ্দেশে। তার আগে চার্লস ডারউইন সম্পর্কে একটু খবর নেওয়া যাক।

চার্লস রবার্ট ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২)

জন্ম ১৮০৯ সালের ১২ই ফেব্রুআরি। আট বছর বয়সে মা মারা যান, বাবার হাতে ডারউইন মানুষ। ডারউইনের বাবা ছিলেন তিনশো পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের হাসিখুশি দিলদরিয়া মেজাজের এক প্রকাণ্ড মানুষ। ছেলেকে মানুষ করতে গিয়ে তাঁর ধারণা হল, ছেলেটা একেবারেই বাউণ্ডুলে আর অপদার্থ। লেখাপড়ায় মন নেই, যতো রাজ্যের জঞ্জাল জড়ো করার দিকে ঝোঁক। নুড়ি, শামুক, পাখির ডিম, ফুল, পোকামাকড় বা ইত্যাকার সব জিনিস জড়ো করা আর সারাটি দিন তাই নিয়ে মশগুল হয়ে থাকা। বিরক্ত হয়ে ছেলেকে তিনি ভর্তি করলেন একটা ক্লাসিকাল স্কুলে। ফল বিশেষ হল না। দেখা গেল গ্রীক বা ল্যাটিন ছেলেটাকে টানে না, তার চেয়ে তার কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় নিজেদের বাড়ির বাগানে একটা ল্যাবরেটরি ফেঁদে বসা আর নানা ধরনের টুকিটাকি এক্স্পেরিমেণ্ট নিয়ে মেতে থাকা। স্কুলের সহপাঠী আর মাস্টারমশাইদের মতে ছেলেটা হাবা। হেডমাস্টারমশাই-এর রায় : ছেলেটাকে শোধরানো যাবে না। বিরক্ত হয়ে বাবা পাঠিয়ে দিলেন এডিনবার্গ বিশ্ববিত্থালয়ে ডাক্তারি পড়তে। বাবা নিজে ডাক্তার, ছেলে ডাক্তার হলে খুশিই হতেন। ছেলেরও হয়তো অনিচ্ছা ছিল না। কিন্তু দেখা গেল, অ্যানাটমিতে তার মন নেই, মেটিরিয়া মেডিকা ওর কাছে আতঙ্ক। একদিন একটি শিশুর শরীরে

অপারেশন করা হচ্ছে (তখনো পর্যন্ত অপারেশন করার সময়ে রোগীকে অজ্ঞান করার ব্যবস্থা হয় নি), আর শিশুটি তারস্বরে চেঁচাচ্ছে—ডারউইনের অসহ্য মনে হওয়াতে তিনি ছুটে অপারেশন থিয়েটার থেকে বাইরে চলে এলেন। এ-খবর যথাসময়ে বাবার কাছে পৌঁছল, ছেলের সম্পর্কে হতাশ হয়ে তিনি মনস্থ করলেন যে ছেলেকে পাদরী করার চেষ্টা করবেন। ফলে ডাক্তারি পড়ায় ইতি, ডারউইনকে যেতে হল কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে। তিনটি বছর কাটল সেখানে। তারপরেই ঘটল এমন একটি ঘটনা যাতে ডারউইন ভবিষ্যতে কী হবেন তা পাকাপাকি স্থির হয়ে গেল। ঘটনাটি এই: 'বীগ্‌ল' নামে একটি জাহাজ সাত সমুদ্দুরে ঘুরে বেড়াবে, সেই জাহাজের জন্যে চাই একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী। ডারউইনের নাম এই পদের জন্যে সুপারিশ করা হল, তিনিই চাকরিটা পেলেন, যদিও বিনে মাইনের চাকরি, বাবার দিক থেকে বিশেষ আপত্তি উঠল না। হয়তো আশা ছিল, সাতসমুদ্দুরের হাওয়া লেগে ছেলের মাথা থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভূত নেমে যেতে পারে। বাবার আশা পূরণ হয় নি। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভূত নামে না, আরও জেঁকে বসে। আগে ছিল নেশা, এখন সাধনা।

১৮৩১ থেকে ১৮৩৬—পাঁচ বছর 'বীগ্‌ল' ঘুরে বেড়াল সমুদ্রে সমুদ্রে। বাইশ বছরের তরুণ বিজ্ঞানী খোলা চোখ আর খোলা মন নিয়ে পৃথিবীর এই বিচিত্র জীবজগৎ খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন, কোনো মনগড়া তত্ত্ব মাথায় নিয়ে নয়, যতো বেশি সম্ভব তথ্য যোগাড় করার জন্যে। তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে শেষ পর্যন্ত কোন্ তত্ত্বে পৌঁছনো যেতে পারে সে-সম্পর্কে গোড়ার দিকে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না।

দেশে ফিরে বিয়ে করলেন। একদিকে দশটি ছেলেমেয়ের বাপ হলেন অন্যদিকে পুরো কুড়িটি বছর ধরে সংগৃহীত তথ্যগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে ছেলেমেয়েদের সত্যিকারের পূর্বপুরুষ আবিষ্কারে মন দিলেন।

১৮৫৯ সালের ২৪শে নভেম্বর ডারউইনের বইটি প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে বইটির নাম ছিল—'দি অরিজিন অফ স্পিসিস বাই মীন্‌স অফ ন্যাচারাল সিলেক্‌শন অর দি প্রিসার্ভেশন অফ ফেভর্‌ড রেসেস ইন দি স্ট্রাগ্‌ল ফর লাইফ।' এই বিদকুটে রকমের লম্বা নামটির বাংলা করলে এই রকমটি দাঁড়ায় : 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির উদ্ভব বা আনুকূল্য-প্রাপ্ত জাতিসমূহের বেঁচে থাকার সংগ্রামে টিকে থাকা।' নামটি লম্বা বটে কিন্তু এই নামের মধ্যে মূল বক্তব্যটি বলে দেওয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক নির্বাচন। এই প্রাকৃতিক নির্বাচন ব্যাপারটা কী?

প্রাকৃতিক নির্বাচন

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মূল কথা চারটি। এক এক করে ধরা যাক।

জীবজন্তুর যতো বাচ্চা বেঁচে থাকে তার চেয়ে অনেক বেশি জন্মায় ও মরে। বিশেষ করে নিম্নতর জীবদের ক্ষেত্রে দেখা যায় লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি ডিম থেকে শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে ও বড়ো হয়ে ওঠে একটি বা দুটি জীব। যেমন, সমুদ্রের মাছ। একজোড়া কড্‌ মাছ ষাট-লক্ষ ডিম পাড়ে, একজোড়া লিঙ মাছ দু-কোটি আশি লক্ষ! যদি এই ষাট-লক্ষ ডিম থেকে ষাট-লক্ষ বাচ্চা হত বা দু-কোটি আশি লক্ষ বাচ্চাই বেঁচে থাকত তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে সমুদ্রটা হয়ে উঠত কড্‌ বা লিঙ মাছের একটা জমাট পিণ্ড। চোখের ওপরেই দেখা যাচ্ছে, তা হয় নি। বহু বছর ধরে পৃথিবীর সমুদ্রে কড্‌ বা লিঙ মাছের সংখ্যা মোটামুটি একই রকম। কথাটা এভাবেও বলা চলে : প্রাণের এই বিশেষ ধারাটি বজায় আছে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি প্রাণের মৃত্যুর বিনিময়ে।

একজোড়া খরগোশের বছরে সত্তরটি বাচ্চা হতে পারে। তবুও

পৃথিবীতে মোট খরগোশের সংখ্যা বছরে বছরে বাড়ে নি। তার মানে, এই সত্তরটি বাচ্চার মধ্যে একটির বেশি বাঁচে না!

একজোড়া ব্যাঙের প্রত্যেকটি ডিম থেকে যদি বাচ্চা হত আর প্রত্যেকটি বাচ্চা বেঁচে থাকত তাহলে কিছুকালের মধ্যেই পৃথিবীতে ব্যাঙ ছাড়া অন্য কোনো জীবের ঠাঁই হত না।

হাতির বাচ্চা হয় খুব কম আর অনেক দেরিতে দেরিতে। কিন্তু সব হাতির বাচ্চা বেঁচে থাকলে সাড়ে-সাতশো বছরের মধ্যে একজোড়া হাতির বংশধরদের সংখ্যা হত এক-কোটি নব্বুই-লক্ষ! তা হয় নি। পৃথিবীতে হাতির সংখ্যা খুব বেশি নয়, হাতি একটি দুর্লভ জীব!

কিন্তু মানুষের বেলায় মোট সংখ্যা বছরে বছরে বেড়ে চলেছে—যদিও একজোড়া মানুষের বাচ্চা হয় বছরে একটির বেশি নয় (একসঙ্গে দুটি তিনটি বা চারটি বাচ্চা হওয়ার ঘটনা এত কম যে হিসেব থেকে বাদ দেওয়া চলে), সারা জীবনে দশটির বেশি কদাচিৎ।

এ থেকে দ্বিতীয় কথাটি আসে। বেঁচে থাকার সংগ্রাম। যা থেকে কারও রেহাই নেই। বেঁচে থাকতে হলে খাদ্য চাই, বায়ু চাই, আলো চাই, উত্তাপ চাই, শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করা চাই, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচবার উপায় জানা চাই—আরো অনেক কিছু চাই। এতগুলো চাহিদা পূরণ করার ক্ষমতা থাকলে পরেই কোনো একটি জীব বেঁচে থাকে। এ কারণেই সংগ্রাম। এই সংগ্রামে জয়ী কারা আর পরাজিত কারা তার হিসেবটা সহজ। যদি দেখা যায়, কোনো এক বিশেষ জীবের সংখ্যা বছরে বছরে কমছে তবে বুঝতে হবে তারা বেঁচে থাকার সংগ্রামে হেরে-যাওয়ার দলে। যাদের সংখ্যা বছরে বছরে একই রকম, তারা জিতেছে, যদিও খুব বড়ো রকমের নয়। বড়ো রকমের জিত তাদেরই যাদের সংখ্যা বাড়ছে।

এই হার-জিতের ভেতরের রহস্যটা কী? জবাবে ডারউইন

বলেছেন—সারভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট্। যোগ্যতমের টিকে থাকা। মানে কি?

মধ্যযুগের অতিকায় ডাইনোসরদের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে। তার মানে, বেঁচে থাকার সংগ্রামে এই ডাইনোসররা পুরোপুরি হেরে যাওয়ার দলে। অথচ এই মধ্যযুগেরই শেষদিকের নিরীহ প্রায়-নিরস্ত্র ও দুর্বল স্তন্যপায়ীরা শুধু যে জিতেছে তা নয়, পৃথিবীর ওপরে আধিপত্য করছে।

কেন এমনটি হয়? জবাবে ডারউইন বলছেন, স্তন্যপায়ী জীবরা হচ্ছে এই বিশেষ সময়ের 'ফেভর্ড্' বা আনুকূল্য-প্রাপ্ত।

অর্থাৎ, এই আনুকূল্য-প্রাপ্তরাই যোগ্যতম। 'আনুকূল্য-প্রাপ্ত' কথাটার মানে কি? ডারউইন বলছেন, সব জীবই পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করে। কেউ পারে, কেউ পারে না। যারা পারে তারাই হচ্ছে, 'ফেভর্ড্' বা আনুকূল্য-প্রাপ্ত। তারাই যোগ্যতম।

'পরিবেশ' বলতে আমরা কী বুঝব? পরিবেশ মানে চারপাশের অবস্থা, যে-অবস্থার মধ্যে জীব চলাফেরা করে। অনেকগুলো বিষয় আছে। যেমন, জলহাওয়া ও ভূ-প্রকৃতি। যে-বিশেষ জায়গায় জীবটি চলাফেরা করছে সে-জায়গাটা ঠাণ্ডা না গরম, শুকনো না জোলো, খরা না বাহুলে, সে-জায়গার কাছাকাছি সমুদ্র বা পর্বত আছে কিনা—এসবের ওপর জীবটির জীবনধারণ অনেকখানি নির্ভর করে। এ ছাড়া খাদ্যের ব্যাপার তো আছেই। জীবটিকে বেঁচে থাকতে হলে খাদ্যের যোগান থাকা চাই। সব মিলিয়ে পরিবেশ।

এই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে না পারলে বেঁচে থাকার সংগ্রামে হেরে যেতে হয়। মধ্যযুগের ডাইনোসরের কথা বলেছি, এমনি দৃষ্টান্ত আরো অজস্র। হালের একটি দৃষ্টান্ত হিমযুগের ম্যামথ। এই ম্যামথরা ছিল আজকালকার হাতিদের মতো। হিমযুগে এই ম্যামথরা বীরবিক্রমে চলাফেরা করত। ঘন পশমে ঢাকা তাদের শরীরের গড়নটাই ছিল হিমযুগের উপযুক্ত। কিন্তু হিমযুগ

শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ম্যামথদেরও আয়ু শেষ। হিমযুগে ম্যামথরা ঘুরে বেড়াত তুষারঢাকা তুন্দ্রা-অঞ্চলের ওপর দিয়ে। সেখানে গাছ-পালা বলতে ছিল ছোট ছোট ঝোপ, যেমন মেরু-অঞ্চলে দেখা যায়। ম্যামথদের গায়ের ঘন লোমে ঢাকা চামড়া, তাদের শুঁড়, তাদের পায়ের গড়ন, তাদের শরীরের পরিপাক-ব্যবস্থা—সমস্তই ছিল এই পরিবেশের উপযোগী। কিন্তু হিমযুগের পরে উষ্ণযুগ শুরু হতেই বড়ো বড়ো গাছপালায় তুন্দ্রা-অঞ্চল ছেয়ে যায়, অন্য ধরনের লতাপাতা ও ঝোপ-ঝাড় গজিয়ে ওঠে। তখন দেখা যায়, ম্যামথদের শরীরের যে-বিশেষ গড়নটি হিমযুগের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, উষ্ণযুগে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় মারাত্মক অসুবিধের কারণ। সে-অবস্থায় অনিবার্য ভাবেই ম্যামথদের অস্তিত্ব লোপ পায়।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কী? হিমযুগ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে এই যে একদল হাতির গায়ে ঘন লোম গজিয়ে উঠল—সেটা কেন? ব্যাপারটা কি এই যে সাধারণ একটা হাতি হঠাৎ একদিন বলে উঠেছিল—'নাঃ, বড়ো ঠাণ্ডা লাগছে, আমার গায়ে ঘন লোম গজাক,' —আর অমনি তার গায়ে লোম গজিয়েছিল? তাই যদি হত তাহলে এই যে পুরুষরা বলে আসছে 'আমাদের মাথায় যেন টাক না পড়ে'—তাতে পুরুষদের মাথায় টাক পড়া বন্ধ হয়েছে কি? জিরাফের ঘাড় লম্বা, তার মানে এই নয় যে বহুকাল আগেকার কোনো একটি জিরাফ মনে মনে চেয়েছিল যে তার ঘাড়টা যেন লম্বা হয়—আর অমনি তার ঘাড় লম্বা হয়েছে।

এ থেকেই চতুর্থ কথাটা ওঠে। জীবকোষের পরিবর্তনীয়তা ও পরিবর্তমানতা। মানে কি?

ইংরেজি 'জার্ম্ প্লাজম্' শব্দের অর্থে জীবকোষ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'কোষ' মানে সূক্ষ্ম অংশ বা বিন্দু। একেবারে গোড়ার যে-অবস্থা থেকে জীবদেহের শুরু তাকেই বলা হয় জীবকোষ। এই জীবকোষের পুষ্টি হতে হতে ভ্রূণ, ভ্রূণের পুষ্টি

হতে হতে পূর্ণাঙ্গ সন্তান। জীবকোষ পদার্থটি বড়োই অস্থির, কখনো এক অবস্থায় থাকে না, অনবরত বদলায়। যে-কারণে একই বাপ-মায়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কিছু না কিছু পার্থক্য থাকেই। এক পুরুষে এই পার্থক্য অতি যৎসামান্য, কিন্তু পরের পুরুষে আরেকটু প্রকট। এই ব্যাপারটিকেই ডারউইন বলেছেন, জীবকোষের পরিবর্তনীয়তা (অর্থাৎ যার পরিবর্তন হতে পারে) এবং পরিবর্তমানতা (অর্থাৎ যার পরিবর্তন হয়ে থাকে)।

দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করলে বুঝতে সুবিধে। ম্যামথদের কথাই ধরা যাক। যে জীবকোষ থেকে হাতির জন্ম সেই জীবকোষের মধ্যে অনবরত পরিবর্তন ঘটছিল। ফলে যে-সব বাচ্চা জন্মাচ্ছিল তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের থেকে যাচ্ছিল কিছু না কিছু পার্থক্য। এদের মধ্যে একদল বাচ্চা ছিল যারা জন্মেছিল সারা শরীরে ঘন লোম গজাবার দিকে একটা ঝোঁক নিয়ে। স্বাভাবিক নিয়মেই বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে এদের শরীর লোমশ হয়ে যায়। উষ্ণযুগের আবহাওয়ায় এই লোমশ হাতিরা বিশেষ সুবিধে করতে পারে না, বেঁচে থাকার সংগ্রামে তাদের হেরে যেতে হয়। কিন্তু হিমযুগের আবহাওয়ায় বেঁচে থাকার সংগ্রামে বড়ো রকমের জিত হয় এই লোমশ হাতিদেরই, তারা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। এরাই হচ্ছে হিমযুগের ম্যামথ। অন্য হাতিরা তখন হেরে-যাওয়ার দলে, আস্তে আস্তে নির্বংশ হচ্ছে।

ক্রমবিকাশের সূত্র

'প্রাকৃতিক নির্বাচন' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এতক্ষণ যে-সব কথা বলা হল তার মধ্যেই ক্রমবিকাশের সূত্রটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তা এই :

জীবজগতে যতো জীব জন্মায় তার মধ্যে বেঁচে থাকে

গোনাগুনতি কয়েকটা মাত্র। বাদবাকি সমস্ত মরে যায়। যারা বেঁচে থাকে তারা কেন বাঁচে? বাঁচে, কারণ তারা বেঁচে থাকার সংগ্রামে জয়ী হয়। বেঁচে থাকার সংগ্রামে জয়ী হয়, কারণ তারা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। তার মানে, একই বাপ-মায়ের সন্তানদের মধ্যে কেউ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারছে, কেউ পারছে না। এমনটি যে হয় তার কারণ সন্তানদের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকেই। প্রত্যেকটি সন্তান জন্মেছে নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য নিয়ে। যেক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার ব্যাপারে সহায়ক, সেক্ষেত্রে বেঁচে থাকা ও বংশবৃদ্ধি। এই যে নতুন বংশধর তার মধ্যেও পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য তো আছেই, তারও ওপরে নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য। আবারও সেই একই কথা। অল্প কয়েকজন বাঁচে, অধিকাংশই মরে যায়। যারা বাঁচে তাদের বৈশিষ্ট্য এবং আরো কিছু নিয়ে জন্মায় তাদের বংশধররা। আবারও অনেকে মরে অল্প বাঁচে। এমনি চলেছে বংশের পর বংশে জীবনের ধারা।

লক্ষ করার বিষয় এই যে জীবনের এই ধারাটিতে যদিও কোনো ছেদ নেই কিন্তু এই ধারাটি একই চেহারায় কখনো ছু-বার উপস্থিত হচ্ছে না। অনবরত বদলাচ্ছে, অনবরত নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে চলেছে। এইভাবে চেহারা বদলাতে বদলাতে এমন একটা সময় আসে যখন মনে হয়, জীবনের ধারাটি যেখান থেকে শুরু হয়েছিল আর যেখানে এসে পৌঁছেছে—এ ছুয়ের মধ্যে সরাসরি কোনো যোগ নেই।

তাহলে আসল কথাটা কী দাঁড়াচ্ছে? আজকের দিনে পৃথিবীর যেখানে যতো রকমের জীব দেখছি তাদের প্রত্যেকেরই আছে একটা ইতিহাস। ঠিক আজকের দিনের চেহারাই তাদের বরাবরকার চেহারা নয়। হাজার-লক্ষ-কোটি বছর ধরে বদলাতে বদলাতে আজকের দিনের এই বিশেষ চেহারা। এখানেই শেষ নয়। আরো হাজার-লক্ষ-কোটি বছর ধরে বদলাবে। যারা এমনভাবে

বদলাচ্ছে যে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা সম্ভব—তারাই বেঁচে থাকবে। আর যারা এমনভাবে বদলাবে যে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা সম্ভব নয়—তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এই হচ্ছে ক্রমবিকাশের সূত্র। এটা ডারউইনের আনকোরা আবিষ্কার নয়। ডারউইনের সময়ে এবং ডারউইনের আগেও এই একই কথা আরো দু-একজন বলেছিলেন। কিন্তু ডারউইনের কৃতিত্ব এই যে তিনিই সর্বপ্রথম এই সূত্রের সমর্থনে অকাট্য সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করতে পেরেছিলেন।

এবার তাহলে মানতে হয় যে মানুষের আজকের চেহারাটাও বরাবরকার নয়, মানুষেরও আছে একটা ইতিহাস, একটা ঠিকানা। কোন্ বিশেষ ধরনের জীবের ক্রমবিকাশের পরিণতি আজকের দিনের মানুষ?

জবাব শুনে সে-সময়ের মানুষ চমকে উঠেছিল, ক্ষেপে গিয়েছিল, দারুণ একটা সোরগোল তুলেছিল। কিন্তু এতদিনে জবাবটা শুধু যে আমাদের গা-সওয়া হয়েছে তা নয়, সত্য বলে স্বীকার করে নিতেও বাধ্য হয়েছি।

জবাবে বলা হয়েছিল, মানুষের পূর্বপুরুষ হচ্ছে 'অ্যান্থ্রোপয়েড এপ্,' অর্থাৎ, 'মনুষ্যসদৃশ বিশেষ জাতীয় বানর'। বা, বলা যেতে পারে, নর-বানর। বা, বনমানুষ। সাধারণ বানর নয়, গোরিলা নয়, শিম্পাঞ্জী নয়, ওরাং-ওটাং নয়—নর-বানর। তবে ওদের সঙ্গেও সম্পর্ক আছে। গোরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাং-ওটাং—ওরা মানুষের নিকট জ্ঞাতি। বানররাও ফেলনা নয়। দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি। কিন্তু এত কথা বলার পরেও যে-কথাটা থেকে যাচ্ছে তা এই: মানুষই একমাত্র মানুষ, অন্যরা মানুষের যতো বড়ো জ্ঞাতিই হোক, মানুষ কিছুতেই নয়।

তফাতটা কোথায়?

কিন্তু তার আগে মানুষের পূর্বপুরুষের কিছু সাক্ষ্য ও নিদর্শন উপস্থিত করা যাক।

মানুষ ও মানুষের বর্গ

মানুষ একটি জীব—কোন্ শ্রেণীর জীব ?

স্তন্যপায়ী জীব।

স্তন্যপায়ী কেন ? কারণ মানবশিশু স্তন্য পান করে বা মায়ের বুকের দুধ খেয়ে বড়ো হয়।

মানুষকে স্তন্যপায়ী জীব বলতে বিশেষ করে মানুষেরই একটা পরিচয় পাওয়া গেল তা নয়। পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী জীবের সংখ্যা বহু। কুকুর, বেড়াল, গোরু, মহিষ, হরিণ, উট, জিরাফ, ঘোড়া, গণ্ডার, বাঘ, সিংহ—সকলেই স্তন্যপায়ী। এমনকি বাদুড় পর্যন্ত !

এই জীবগুলোর মধ্যে মিল কি শুধু স্তন্যপায়ী হওয়াতে ? মিল আরো অনেক। যেমন, সকলেই মেরুদণ্ডী, সকলেরই রক্ত উষ্ণ, গায়ের চামড়া লোমে ঢাকা, দাঁত ও চোয়ালের বিশেষ গড়ন, বিশেষ ধরনের শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র। বাচ্চারা ভ্রূণ অবস্থায় থাকে মায়ের পেটে, জন্মাবার পরে মায়ের বুকের দুধ খেয়ে বাঁচে।

এত মিল থাকতে বিশেষ করে স্তন্যপায়ী হওয়ার ওপরে জোর দেওয়া হচ্ছে কেন ? কারণ এটিই প্রধান লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণ। স্তন্যপায়ী জীব মাত্রই মেরুদণ্ডী। তাই বলে মেরুদণ্ডী জীব মাত্রই স্তন্যপায়ী নয়। যেমন, হাঁস, মুরগি, টিকটিকি, ব্যাঙ, মাছ, হাঙর ইত্যাদি। এরা মেরুদণ্ডী বটে কিন্তু স্তন্যপায়ী নয়। তাহলে মেরুদণ্ডী হওয়াটাও তো বিশেষ একটা লক্ষণ ? অবশ্যই। কেননা

অ-মেরুদণ্ডী জীবের সংখ্যাও বহু। যেমন, কেঁচো, মাকড়সা, জোঁক, মশা, মাছি, আরসোলা, প্রজাপতি ইত্যাদি।

জীবজগৎকে ভাগবিভাগ করা হয়ে থাকে এমনি লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে। ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে জীবজগৎকে গোড়তেই দুটি বড়ো ভাগে ভাগ করা চলে : মেরুদণ্ডী ও অ-মেরুদণ্ডী। এই মোটা দাগের বিভাগটির নাম দেওয়া হয়েছে পর্ব (phyla)। মেদরুণ্ডী হওয়াটা একটি পর্বের অন্তর্গত হওয়া। পর্ব থেকে শ্রেণী (class)। স্তন্যপায়ীরা একটি শ্রেণী। শ্রেণী থেকে বর্গ (order)। মানুষ যে বর্গের অন্তর্ভুক্ত তার নাম প্রাইমেট্স। যদিও মানুষই প্রধান কিন্তু একা মানুষকে নিয়ে এই বর্গটি নয়। মানুষ ছাড়াও আছে বনমানুষ, বানর, লেমুর প্রভৃতি জীব। মানুষের ঠিকানার হদিশ পেতে হলে এই প্রাইমেট্স-এর তত্ত্বতালাশ বিশেষভাবে নেওয়া দরকার।

ঠিকানাটি যে সিধে সড়কে নয় তা এই সামান্য আলোচনাতেই বোঝা যাচ্ছে। পায়ে পায়ে বড়ো বড়ো মোড়, যেখানে নানা দিকে নানা রাস্তা। একটা মোড়ে এসে আমরা বেছে নিয়েছি মেরুদণ্ডীর রাস্তা। পরের মোড়ে স্তন্যপায়ীর। পরের মোড়ে প্রাইমেট্স-এর। মানুষকে এবারে পাওয়া যাচ্ছে অনেকটা সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে, যার নাম বর্গ।

এখানেই শেষ নয়। পরিধিটাকে আরো ছোট করা চলে। বর্গ থেকে পরিবার (family), পরিবার থেকে গণ (genera)। গণ থেকে প্রজাতি (species)। মানুষ যে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তার নাম 'হোমিনিডী' (hominidae), যে গণের, তার নাম 'হোমো' (homo), যে প্রজাতির, তার নাম 'স্যাপিয়েন্স' (sapiens)।

শুরু করেছিলাম পর্ব থেকে—মেরুদণ্ডী। তারপরে শ্রেণী—স্তন্যপায়ী। তারপরে বর্গ—প্রাইমেট্স। তারপরে পরিবার—হোমিনিডী। তারপরে গণ—হোমো। তারপরে প্রজাতি—স্যাপিয়েন্স। সড়কটি মোটেই সিধে নয়। অনেক বাদ দিয়ে

অনেক বাঁচিয়ে চলতে হয়েছে। সড়ক না বলে বরং তুলনা করা চলে জটিল শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বিরাট এক মহীরুহের সঙ্গে, যার একেবারে মগডালে রয়েছে মানুষ। সমস্ত শাখাপ্রশাখা বাদ দিয়ে এই মগডালে পৌঁছবার দিকটি মাত্র এখানে নির্দেশ করা হল।

বিজ্ঞানের ভাষায় কোনো প্রাণীর নাম উল্লেখ করতে হলে প্রথমে আসে তার গণ, তারপরে প্রজাতি। অনেকটা ডাইরেক্টরিতে নাম উল্লেখ করার মতো। মানুষের নাম তাহলে দাঁড়াচ্ছে 'হোমো স্যাপিয়েন্স'। এমনিভাবে বেড়ালের নাম 'ফেলিস ডোমেস্টিকা'। এমনি অন্যান্য প্রাণীর।

আগেই বলেছি, প্রাণিজগৎকে ভাগবিভাগ করার এই দুরূহ কর্তব্যটি সম্পন্ন করেছিলেন কার্ল লিনিয়াস, ১৭৩৫ সালে। প্রাণিজগৎকে এই প্রথম একটি প্রণালীবদ্ধ ছকের মধ্যে তুলে ধরা গেল। কার্ল লিনিয়াসকে তাই বলা হয় 'প্রণালীবদ্ধ প্রাণিবিদ্যার জনক'। তাঁর তালিকায় প্রথম নামটি ছিল মানুষের। হোমো স্যাপিয়েন্স বা জ্ঞানী মানুষ। তিনি নিজেও মানুষ, তাই এই প্রজাতিটির ওপরে তাঁর এমন পক্ষপাতিত্ব। তাই বেছে বেছে এমন সুন্দর নাম।

যে ভাগবিভাগের কথা বলা হল তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট দল প্রজাতির। এখানে মিলও তাই সবচেয়ে বেশি, মৌলিক সমস্ত বিষয়েই। কেননা ভাগবিভাগটা করা হয়েছে মৌলিক বিষয়ে মিলের ভিত্তিতে। মিল হতে হতে যেখানে এসে পৌঁছনো যাচ্ছে সেখানে পুরোমাত্রার মিল। যেমন মানুষের সঙ্গে মানুষের। তবে মনে রাখা দরকার যে মৌলিক বিষয়েই মাত্র মিল। তার মানে এই নয় যে চেহারার দিক থেকেও দুটি মানুষ হুবহু একই রকম। একই প্রজাতি হওয়া সত্ত্বেও তা হয় না—পার্থক্য থাকে মুখের চেহারায়, গায়ের রঙে, হাতের রেখায় ও আরো নানা বিষয়ে। এমনকি একই মায়ের পেটের দুই ভাইয়ের মধ্যেও এমনি নানা পার্থক্য এসে যায়।

যাই হোক আমরা বেরিয়েছি মানুষের ঠিকানার উদ্দেশে। কাজেই প্রজাতির গণ্ডী ছেড়ে আমাদের পা ফেলতে হবে আরো বড়ো এলাকায়। বিশেষ করে সেই এলাকায় যার নাম বর্গ। বিশেষ করে সেই বর্গে যার নাম প্রাইমেট্স।

প্রাইমেট্স

বানর, বনমানুষ, মানুষ—এই তিনটি শব্দের সাহায্যে যতো রকমের প্রাণী বোঝানো হয়ে থাকে তারা সবাই প্রাইমেট্স। অনেকগুলো মৌলিক বিষয়ে মিল থাকার জন্যে এই প্রাণিগুলোকে একই বর্গের মধ্যে ধরা হয়েছে। কিন্তু অমিলও কম নয়। লেমুরকে দেখে মনে হতে পারে, প্রাণীটি এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি বানরও হয়ে উঠতে পারে নি। আবার শিম্পাঞ্জী, গোরিলা, ওরাং-ওটাংকে শুধু বানর হিসেবে কিছুতেই ভাবা চলে না। বানর তো বটেই তা ছাড়াও অনেক কিছু। ইংরেজিতে তাই এদের জন্যে আলাদা শব্দ : 'এপ্'। বাংলায় আমরা বলেছি বনমানুষ। চেহারায় মানুষের আদল আসে কিন্তু মানুষ কিছুতেই নয়। মানুষের মতো।

পরের পৃষ্ঠায় একটি ছবি এঁকে প্রাইমেট্স দলভুক্ত জীবগুলোকে পর পর উপস্থিত করা হল। একেবারে ওপরে ইঁদুরের মতো একটি জীব। একেবারে নিচের দিকে ডানদিকে মাটিতে দাঁড়ানো ভঙ্গিতে শিম্পাঞ্জী। মাঝখানে রয়েছে লেমুর, বানর, গিবন ইত্যাদি। শিম্পাঞ্জীর পাশে একটি মানুষকে দাঁড় করিয়ে দিলেই প্রাইমেট্স-এর পুরো ছবিটি ধরা পড়ত।

ইঁদুরের মতো একটি জীব, গাছের ডালে চলাফেরা—সেও কিনা মানুষের সঙ্গে একই ছবিতে স্থান পাচ্ছে! পুরো ছবিটির দিকে চোখ রাখলে এমন কথাও ভাবা চলে যে এই সামান্য জীবটির সঙ্গেও মানুষ জ্ঞাতিসূত্রে সম্পর্কিত।
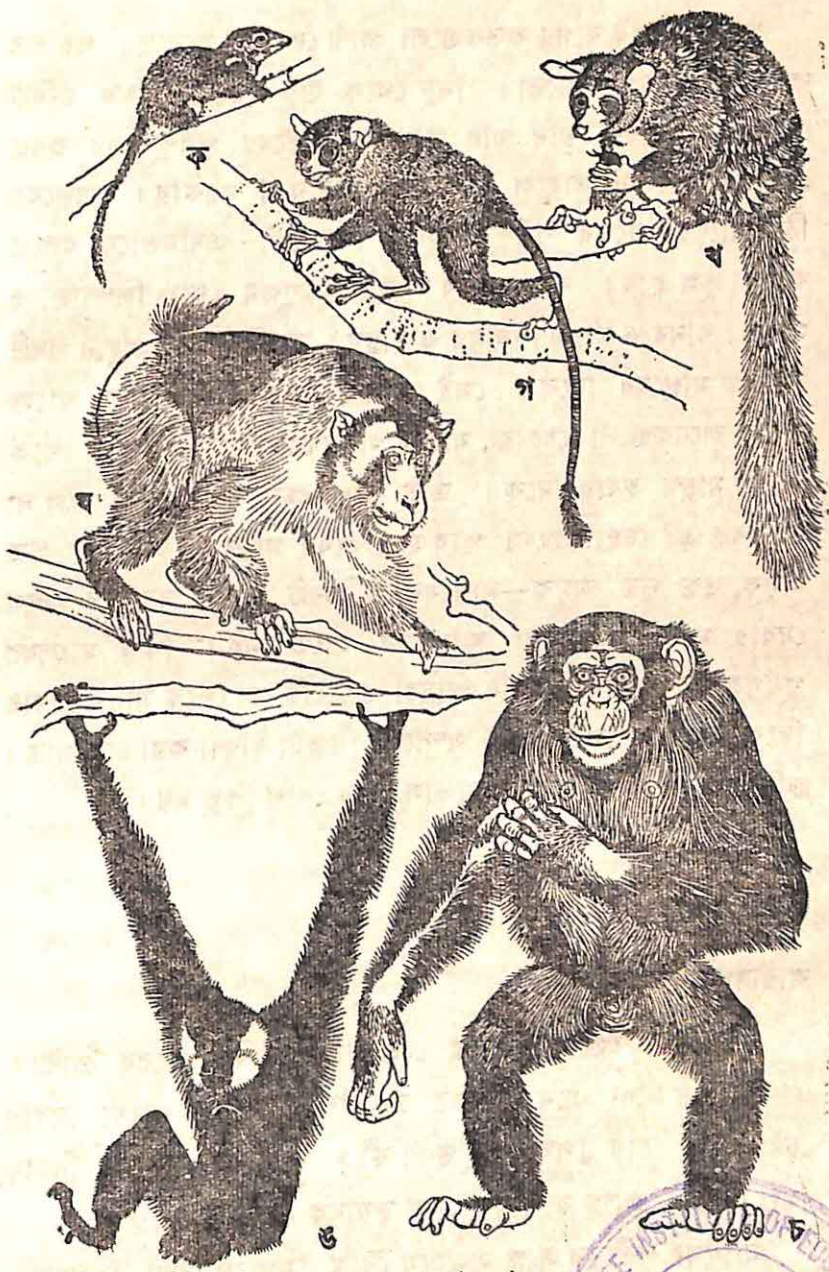
একালের প্রাইমেট্‌স

(ক) গেছো-ছুঁচো (তুপাইয়া), (খ) লেমুর (গালাগো), (গ) টার্সিয়ার (টার্সিয়ুস), (ঘ) বানর (মাকাকা), (ঙ) গিবন (হাইলোবেটস), (চ) শিম্পাঞ্জী (পান)
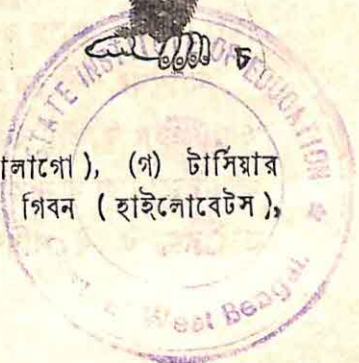
ছবিতে একই বর্গের কতকগুলো প্রাণী দেখানো হয়েছে। পর পর কতকগুলো ধাপের মতো। নিচু থেকে উঁচু পর্যন্ত। কিন্তু ছবিটি দেখে এমন ধারণা যদি যদি হয় যে মানুষের পূর্বপুরুষের হুবহু চেহারাই বুঝি এই তাহলে সেই ধারণা দূর করা দরকার। মানুষের ঠিক আগের ধাপের পূর্বপুরুষ হচ্ছে শিম্পাঞ্জী—এমনিভাবে বললে কথাটা ভুল হবে। বলতে হবে একই পূর্বপুরুষ থেকে শিম্পাঞ্জী ও মানুষ। বানর ও মানুষ। লেমুর ও মানুষ। ক্রমবিকাশের প্রধান পথটি গিয়েছে মানুষের দিকে। সেই পথেরই ধারে ধারে পাওয়া যাচ্ছে আরো অনেকগুলো চেহারা, যাদের লক্ষণগুলো ক্রমেই মানুষ থেকে আরো মানুষ হবার দিকে। তাই বলে এমন কথাও বলা চলে না যে হুবহু এই চেহারাগুলো পার হয়ে তবেই মানুষ। অমুকের পুত্র অমুক, তস্য পুত্র অমুক—মানুষের পরিচয়টি এমনি সরাসরি দেগে দেবার মতো মালমসলা আমাদের হাতে নেই। কিন্তু মানুষের পূর্বপুরুষের যে-সব নিদর্শন আমরা পেয়েছি তা থেকে মানুষ হবার দিকে ক্রমবিকাশের পথটি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা চলে মাত্র। ছবিতে এই পথেরই একটা আভাস, তার বেশি কিছু নয়।

শারীরগত মিল

এই যে এতগুলো বিভিন্ন চেহারার ও বিভিন্ন স্তরের প্রাণীকে একই ছবির মধ্যে এনে মানুষের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ধারণা দেবার চেষ্টা হচ্ছে তার পিছনে যুক্তিটা কী? এমন কতকগুলো বিষয়ে মিল নিশ্চয়ই আছে যা থেকে এমন ভয়ানক একটা সিদ্ধান্ত?

মানুষের শরীরের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিল গোরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাং-ওটাং জাতীয় বনমানুষের শরীরের সঙ্গে। এত বেশি মিল যে জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন এরা যে শুধু একই বর্গের (প্রাইমেট্স) তাই নয়, একই পরিবারেরও (হোমিনিডী)। তবে যমজ ভাইয়ের

মতো হুবহু মিল অবশ্যই নয়—মিলের মধ্যেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। একই পরিবারের মানুষদের মধ্যেও যা দেখা যায়।

দৃষ্টান্ত ধরা যাক।

মস্তিষ্ক॥ মানুষের ও বনমানুষের মস্তিষ্কের নির্মাণগত পরিকল্পনা এক। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক বনমানুষের মস্তিষ্কের চেয়ে বড়ো ও খুঁটিনাটি ব্যাপারে অনেক বিকশিত। মিল অনেকখানি, আবার এই মিলের মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও কম নয়। একটু আগেই আমরা বলেছি, একই পূর্বপুরুষ থেকে মানুষ ও বনমানুষের জন্ম। তাই যদি হয় তাহলে এই পূর্বপুরুষটির শারীরগত লক্ষণ সম্পর্কেও আমরা কিছুটা অনুমান করতে পারি। যেমন, এই পূর্বপুরুষটিরও মস্তিষ্ক থাকা চাই, অন্তত বনমানুষের যতোখানি আছে ততোখানি। তবে বনমানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট কিছুতেই নয়।

হাত॥ মানুষ ও বনমানুষের একই ধরনের হাত কিন্তু বনমানুষের হাত গাছের ডাল ধরে ঝোলা, দোল খাওয়া, ডালে ডালে লাফঝাঁপ করার পক্ষে অনেক বেশি কাজের। এ-কারণে হাতের আঙুলগুলোর গড়ন পর্যন্ত বদলেছে। বনমানুষের হাত অনেক বেশি শক্তপোক্ত। মানুষের হাত অতখানি নয়। কাজেই মানুষের ও বনমানুষের যে পূর্বপুরুষটির চেহারা অনুমান করার চেষ্টা হচ্ছে, তার হাতগুলি আজকালকার বনমানুষের মতো শক্তপোক্ত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কেননা মানুষের হাতেও তো এই পূর্বপুরুষের হাতেরই লক্ষণ।

ছেদক দাঁত॥ দাঁত নিয়ে পরে আমাদের আলোচনা তুলতে হবে। এখন আমরা বিশেষভাবে নজর দেব ছেদক দাঁতের দিকে। আমাদের দাঁতের পাটিতে সামনের দিকের চারটি দাঁত হচ্ছে 'কৃন্তক' (incisor)। অর্থাৎ দাঁতের পাটিকে যদি ডানদিক-বাঁদিক ভাগ করে দেখি তাহলে প্রত্যেক দিকে প্রথম দুটি দাঁত হচ্ছে 'কৃন্তক', তৃতীয়টিই 'ছেদক' (canine)। বনমানুষের দাঁতের পাটিতে এই ছেদক দাঁত খুবই শক্ত ও জোরালো—আক্রমণের ও আত্মরক্ষার

হাতিয়ার। মানুষের দাঁতের পাটিতে ছেদক আছে বটে কিন্তু তাদের বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই। তারা কৃন্তকেরই সামিল। তবুও লক্ষ করা যায় মানুষের দাঁতের পাটিতে ছেদকের মূল অন্যান্য দাঁতের তুলনায় অনেক গভীর এবং শক্ত ও জোরালো। এমন মানুষও আছে যাদের ছেদক ছুঁচলো ও বাইরের দিকে বেরিয়ে আসা। এ কালের মানুষ তার ছেদক দিয়ে যে কাজটুকু করে তার জন্যে এতখানি আয়োজনের কোনো দরকার ছিল না। আয়োজন দেখে বোঝা যাচ্ছে, এই ছেদকের বেশ বাড়বাড়ন্ত অবস্থা ছিল, তার সাহায্যে কাজও হত অনেক। কাজেই মানুষ ও বনমানুষের যে পূর্বপুরুষটিকে কল্পনা করার চেষ্টা হচ্ছে, ছেদকের গড়নে তার কিছু বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকা দরকার। তা ছিল আরো মজবুত, আরো অনেকখানি বাইরের দিকে বেরিয়ে আসা, ইত্যাদি। তবে একালের বনমানুষের ছেদকের মতো এতখানি শক্তপোক্ত নয়। কেননা বনমানুষের দাঁতের পাটিতে লক্ষ করা যায়, ছেদকের অত্যধিক বাড়ের দরুন পার্শ্ববর্তী দাঁতের গড়নে বৈশিষ্ট্য এসেছে, বৈশিষ্ট্য এসেছে মাথার খুলিতে ও চোয়ালে। মানুষে এই বৈশিষ্ট্য নেই। কাজেই, অনুমান করা চলে, এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিশেষ করে একালের বনমানুষেরই বৈশিষ্ট্য। মানুষ ও বনমানুষের যে পূর্বপুরুষের চেহারা কল্পনা করার চেষ্টা হচ্ছে তার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো না থাকারই সম্ভাবনা।

পায়ের বুড়ো আঙুল॥ মানুষ সিধে হয়ে দাঁড়ায়, সিধে হয়ে হাঁটে। এ-কারণে মানুষের পায়ে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য এসেছ, বিশেষ করে তার পায়ের বুড়ো আঙুলে। এই বুড়ো আঙুলটি আকারে বেশ বড়ো, সে-তুলনায় নড়াচড়ার ক্ষমতা তেমন নেই। কিন্তু মানুষের পায়ের এই বুড়ো আঙুলটি ব্যবচ্ছেদ করে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, সেখানে এখনো এমন সব মাংসপেশী থেকে গিয়েছে যা আছে বনমানুষের পায়ের বুড়ো আঙুলেও, অতিমাত্রায় পরিণত অবস্থায়, যে-সব মাংসপেশীর সাহায্যে আঁকড়ে ধরার কাজ খুব ভালোভাবে করা চলে। এ থেকে বোঝা যায়, মানুষ ও বনমানুষের পূর্বপুরুষের

পায়ের বুড়ো আঙুলেও এই মাংসপেশী পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল এবং তার ফলে আঁকড়ে ধরার কাজটি পায়ের এই বুড়ো আঙুলের সাহায্য ভালোভাবেই করা যেত।

এই দৃষ্টান্তগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে হোমিনিডী পরিবারভুক্তদের এমন কতকগুলো শারীরিক বৈশিষ্ট্য আছে যার তুলনামূলক বিচার থেকে তাদের পূর্বপুরুষের শারীরিক গড়ন সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

ফসিলের সাক্ষ্য

আমরা চাইছি মানুষের পূর্বপুরুষের চেহারা সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলতে। এজন্যে এতক্ষণ আমরা চোখ রেখেছিলাম একালের যারা বংশধর তাদের চেহারার দিকে, চেহারার বৈশিষ্ট্যের দিকে। কার সঙ্গে কার কোথায় মিল কোথায় অমিল তা আমরা দেখছিলাম মানুষের পূর্বপুরুষের চেহারায় কতটুকু থাকে কতটুকু থাকে-না সে-সম্পর্কে ধারণা করার জন্যে। উপায়টা পরোক্ষ। সরাসরি সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করতে পারলে বক্তব্যটা অবশ্যই জোরালো হয়।

এই সরাসরি সাক্ষ্যপ্রমাণের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ফসিল বা জীবাশ্মের মধ্যে। ফসিল কী? ফসিল হচ্ছে পৃথিবীর শিলাস্তরে সংরক্ষিত অতীতের কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর অবশিষ্ট বা তার ছাপ। এক্ষেত্রে সাক্ষ্যপ্রমাণটা একেবারে প্রত্যক্ষ, সরাসরি চোখের সামনে। এবারে আর অনুমান নয় একেবারে সরাসরি প্রমাণ। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার। ফসিল বিশ্বময় ছড়ানো থাকে না, অনেক কষ্ট করে খুঁজে বার করতে হয়। এজন্যে সময়ও লাগে প্রচুর। আর ফসিল সংগ্রহ করার আগ্রহটা সাম্প্রতিক কালের। আজ থেকে একশো বছর আগেও ফসিল প্রায় ছিলই না বলতে গেলে। ১৮৭১ সালে ডারউইন যখন তাঁর 'মানুষের অবরোহণ'

(The Descent of Man) বইটি লিখে মানুষের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তাঁর তত্ত্ব উপস্থিত করেন তখনো ফসিলের সংগ্রহ ছিল প্রায় শূন্য। কাজেই তাঁর তত্ত্বের সমর্থনে ডারউইন কোনো ফসিলের প্রমাণের ওপরে নির্ভর করতে পারেন নি। এ-কারণে তাঁর তত্ত্বের বিরুদ্ধে গুরুতর একটা আপত্তিই ছিল এই সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব। যেখান থেকে শুরু করে যেখানে পৌঁছতে পারলে মানুষকে পাওয়া যেতে পারত, সেই গোটা পথটি একটানা একটি দাগে চিহ্নিত করা যায় নি। মধ্যে মধ্যে ফাঁক থেকে গিয়েছিল, ফাঁক বা 'মিসিং লিংক'।

এখন আর সে-অবস্থা নেই, প্রচুর ফসিল হাতে এসেছে, সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবের আপত্তি এখন আর টেকে না। তবে একথাও সত্যি যে প্রাইমেট্স-এর ফসিল খুব বেশি পাওয়া যায় নি। তার কারণ, প্রাইমেট্স-এর জীবন কাটত জঙ্গলের মধ্যে, গাছের ডালে। জঙ্গলের মধ্যেই মরত। তাদের গোটা শরীর বা শরীরের অংশ বা তার কোনো স্থায়ী ছাপ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে টিকে থাকতে পারে, অর্থাৎ তারা ফসিল হতে পারে, এমন অবস্থা সেখানে নয়। তাই বলে প্রাইমেট্স-এর যে-সব ফসিল পাওয়া গিয়েছে তা সংখ্যায় এত কম নয় যে মানুষের পূর্বপুরুষের সত্যিকারের চেহারাটি চোখের সামনে দাঁড় করানো যাবে না।

অতীতের বয়স

একটা ফসিল হয়তো পাওয়া গেল। গোড়াতেই জানা দরকার ফসিলটার বয়স কত, অর্থাৎ কত দিনের পুরনো। বয়স সম্পর্কে ধারণা হলে তবেই ফসিল সম্পর্কে অন্যান্য আলোচনা তোলা যেতে পারে।

ফসিলের বয়স সম্পর্কে ধারণা করার উপায়টা কী?

আমরা যে-সব ফসিল নিয়ে আলোচনা তুলব সবই পাওয়া

গিয়েছে পালল (sedimentary) স্তর থেকে। থিতিয়ে পড়ার ফলে যে স্তর তৈরি হয় তারই নাম পালল। কী থিতিয়ে পড়ে ? সকলেই জানেন, নদী যখন উঁচু থেকে নেমে আসে তার স্রোত খুব বেশি। সেই নদীর জলের সঙ্গে মিশে থাকে প্রচুর পরিমাণ কাদা ও বালি। সমুদ্রে পড়ার আগে জলের স্রোত অনেক কমে যায়, তখন সেই কাদা ও বালি থিতিয়ে পড়তে শুরু করে। এমনিভাবে তৈরি হয় একটি স্তর, যা ক্রমে শিলায় রূপান্তরিত হয়।

এমনটি হওয়া খুবই সম্ভব যে কাদা ও বালি যখন থিতিয়ে পড়ছিল তখন হয়তো কোনো একটি জন্তুর মৃতদেহ তার মধ্যে থেকে গিয়েছে। কী হতে পারে তখন ? মৃতদেহটি ঘিরে পালল স্তর জমতে শুরু করে। জমতে জমতে একসময়ে মৃতদেহটিকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলে। তখন ? তখন মৃতদেহের যা নরম অংশ তা গলে খসে পড়ে কিন্তু শক্ত অংশ—যেমন হাড় ও দাঁত—থেকে যায়। যেমন থাকে খনিজ পদার্থ। লক্ষ লক্ষ বছর পরে হলেও থেকে যায়। পালল শিলার স্তরে স্তরে এমনিভাবে ফসিলের ভাণ্ডার তৈরি হয়ে চলে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, নিচের স্তরের পালল শিলাস্তরের ফসিলের বয়স বেশি, ওপরের স্তরের অপেক্ষাকৃত কম।

এমনি ব্যাপার ঘটতে পারে কোনো একটি গুহার মধ্যেও। গুহার ছাদ থেকে চুনমেশানো জল অনবরত মেঝের ওপরে ঝরে পড়ছে। ফলে তৈরি হচ্ছে স্ট্যালাগ্‌মাইটের শক্ত স্তর। গুহায় থাকে যে-সব প্রাণী তাদের কোনো একটির মৃতদেহ এমনিভাবে জমতে থাকা স্ট্যালাগ্‌মাইট স্তরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা সবসময়ই থাকে। লক্ষ লক্ষ বছর আগেও ছিল। তাহলে ? তাহলে এই মৃতদেহটিও হয়ে উঠতে পারে ফসিল। যতো গভীর স্তরের ততো বেশি বয়সের।

বোঝা যাচ্ছে, বয়সের একটা তুলনামূলক বিচার হওয়াটা খুব শক্ত ব্যাপার নয়। কোন্ শিলাস্তর থেকে ফসিলটি পাওয়া যাচ্ছে

তার বিচার ঠিকভাবে হলেই কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত নবীন তার একটা স্পষ্ট ফয়সালা হতে পারে।

কিন্তু এ তো গেল তুলনামূলক বিচার, বুঝে নেওয়া কে কার চেয়ে বয়সে ছোট অথবা বড়ো। সত্যিকারের বয়স জানতে হলে পাশাপাশি থাকা চাই সময়ের একটা সুনির্দিষ্ট মাপকাঠিও।

এই মাপকাঠিটি স্থির হয়েছে সাধারণভাবে ভূত্বকের গড়নের দিকে চোখ রেখে। সময়ের প্রধান ভাগ, বা জীববিজ্ঞানীরা যাকে বলেন অধিকল্প (era), চারটি। একেবারে গোড়ারটির নাম আর্কিয়ান (archaean) বা আদিম। ব্যাপ্তির দিক থেকে এই গোড়ারটিই সবচেয়ে বড়ো। আর এই সবচেয়ে ব্যাপ্ত সময়কালটিতেই পৃথিবীতে জীবনের প্রায় কোনো চিহ্নই ছিল না এবং ভূত্বকে গঠিত হয়েছিল প্রাক্‌-ক্যামব্রিয়ান (pre-cambrian) শিলা।

তারপরের অধিকল্পটির নাম পুরাজীবীয় (Palaeozoic)। শুরু আজ থেকে মাত্র ৫০ কোটি বছর আগে।

মাত্র ৫০ কোটি বছর! মাত্র শব্দটা ব্যবহার করলাম ভূতত্ত্ববিদের চোখ দিয়ে দেখতে গিয়ে। এই পৃথিবীর জন্ম আজ থেকে ৪০০ কোটি বছর আগে। জন্মের পরে কয়েক-শো কোটি বছর পার হয়েছে শুধু প্রাক্‌-ক্যামব্রিয়ান শিলাস্তর গড়ে উঠতে, যখন জীবনের প্রায় কোনো চিহ্নই নেই। পুরাজীবীয় অধিকল্পটি শুরু হচ্ছে আজ থেকে মাত্র ৫০ কোটি বছর আগে। মাত্র ৫০ কোটি! আর শেষ মাত্র ২০ কোটি বছর আগে।

৫০ কোটি বছর আগে শুরু আর ২০ কোটি বছর আগে শেষ। ৩০ কোটি বছরের ব্যাপ্তি এই পুরাজীবীয় অধিকল্পের। পুরাজীবীয়—নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে জীবনের লক্ষণের দিকে চোখ রেখেই এই নামকরণ। কী ধরনের জীবন? অবশ্যই একেবারে প্রাথমিক ধরনের। মেরুদণ্ডী জীব ছিল কি? ছিল, কিছু কিছু মাছ, তাও প্রাথমিক ধরনের।

পুরাজীবীয়র পরে মধ্যজীবীয় (Mesozoic)। এই নামকরণও

জীবনের লক্ষণের দিকে চোখ রেখে। কী ধরনের জীবন? মধ্যজীবীয়কে বলা হয় 'সরীসৃপদের যুগ' (Age of Reptiles)। কেন? এই অধিকল্পেই বিপুল বিক্রমে রাজত্ব করে গিয়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চেহারার ডাইনোসর, টেরোডাক্‌টিল ও এমন আরো বহু প্রকারের সরীসৃপ, পরবর্তীকালে যাদের বংশ সম্পুর্ন লোপ পেয়েছে। এই সরীসৃপদের ও উভচর জীবদের আবির্ভাব ঘটতে শুরু করেছিল পুরাজীবীয় অধিকল্পের শেষদিক থেকেই। গোটা মধ্যজীবীয় অধিকল্প জুড়ে তাদের আধিপত্য।

মধ্যজীবীয় অধিকল্পটিকে তিনটি কল্পে ভাগ করা হয়েছে: ট্রিয়াসিক (Triassic), যুরাসিক (Jurassic) ও ক্রিটাশুস (Cretaceous)। ক্রিটাশুস কল্প শেষ হবার আগেই সরীসৃপদের বংশ লোপ পেয়েছিল। তবে তার আগে থেকেই আবির্ভাব ঘটেছিল অন্য এক প্রকার জীবের, যাদের নাম স্তন্যপায়ী। গোড়ার দিকে এই স্তন্যপায়ীরা খুবই ছোট আর শরীরের গড়নের দিক থেকে একেবারেই প্রাথমিক ধরনের।

মধ্যজীবীয় অধিকল্পের পরেরটির নাম নবজীবীয়। শুরু আজ থেকে ৭ কোটি বছর আগে। অধিকল্পটিকে ভাগ করা হয়েছে পাঁচটি কল্পে: ইওসিন (Eocene), ওলিগোসিন (Oligocene), মাইওসিন (Miocene), প্লাইওসিন (Pliocene) ও প্লাইস্টোসিন (Pleistocene)। প্লাইস্টোসিনের পরেই সাম্প্রতিক কাল। প্লাইস্টোসিন ও সাম্প্রতিক—এই গোটা সময়কালকে অনেক সময়ে বলা হয়ে থাকে কোয়াটারনারি (Quaternary)। হোমো স্যাপিয়েন্‌স বা মানুষ এই প্লাইস্টোসিন কল্পের জীব, যার শুরু আজ থেকে ১০ লক্ষ বছর আগে। মানুষের ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে এই কল্পটির দিকে আমাদের বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে।

সময়ের এই মাপকাঠিটা আরেকবার চোখের সামনে তুলে ধরা যাক।

বয়স (কোটি বছরে)	কল্প	অধিকল্প
০·১	প্লাইস্টোসিন ও সাম্প্রতিক	
১·৫	প্লাইওসিন	
৩·৫	মাইওসিন	নবজীবীয়
৪·৫	ওলিগোসিন	
৭·০	ইওসিন	
১৪·০	ক্রিটাশুস	
১৭·০	যুরাসিক	মধ্যজীবীয়
১৯·৫	ট্রিয়াসিক	
২২·০	পার্মিয়ান	
২৭·৫	কার্বনিফেরাস	
৩২·০	ডিভোনিয়ান	পুরাজীবীয়
৩৫·০	সিলুরিয়ান	
৪২·০	অর্ডোভিসিয়ান	
৫২·০	ক্যামব্রিয়ান	
	প্রাক্-ক্যামব্রিয়ান	

কোন্ সময় থেকে কোন্ জীব তার একটা ছবিও এই সঙ্গে তুলে ধরা যাক।

জীব	কোন্ কল্প থেকে
সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও অ-মেরুদণ্ডী প্রাণী	ক্যামব্রিয়ান
মাছ	অর্ডোভিসিয়ান
ডাঙার উদ্ভিদ	সিলুরিয়ান
উভচর	ডিভোনিয়ান
সরীসৃপ	কার্বনিফেরাস

পাখি	যুরাসিক
স্তন্যপায়ী	ট্রিয়াসিক
মানুষ	প্লাইস্টোসিন

জীবজগতে মানুষই এসেছে সবচেয়ে পরে, প্লাইস্টোসিন কল্পে। বয়স তার দশলক্ষ বছরের বেশি নয়। মানুষ কি করে মানুষ হল তা জানতে হলে বিশেষভাবে তাকাতে হবে এই দশলক্ষ বছরের দিকে। তার আগে অবশ্যই জানা দরকার—মানুষ এল কোথা থেকে? কারা তার পূর্বপুরুষ? এই তত্ত্বতালাশের জন্যে আরো অনেক পিছনের দিকে তাকানো দরকার। প্রাণিজগতে ক্রমবিকাশের কোনো একটা লক্ষণ ফুটে উঠতে বা নতুন কোনো প্রজাতির উদ্ভব হতে সময় লাগে অন্তত পাঁচলক্ষ বছর। একালের কোনো কোনো প্রজাতির বয়স হয়ে গিয়েছে অন্ততপক্ষে তিনকোটি বছর। হোমো স্যাপিয়েন্স নামক প্রজাতির উদ্ভবের যে সূত্রগুলো খুঁজে বার করা হয়েছে তাও কয়েক কোটি বছরের।

এক্ষেত্রে প্রধান সূত্র, আগেই বলেছি, ফসিল। মানুষের পূর্বপুরুষের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে আমরাও বিশেষ করে তাকাব এই ফসিলের দিকেই। জীববিজ্ঞানীরা যেভাবে তাকিয়ে থাকেন সেভাবে। শরীরের দু-এক টুকরো হাড় বা দু-একটা দাঁত হয়তো পাওয়া গিয়েছে, আর কিছু নয়, তা থেকেই পুরো জীবটি সম্পর্কে খবর বার করা চাই। এমনকি জীবটির চেহারা পর্যন্ত, গায়ের লোম রক্ত ও মাংসপেশী সমেত। শুধু তাই নয়, কি-ভাবে সে চলাফেরা করত, কী খেত, কোথায় থাকত, ইত্যাদি খবরও। সবই দু-এক টুকরো হাড় বা দু-একটা দাঁত থেকে। ফসিল বলতে এই হাড় বা দাঁতই সচরাচর পাওয়া যায়। কেননা এ-দুটোই টিকে থাকতে পারে, যদি ঠিকমতো আস্তরণ পায় তাহলে বহুকাল পর্যন্ত। শরীরের অন্য সবকিছুরই আয়ু অতি সামান্য—কি চুল, কি নখ, কি চামড়া, কি মাংসপেশী। এগুলো সবই গলে বা পচে বা ক্ষয় হয়ে মাটির সঙ্গে

মিশে যায়। হাড় বা দাঁতই থাকে, বিশেষ করে দাঁত। মাত্র একবার সাইবেরিয়ার বরফের তলা থেকে পাওয়া গিয়েছিল একটি ম্যামথের আস্ত শরীর। আর একবার একটি গুহা থেকে খানিকটা শুকিয়ে যাওয়া চামড়া।

কাজেই হাড় ও দাঁতই প্রধান অবলম্বন।

হাড় ও দাঁত

ফসিল খুঁজতে খুঁজতে একটা হাড় হয়তো পাওয়া গেল। নিতান্তই একটা হাড়, যার গায়ে ছিটেফোঁটা মাংসও নেই। কিন্তু জীববিজ্ঞানীরা এই হাড়ের গায়েই পড়তে পারেন মাংস ও পেশীর চিহ্ন, প্রায় ছাপার হরফে বই পড়ার মতো। এই হাড়ের সঙ্গে একসময়ে যে-সমস্ত শিরা ও ধমনী যুক্ত ছিল তারা তাদের প্রাণের চিহ্ন রেখে গিয়েছে হাড়ের গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দাগ ফেলে। জীব-বিজ্ঞানীরা এই দাগগুলো পড়তে পারেন এবং অনায়াসেই তা থেকে অবয়বটি কল্পনা করতে পারেন। হাড়ের গড়ন থেকে বুঝতে পারেন জীবটির চলাফেরা কেমন, ইত্যাদি খবর।

একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা যাক।

ছবিতে তিনটি মাথার খুলি। ওপরে কুকুরের (প্রাইমেট্স নয়, স্তন্যপায়ী), মধ্যে শিম্পাঞ্জীর, নিচে মানুষের। প্রথমে তাকানো যাক মস্তিষ্কের আধারটির দিকে।

মস্তিষ্কের এই আধারটি নাম করোটিক (cranium)। এই আধারের আয়তন থেকে মস্তিষ্কের পরিমাণের একটা নির্ভুল মাপ পাওয়া সম্ভব। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে বড়ো মাপের করোটিক মানুষের, তারপরে শিম্পাঞ্জীর, তারপরে কুকুরের। তার মানে, মস্তিষ্ক বা মগজের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি মানুষের, তারপরে যথাক্রমে অন্য দুটি প্রাণীর। আরো একটি বিষয় লক্ষ করবার মতো। করোটিকের

মাপ বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে করোটিকের অবস্থান বদলে যাচ্ছে। কুকুরের মাথার খুলিতে মুখের প্রায় বরাবর পিছনদিকে করোটিক। শিম্পাঞ্জীর মাথার খুলিতে করোটিক উঠে এসেছে মুখের অনেকখানি ওপরের দিকে। মানুষের মাথার খুলিতে তুলনাগত বিচারে করোটিক
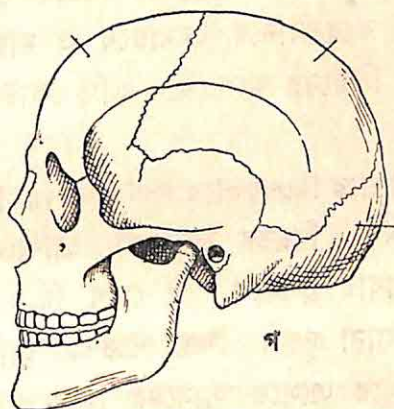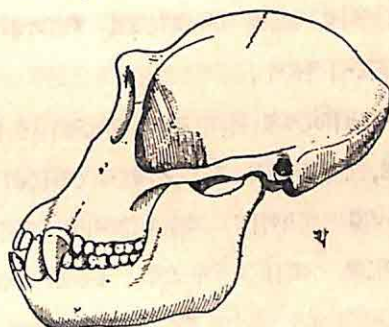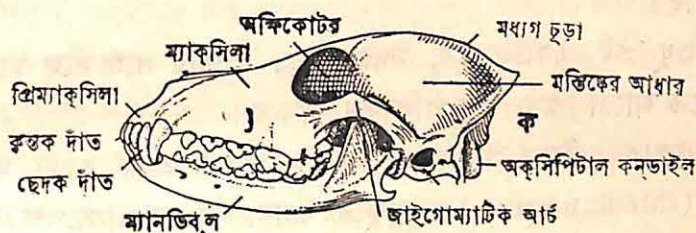
তিনটি মাথার খুলি

(ক) কুকুরের, (খ) শিম্পাঞ্জীর, (গ) মানুষের

তিনটি খুলিই দেখানো হয়েছে পাশ থেকে। বিভিন্ন অংশের তুলনামূলক আকার সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্যে ছবি তিনটি একই মাপে আঁকা।

রয়েছে মুখের প্রায় বরাবর ওপরে। এমনটি হবার একটি কারণ, মানুষের মগজের সামনের দিক অনেকখানি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, যার ফলে মানুষের কপাল মোটামুটি খাড়া। খাড়া কপালবিশিষ্ট হওয়াটা বিশেষ করে মানুষেরই চেহারাগত বৈশিষ্ট্য—একথাটা মনে রাখা দরকার।

শুধু এই একটিই নয়, মগজ বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার খুলিতে আরো কিছু কিছু পরিবর্তন আসছে।

কুকুরের খুলিতে রয়েছে ধারালো কিনারওলা একটি হাড়—মধ্যগ চূড়া (Median crest)। কুকুরের চোয়ালের যে-মাংসপেশী তার চর্বণক্ষমতার সহায়ক, তার জন্যে যে-হাড়ের অবলম্বন চাই—মধ্যগ চূড়া তারই একটি বাড়ানো অংশ।

কুকুরের খুলিতে করোটিকের সামনে অক্ষি-কোটর। এই কোটর কিন্তু কিছুটা অস্পষ্ট, কোটরের পিছনদিকে কোনো হাড়ের বেষ্টনী নেই। প্রাইমেট্স-এর বেলায় আয়োজনটি আরো সম্পূর্ণ। অ-প্রাইমেট্স-এর সঙ্গে প্রাইমেট্স-এর একটি বড়ো তফাতও এ-ব্যাপারে। প্রাইমেট্স-এর অক্ষি-কোটরে রয়েছে পুরো হাড়ের বেষ্টনী, এবং বিশেষ করে বানরে বনমানুষে ও মানুষে হাড়ের দেওয়াল থাকার ফলে পিছনের অংশ থেকে অক্ষি-কোটর পুরোপুরি আড়ালে।

অক্ষি-কোটরের ব্যাপারে বিশেষভাবে লক্ষ করবার বিষয় হচ্ছে অক্ষি-কোটরের অবস্থান। নিম্নতর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বেলায় অক্ষি-কোটর থাকে মাথার দু-দিকে, দুই চোখ দিয়ে তারা দেখে দু-দিকের আলাদা আলাদা দৃশ্য। কিন্তু উচ্চতর প্রাইমেট্স-এর বেলায় অক্ষি-কোটর ঘুরে এসেছে সামনের দিকে। দুই চোখ দিয়ে তারা দেখে বরাবর সামনের দিকের একই দৃশ্য, সামান্য ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। এর ফলে উচ্চতর প্রাইমেট্স-এর চোখে দৃশ্যটি হয় 'স্টিরিওস্কোপিক' (stereoscopic)। কথাটার মানে কি ? উচ্চতর প্রাইমেট্স দৃশ্যটি দেখে তার গভীরতা সমেত—অর্থাৎ

কোন্ বস্তুটি সামনে, কোন্ বস্তুটি দূরে, কতখানি সামনে, কতখানি দূরে ইত্যাদি বোধ সমেত। সিনেমার পর্দায় দেখা ছবির মতো একেবারেই নয়। আজকাল অবশ্য সিনেমার পর্দায় এমন ছবিও দেখানো হচ্ছে, বাড়তি একটা চশমা চোখে এঁটে দেখলে যা স্টিরিও-স্কোপিক। বাজারে স্টিরিওস্কোপ নামে যে যন্ত্র বিক্রি হয়, তার আকর্ষণ এই যে তার মধ্যে দিয়ে তাকালে কাগজের ছবিকে দেখায় বাস্তব দৃশ্যের মতো গভীরতা যুক্ত। ব্যবস্থাটা একই। স্টিরিওস্কোপের দুই লেন্সের সামনে থাকে দুটি ছবি—কিন্তু একই দৃশ্যের, সামান্য ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। সেই দৃশ্যটি যদি বাস্তব জগতের হত তাহলে আলাদা আলাদা চোখ দিয়ে আমরা যেমনটি দেখতাম হুবহু তাই।

এই স্টিরিওস্কোপিক দৃশ্য দেখার চোখ উচ্চতর প্রাইমেট্‌স-এর একটি বৈশিষ্ট্য। নিম্নতর প্রাইমেট্‌স-এর মধ্যেও চোখের দৃষ্টি বেশ কিছু পরিমাণে সামনের দিকে। কিন্তু একটা খরগোশের কথা ধরা যাক। খরগোশ কখনো সামনের দৃশ্য দেখে না, দুই পৃথক চোখ দিয়ে দেখে দু-দিকের দুই পৃথক দৃশ্য।

অক্ষি-কোটরের নিচের দিকে গালের অংশে একটি হাড়ের নাম জাইগোম্যাটিক আর্চ (zygomatic arch)। কানের ফুটো থেকে ওপরের চোয়াল পর্যন্ত এই হাড়ের বিস্তৃতি একটি আর্চের মতো। এই হাড়টিও চর্বণ-সহায়ক মাংসপেশী ধারণ করার জন্যে। নিম্নতর স্তন্যপায়ীদের মধ্যে এই হাড়টি হয় বেশ শক্তপোক্ত এবং চোখে পড়ার মতো। প্রাইমেট্‌স-এর মধ্যে এই হাড়টি ক্রমেই খর্ব হবার দিকে।

কুকুরের খুলিতে নাকের এলাকাটি বেশ বড়োসড়ো এবং অক্ষি-কোটরের সামনের দিকে বেশ খানিকটা বাড়ানো। এখানে প্রধানত রয়েছে ম্যাক্‌সিলা (maxilla) বা ওপরের চোয়াল। এই হাড়েই কুকুরের ওপরের পাটির অধিকাংশ দাঁতের মূল। ওপরের পাটির ছেদক দাঁতগুলো যুক্ত রয়েছে অন্য একটি হাড়ের সঙ্গে যার নাম প্রিম্যাক্‌সিলা। নিচের চোয়াল ম্যানডিব্‌ল (mandible)

বেশ বড়োসড়ো আর পিছন দিকে গিয়েছে কানের ফুটো পর্যন্ত। সেখানে হাড়টি এমনভাবে আঁটা যে সহজেই নড়ানো-চড়ানো চলে। এই নিচের চোয়ালেই রয়েছে কুকুরের নিচের পাটির সবকটি দাঁত।

প্রাইমেট্‌স-এর বেলায় কিন্তু নাক চোয়াল ও দাঁতের আয়োজন এতখানি জোরালো নয়। প্রাইমেট্‌স আঁকড়ে ধরা ইত্যাদি কাজের জন্যে ব্যবহার করে হাত, দাঁত নয়। ফলে প্রাইমেট্‌স-এর ঘ্রাণশক্তি নিম্নতর স্তন্যপায়ীদের মতো প্রবল নয়। কুকুরের শিম্পাঞ্জীর ও মানুষের মাথার খুলি তিনটি একে অপরের সঙ্গে খুঁটিয়ে তুলনা করলে তফাতগুলো সহজেই চোখে পড়বে।

মাথার খুলি নিয়ে আলোচনা একটু বিশদই হয়ে গেল। কিন্তু এই আলোচনা থেকে এটুকু নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে যে এই মাথার খুলির যে-কোনো একটুকরো হাড় যদি জীববিজ্ঞানীর হাতে পড়ে তাহলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারবেন হাড়টি কোন্ প্রাণীর— কুকুরের না শিম্পাঞ্জীর না মানুষের।

এ-আলোচনা শেষ করার আগে মাথার খুলির আরো একটি বিশেষ লক্ষণের কথা বলতে চাই। সেটি হচ্ছে বেশ বড়ো আকারের একটি ফুটো যার নাম মহাবিবর (foramen magnum)। এই মহাবিবরটির মধ্যে দিয়েই মেরুদণ্ডের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগাযোগ। মহাবিবরের পাশে অক্‌সিপিটাল কন্‌ডাইল (occipital condyle)। ঘাড়ের ওপরে মুণ্ডুটি যে নড়াচড়া করতে পারে তা এই হাড়ের জন্যে।

কুকুর বা কুকুরের মতো চার-পা-ওলা প্রাণীদের মাথার খুলিতে মহাবিবরটি থাকে খুলির পিছনের দিকে। কেননা দাঁড়ানো অবস্থায় এই প্রাণীগুলোর মেরুদণ্ড থাকে জমির সমান্তরালে আর মেরুদণ্ডের প্রান্ত থেকে মুণ্ডুটি ঠেলে বেরিয়ে যায় সামনের দিকে। কিন্তু মানুষের বেলায় মুণ্ডুটি থাকে মেরুদণ্ডের ওপরে খাড়া অবস্থায়। কাজেই মানুষের খুলিতে মহাবিবর থাকে খুলির নিচের দিকে।
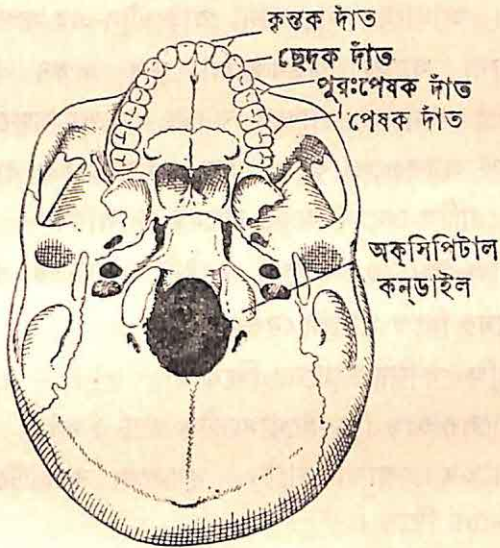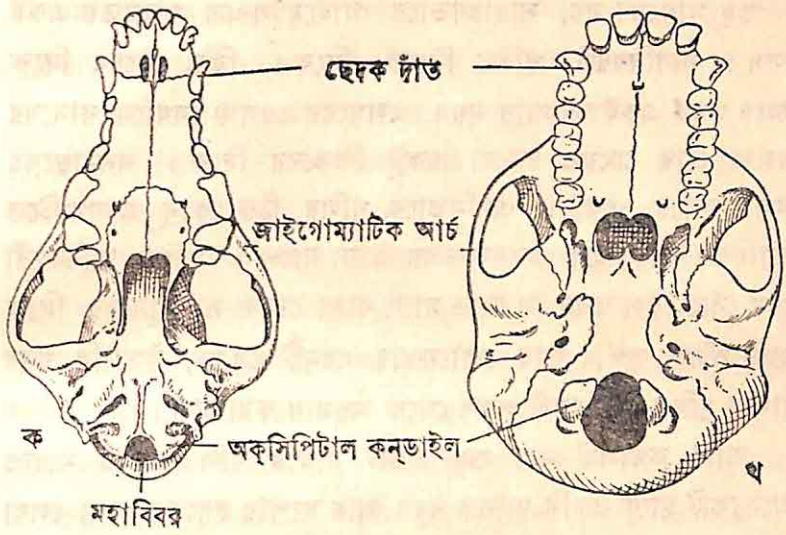
মহাবিবর

(ক) কুকুরের, (খ) শিম্পাঞ্জীর, (গ) মানুষের

তিনটি খুলিতেই ফোরামেন ম্যাগ্‌নাম বা মহাবিবরের অবস্থান দেখানো হয়েছে। কুকুরের মাথার খুলিতে মহাবিবরটি একেবারে পিছন দিকে, শিম্পাঞ্জীর মাথার খুলিতে আরো একটু সামনে, মানুষের মাথার খুলিতে একেবারেই সামনে।

শুধু মানুষের নয়, সাধারণভাবে প্রাইমেট্‌স-এর খুলিতেও একই লক্ষণ : মহাবিবরটি খুলির নিচের দিকে। কিন্তু নিচের দিকে হলেও হুবহু একই জায়গায় নয়। লেমুরের বেলায় যেখানে, বানরের বেলায় তার চেয়েও আরো একটু ভিতরের দিকে। বনমানুষের বেলায় আরো একটু। এমনিভাবে, খুলির ঠিক কোন্‌ জায়গাটিতে মহাবিবর, তা থেকে অনেক খবর জানা যাচ্ছে। খুলির অধিকারী যখন বেঁচে ছিল তখন সে চলত মাথা খাড়া রেখে না সামনের দিকে একটু ঝুঁকে, অর্থাৎ তার চলাফেরার ধরনটি কেমন, ইত্যাদি খবর মাথার খুলির এই একটি লক্ষণ থেকে অনুমান করা চলে।

আস্ত কঙ্কালটি নয়, শুধু একটি মাথার খুলি। তার মধ্যেও প্রত্যেকটি হাড়ে এমনি অনেক খবর প্রায় ছাপার হরফের মতো লেখা রয়েছে যেন। আমাদের আলোচনা প্রাইমেট্‌স-এর সম্পর্কে। মাথার খুলিতেও দেখা যাচ্ছে কতকগুলো মূল লক্ষণ বিশেষ করে প্রাইমেট্‌স-এর বেলাতেই পাওয়া যাচ্ছে, যে-সব লক্ষণে প্রাইমেট্‌স বিশিষ্ট। এই লক্ষণগুলো কী? এক এক করে ধরা যাক :

১। করোটিক ক্রমেই বড়ো, ক্রমেই গোলাকার।

২। অক্ষি-কোটরে সম্পূর্ণ বেষ্টনী, উচ্চতর প্রাইমেট্‌স-এর বেলায় পিছনের দিকে হাড়ের দেওয়াল।

৩। অক্ষি-কোটর সামনের দিকে।

৪। গালের হাড় (জাইগোম্যাটিক আর্চ) খর্ব।

৫। নাকের এলাকা খাটো, মুখমণ্ডল করোটিকের সামনের দিকে নয়, নিচের দিকে।

৬। নাকের হাড়ের বিন্যাসে কম জটিলতা।

৭। মহাবিবর খুলির নিচের দিকে।

দাঁত

হাড়ের বেলায় যেমন দাঁতের বেলাতেও তেমনি নানা বৈশিষ্ট্য,

যা ক্রমবিকাশেরই লক্ষণ। আমরা আলোচনা তুলব সাধারণভাবে স্তন্যপায়ীদের ও বিশেষভাবে প্রাইমেট্‌স-এর দাঁত সম্পর্কে।

স্তন্যপায়ীদের দাঁত এক রকমের নয়, নানা রকমের। আমাদের নিজেদের দাঁতের দিকে তাকালেও এই নানা রকমের দাঁতের নমুনা দেখতে পাই। কী দেখি?

প্রত্যেক পাটিতে প্রত্যেক দিকে সামনে রয়েছে দুটি চওড়া দাঁত, সিধে বাটালির মতো। এই দুটি হচ্ছে কৃন্তক (incisor), যার সাহায্যে খাবারের টুকরো ফালা ফালা করা হয়। কৃন্তকের পরের দাঁতটি ছেদক (canine)। অনেক স্তন্যপায়ী জীব এই দাঁতের সাহায্যে শিকার কামড়ে ধরে। অনেকের বেলায় এই দাঁত আক্রমণের ও আত্মরক্ষার হাতিয়ার! পরের দুটি পুরঃপেষক (premolar)। পরের তিনটি পেষক (molar)। পুরঃপেষক ও পেষকের সাহায্যে গুঁড়ানো চিবানো ইত্যাদি কাজ করা হয়ে থাকে।

তাহলে স্তন্যপায়ী জীবে দাঁত পাওয়া যাচ্ছে চার রকমের : কৃন্তক, ছেদক, পুরঃপেষক ও পেষক। কিন্তু প্রত্যেকের বেলায় দাঁতের সংখ্যা সমান নয়। আকারেও ইতরভেদ। কারও বড়ো। কারও ছোট। মানুষের বেলায় প্রত্যেক পাটির প্রত্যেক দিকে কৃন্তক দুটি, ছেদক একটি, পুরঃপেষক দুটি, পেষক তিনটি। তার মানে প্রত্যেক পাটিতে দু-দিক মিলিয়ে ষোলটি করে। দু-পাটিতে বত্রিশটি। পেষক দাঁতগুলোকে বাদ দিলে অন্য সব দাঁতই দু-বার করে হয়। প্রথম বারে 'দুধে' দাঁত। সেগুলো পড়ে যায়। আবার নতুন করে দাঁত ওঠে।

স্তন্যপায়ী জীবের দাঁত বরাবর একরকমের নয়, জীবে জীবেও প্রকারভেদ। পেষক দাঁতগুলো বর্তমান আকার নিয়েছে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে। কোথাও ছিল কাঁচির ফলার মতো। একটির ওপরে আরেকটি এসে পড়ত ছিন্নভিন্ন করে দেবার জন্যে। কোথাও ত্রিকোণাকৃতি চুড়ো বিশিষ্ট, প্রত্যেক কোণে ধারালো স্ফীতি। শেষোক্ত প্রকার পেষক দাঁতই পেয়েছিল একালের স্তন্যপায়ীদের

পূর্বপুরুষরা। শুধু পিষে ফেলার কাজটুকুই নয়, আঁকড়ে ধরা, ছিন্নভিন্ন করা, গুঁড়োগুঁড়ো করা ও চিবানোর কাজ এই বিশেষ আকারের পেষকের সাহায্যে খুব ভালোভাবে হয়ে থাকে। প্রাইমেট্‌স-এর মুখেও এই শেষোক্ত ধরনের পেষক দাঁত, যদিও আরো জটিল। আর শুধু এই পেষক দাঁতেই নয়, অন্যান্য দাঁতেও সমভাবে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছাপ।

সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে জানা যায় দাঁতের সংখ্যাও কমেছে। দাঁত থাকার কথা ৪৪টি করে—কৃন্তক ৩টি, ছেদক ১টি, পুরঃপেষক ৪টি, পেষক ৩টি। এক-এক দিকে ১১টি, দু-দিক মিলিয়ে ২২টি, সবসুদ্ধ, ৪৪টি। নিচের ছবিটি দেখলে এই দাঁতগুলোর অবস্থান ও চেহারা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা হবে।
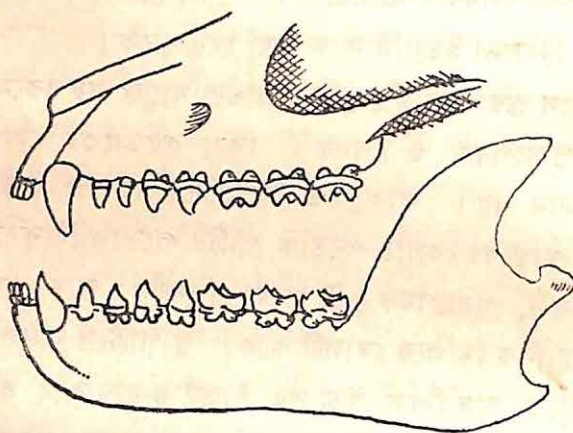
লক্ষ করবার বিষয়, প্রত্যেক পাটিতে কৃন্তক দাঁত রয়েছে তিনটি তিনটি করে ছ'টি। ফসিলের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, ক্রমবিকাশের একেবারে গোড়ার দিকেই কৃন্তকের সংখ্যা প্রত্যেক পাটিতে ছ'টি নয়, চারটি—দুটি কম। হালের পৃথিবীতে যে প্রাইমেট্‌স দেখা যাচ্ছে তাদের সকলেরই এই হাল। দাঁতের প্রত্যেক পাটিতে দুটি করে কৃন্তক কম হওয়াটা প্রাইমেট্‌স-এর একটা বৈশিষ্ট্যও বটে। উচ্চতর প্রাইমেট্‌স-এর বেলায় (বানরে, বনমানুষে ও মানুষে) কৃন্তক দাঁতের

পেরেক-সদৃশ চেহারাও বজায় থাকে নি। হয়ে উঠেছে ধারালো ধারবিশিষ্ট ছুরির ফলার মতো। আবার অধিকাংশ লেমুরের বেলায় কৃন্তক দাঁতের অন্যরকম চেহারা। সেখানে নিচের পাটির চারটি কৃন্তক ও ছুটি ছেদক একেবারে গায়ে গায়ে লাগানো, কৃন্তকগুলো লম্বাটে ও সরু—সব মিলিয়ে একটা চিরুনির আকার। আর সত্যি সত্যিই গায়ের লোম আঁচড়াবার জন্যে এই দাঁতগুলোকে চিরুনির মতোই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

প্রাইমেট্‌স-এর ছেদক দাঁত আছে চারটি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে (যেমন বেবুন) এই দাঁতগুলো ধারালো ছোরার মতো। অন্যত্র, কি আকারে কি চেহারায় ছেদকের সঙ্গে কৃন্তকের বিশেষ ভেদাভেদ নেই—আলাদা করে চেনা যায় না।

সংখ্যা কমেছে পুরঃপেষকেরও—প্রত্যেক পাটিতে প্রত্যেক দিকে চারটি থেকে ছুটিতে। এক-নম্বর ও ছু-নম্বরটি অদৃশ্য হল, তিন ও চার-নম্বরটি হয়ে উঠল আরো জটিল।

জটিল হয়ে উঠছে পেষকও। ছুটি করে ছিল, ছুটি করেই আছে, কিন্তু তিনকোণবিশিষ্ট প্যাটার্নটি হয়ে উঠতে চেয়েছে চারকোণবিশিষ্ট। ফসিলের সাক্ষ্যেও এ-কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। গোড়ার দিকে যে-সব প্রাইমেট্‌স-এর অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে তাদের সকলেরই পেষক দাঁতে ক্রমবিবর্তনের এই লক্ষণ।

আগে বলেছি, দাঁত বহুকাল টিকে থাকে। দাঁতের ওপরে একটি স্বাভাবিক আস্তরণ থাকে বলে হাড়ের চেয়েও বেশি কাল। আমরা যেটুকু আলোচনা তুললাম তা থেকেও বোঝা যাচ্ছে, ফসিল হিসেবে একটি দাঁতও যদি পাওয়া যায় তাহলে জীববিজ্ঞানীরা এই সামান্য নিদর্শন থেকেও দাঁতের অধিকারী প্রাণীটি সম্পর্কে অনেক খবর সংগ্রহ করতে পারেন। করেছেনও। এই খবরগুলোর দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। তার আগে হালের এই পৃথিবীতে জ্যান্ত প্রাইমেট্‌স যারা আছে তাদের সম্পর্কে একটু খবর নেওয়া যাক

প্রাইমেট্‌স—একটি বর্গ

আগে বলেছি, প্রাইমেট্‌স একটি বর্গের অন্তর্ভুক্ত। মেরুদণ্ডীরা হচ্ছে একটি পর্ব, স্তন্যপায়ীরা যে-পর্বের একটি শ্রেণী, প্রাইমেট্‌স যে-শ্রেণীর একটি বর্গ। তার মানে প্রাইমেট্‌স মেরুদণ্ডীও বটে, স্তন্যপায়ীও বটে। তাছাড়াও আরো কিছু।

এই আরো কিছু বলতে কী কী তার স্পষ্ট সংজ্ঞা দিতে হলে মুশকিলে পড়তে হয়। প্রাইমেট্‌স-এর এমন কী বৈশিষ্ট্য আছে যার সাহায্যে এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দল থেকে তাদের আলাদা করে চেনা যায়? স্বীকার করতে হয়, নেই। বরং বলতে হয়, বৈশিষ্ট্য না থাকাটাই বৈশিষ্ট্য। কথাটা একটু ব্যাখ্যা করা যাক। প্রাইমেট্‌স যেমন একটি বর্গ, উঙ্গুলাটা (Ungulata) তেমনি আর একটি। এই শেষোক্ত বর্গের বৈশিষ্ট্য কী? বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খুর, তার পায়ের খুর। যেমন ঘোড়া। মানুষের কিন্তু হাতে ও পায়ে সেই আদ্যিকালের মতো এখনো পাঁচটি করে আঙুল। শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নয়, হাড়ের গঠনেও এখনো সেই পুরনো ধারাই মোটামুটি বজায় আছে। যেমন ক্ল্যাভিক্‌ল (clavicle) ও কলার বোন (collar-bone)। অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের মধ্যে এই দুটি হাড় ক্রমশ অবলুপ্তির দিকে, কিন্তু মানুষের মধ্যে এখনো পুরোমাত্রায় বজায়। ধরা যাক দাঁতের কথা। এক্ষেত্রেও প্রাইমেট্‌স-এর কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, যেমন আছে হাতির, গোরু-ঘোড়ার বা বাঘ-সিংহের।

বলা হয়ে থাকে, প্রাইমেট্‌স-এর বিশেষ জীবনযাত্রার জন্যেই এই বৈশিষ্ট্যহীনতা। প্রাইমেট্‌স অধিকাংশই থাকে গাছের ডালে, ট্রপিক বা আধা-ট্রপিক অঞ্চলে। গাছের ডালে থাকে নি কে? স্তন্যপায়ী জীবরা যেখান থেকে এসেছে, প্রায় সকলেই সেখান থেকে, এমন মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। এদিক থেকে গাছের ডালে থাকাটা আদিমতারই লক্ষণ। আর গাছের ডালে থাকতে হলে সবচেয়ে বেশি কী দরকার? হাতের ও পায়ের এমন গড়ন যাতে

আঁকড়ে ধরতে বা ঝুলতে কোনো অসুবিধে না হয়। এ-কারণেই হাতে ও পায়ে পাঁচটি করে আঙুল, ক্ল্যাভিক্‌ল ইত্যাদি। পরবর্তী কালেও যারা গাছের ডালেই থেকে গিয়েছে তাদের আর শারীরগত কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় নি। সেই পাঁচটা করে আঙুল, সেই কলার-বোন ইত্যাদি। কিন্তু যে-সব স্তন্যপায়ী গাছের ডাল ছেড়ে মাটির জীবন শুরু করেছিল তাদের বেলায় কিন্তু যেমনটি ছিল তেমনটি থাকে নি। জোরে ছুটবার প্রয়োজনে কারও কারও পায়ের আঙুল কমে গিয়েছে, কলার-বোন থাকে নি ও এমনি আরো অনেক কিছু। কারও কারও পেষক দাঁতগুলো হয়ে উঠেছে অনেকখানি জটিল। কারও গজিয়েছে শিঙ, কারও গজদন্ত, কারও শক্ত শিরদাঁড়া, কারও প্রচণ্ড থাবা ইত্যাদি। গাছের ডালে যারা থেকে গিয়েছে তাদের আত্মরক্ষার জন্যে এতসব আয়োজনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। খানিকটা পটুতা ও খানিকটা চালাকি থাকলেই কাজ চলে যেত। ফলে হাত-পায়ের গড়ন যেমন ছিল তেমনই থেকে গেল কিন্তু বাড়তে লাগল মগজ খাটাবার ক্ষমতা। ফলে মগজের আয়তন ও জটিলতাও। এ-লক্ষণটির সূত্রপাত ক্রমবিকাশের একেবারে গোড়ার দিক থেকেই। জীবনযাপনের তাগিদেই প্রাইমেট্‌স হয়ে উঠেছে মগজবান।

মাটিতে যারা জীবন কাটাচ্ছে তাদের মধ্যে ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠার একটা ঝোঁক লক্ষ করা যায়। গন্ধ শুঁকে শিকারের পিছু নেওয়া বা অন্য কেউ শিকার করতে আসছে কিনা সে-বিষয়ে সজাগ হওয়া যেতে পারে। গন্ধ ধরবার ক্ষমতা যার যতো বেশি উভয় ক্ষেত্রেই তার ততো সুবিধে। কিন্তু গাছের ডালে যারা জীবন কাটাচ্ছে তাদের বেলায় ঘ্রাণশক্তির চেয়েও দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা বেশি করে দরকার। কেননা গাছের এক ডাল থেকে আরেক ডালে লাফিয়ে পড়তে হলে দুটি ডালের মাঝখানের দূরত্ব কতখানি সে-সম্পর্কে অতিমাত্রায় নির্ভুল ধারণা চাই। এ-কারণে মাটির স্তন্যপায়ীদের ঘ্রাণশক্তি যতো তীক্ষ্ণ হয়েছে দৃষ্টিশক্তি ততো নয়। আবার গাছের

ডালের স্তন্যপায়ীদের দৃষ্টিশক্তি যতো তীক্ষ্ণ হয়েছে ঘ্রাণশক্তি ততো নয়।

গাছের ডালে জীবন কাটাতে হলে হাত ও পায়ের এমন গড়ন হওয়া চাই যাতে আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা থাকে। ফলে, নখরের (claw) জায়গায় আসে চ্যাপটা নখ (nail), আঙুলের ডগায় মাংসের প্যাড ইত্যাদি। এমন সব আয়োজন যাতে আঁকড়ে ধরার সুবিধে।

আরো একটি কথা। আঁকড়ে ধরার প্রয়োজন তো সব প্রাণীরই আছে, চার-পা-ওলা যে-সব স্তন্যপায়ী মাটির জীবন কাটাচ্ছে—তাদেরও। এই প্রাণীগুলো আঁকড়ে ধরে কৃন্তক ও ছেদক দাঁতের সাহায্যে। কিন্তু প্রাইমেট্‌স? আঁকড়ে ধরার জন্যে প্রাইমেট্‌স ব্যবহার করে হাত। দাঁত নয়—হাত। এ-কারণে প্রাইমেট্‌স-এর চোয়াল ও দাঁতের গড়ন খুব একটা শক্তপোক্ত হবার দরকার হয় না। হয়ও নি। কিন্তু মাটিতে যারা থাকে সেই চার-পা-ওলা স্তন্যপায়ীদের বেলায় হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা আছে যে হাতের ও পায়ের তেমনি হাত-পা থাকাটা প্রাইমেট্‌স-এর বিশেষ লক্ষণ। এরা হাত মুঠো করতে পারে। বা, হাত মুঠো করতে হলে হাতের আঙুলগুলো যেভাবে ছড়াতে বা বাঁকাতে হয়, যেভাবে বুড়ো আঙুলটি নড়াচড়া করতে হয়—তা করার ক্ষমতা এদের আছে। বিশেষ করে বুড়ো আঙুলটি। একা বুড়ো আঙুল থাকে একদিকে। নানাভাবে নানাদিকে নড়াচড়া করার ক্ষমতা থাকা দরকার এই আঙুলটির। ফলে বুড়ো আঙুলটি ক্রমেই মোটা হয়ে উঠেছে। ক্রমেই শক্তিধর। যেমন হাতের তেমনি পায়ের। আঁকড়ে ধরার কাজটি যেমন হাত দিয়েও করা চলে, তেমনি পা দিয়েও। এদিক থেকে প্রাইমেট্‌স-এর পা-দুটিও প্রায় হাতের মতোই, একমাত্র মানুষ ছাড়া।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে প্রাইমেট্‌স-এর সম্পর্কে যেটুকু ধারণা

করা গেল তা সংক্ষেপে এই : প্রাইমেট্‌স স্তন্যপায়ী প্রাণী। অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে এদের আলাদা করে চেনা যায় কতকগুলো ক্রমবিকাশগত লক্ষণের সাহায্যে। প্রাইমেট্‌স-এর মস্তিষ্ক বৃহৎ ও জটিল (সবচেয়ে বৃহৎ ও সবচেয়ে জটিল মানুষের)। প্রাইমেট্‌স-এর পেষক দাঁত অপেক্ষাকৃত সরল প্যাটার্নের, ঘ্রাণশক্তি কম, দৃষ্টিশক্তি তদনুপাতে প্রখর। হাতের ও পায়ের আঙুলে নখর নেই, আছে চ্যাপটা নখ। আঙুলগুলো খুশিমতো নড়াচড়া করতে পারে, বিশেষ করে বুড়ো আঙুল। আর এই আঙুলগুলোর সাহায্যে পারে আঁকড়ে ধরতে। প্রাইমেট্‌স-এর মধ্যে একমাত্র মানুষের পা-দুটোই আঁকড়ে ধরার কাজের পক্ষে উপযুক্ত নয়, যদিও মানুষের পায়ের পাতাটি চ্যাটালো, আঙুলও পাঁচটি, বুড়ো আঙুলটি মোটাসোটা। কিন্তু মানুষ অন্য একটি কাজ পারে যা অন্য প্রাইমেট্‌স-এর ক্ষমতার বাইরে। তা হচ্ছে খাড়া হয়ে দাঁড়ানো। মানুষের যেমন আছে সবচেয়ে বৃহৎ ও জটিল মস্তিষ্ক, তেমনি অসাধারণ নিম্নাঙ্গ। এই নিম্নাঙ্গের ওপরেই গোটা শরীরটা খাড়া হয়ে থাকে তার সমস্ত ভর সমেত।

প্রাইমেট্‌স কত রকমের

যদিও লেমুর থেকে আরম্ভ করে মানুষ পর্যন্ত সবাইকে একই দলে ফেলা হচ্ছে, বা একই বর্গে, তাই বলে সবাই একদরের নয়। একের সঙ্গে অপরের প্রচুর পার্থক্য। এই পার্থক্যের বিচারে গোটা বর্গটিকে আবার কয়েকটি উপবর্গে ভাগ করা চলে। তুলনামূলক শারীরতত্ত্ববিদ ও জীবাশ্মতত্ত্ববিদরা একাজটি করতে গিয়ে নানা পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। আমরা উল্লেখ করছি সাম্প্রতিক একটিমাত্র পদ্ধতির।

এই পদ্ধতি অনুসারে প্রাইমেট্‌স বর্গটিকে দুটি উপবর্গে ভাগ করা

হয়েছে: প্রোসিমাই (Prosimii) ও অ্যান্থ্রোপয়ডী (Anthropoidea)।

নামগুলো নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। প্রাইমেট্স-এর গোটা দলটির দিকে তাকালে যে কেউ বুঝতে পারবেন মোটা একটি দাগ টেনে দলটিকে অনায়াসে দু-ভাগ করা চলে। ২৯ পৃষ্ঠায় যে-ছবিটি ছাপা হয়েছে, সেই ছবিতেও ভাগাভাগির চেহারাটা স্পষ্ট। ক খ ও গ চিহ্নিত প্রাণী তিনটি একদলে পড়ে। এই দলটিকে বলতে পারি লেমুরদের দল। **ঘ ঙ ও চ** চিহ্নিত প্রাণী তিনটি ও মানুষ পড়ে অন্য দলে। বলতে পারি মানুষ ও মনুষ্যসদৃশ বানরের দল।

মনুষ্যসদৃশ বানর! বানর বটে কিন্তু চেহারার দিক থেকে মানুষের মতো। শুনতে আমাদের খারাপ লাগতে পারে কিন্তু মানুষের সঙ্গে বানর ও বনমানুষের মিলগুলো এত স্পষ্ট যে না মেনে উপায় নেই। বিজ্ঞানীর চোখ নিয়ে তাকাতে হয় না, সাধারণ চোখেই ধরা পড়ে।

একটি বানর, একটি বনমানুষ ও একটি মানুষকে পাশাপাশি রেখে তাকানো যাক। কী দেখি? তিনটি প্রাণীরই মস্তিষ্কের আধার বা করোটিক অন্যান্য স্তন্যপায়ীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড়ো ও গোলাকার। মুখগুলো ফ্ল্যাট বা চ্যাপটা। চোখের দৃষ্টি সরাসরি সামনের দিকে। কান ছোটখাটো (নিম্নতর স্তন্যপায়ীদের কানদুটো প্রকাণ্ড হয়ে মাথার দু-দিকে বেরিয়ে থাকে)। মুখের চেহারা ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। ঠোঁটদুটো নানা ভঙ্গিতে নড়াতে পারে (বিশেষ করে ওপরের ঠোঁট, নিম্নতর স্তন্যপায়ীদের মতো ওপরের ঠোঁট মাড়ির সঙ্গে আঁটা নয়)। হাত আছে দুটি (সত্যিকারের হাত, সামনের পা নয়, যে-হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে পারে)। হাতের ও পায়ের আঙুল নখরযুক্ত নয়, নখযুক্ত, চ্যাপটা ছড়ানো নখ।

এ তো গেল বাইরের মিল। সাধারণ চোখেই যা ধরা পড়ে। আর বিজ্ঞানীর চোখ নিয়ে তাকালে ধরা পড়বে আরো বহু

মৌলিক বিষয়ের মিল—যেমন, বাচ্চা হওয়ার ব্যাপারে, মস্তিষ্কের গড়নে ইত্যাদি।

বানর, বনমানুষ ও মানুষের এই দলটির নাম অ্যান্থ্রোপয়ডী। এই দলটিকে আবার তিনটি উপদলে ভাগ করা চলে, বা তিনটি পরিবারে। মানুষ ও বনমানুষদের নিয়ে একটি পরিবার (Honinoidea)। পুরনো জগতের (old world) বানরদের নিয়ে একটি পরিবার (Cercopithecoidea)। নতুন জগতের (new world) বানরদের নিয়ে একটি পরিবার (Ceboidea)।

লক্ষ করবার বিষয় এই যে মানুষ ও বনমানুষকে একই পরিবারে ফেলা হয়েছে। ফেলতেই হয়, কেননা জ্ঞাতিভাইদের মধ্যে যেমন মিল তেমনি মিল মানুষ ও বনমানুষের মধ্যে।

এবারে আমরা, প্রাইমেট্স বলতে যাদের বোঝাচ্ছে, উঁচু থেকে নিচু পর্যন্ত তাদের কতকগুলো পরিবারের দিকে চোখ রাখব।

বনমানুষ

ইংরেজিতে যাদের বলা হয় অ্যান্থ্রোপয়েড এপ্, বাংলায় বলতে পারি মনুষ্যসদৃশ বানর, এদের আমরা বলেছি বনমানুষ। যে নামই দেওয়া হোক—এরা বানরও নয়, মানুষও নয়, খানিকটা মানুষের মতো বানর, খানিকটা বানরের মতো মানুষ। মানুষের সঙ্গে একটা বানরের চেহারার যতোটা না মিল তার চেয়ে অনেক বেশি মিল না-বানর না-মানুষ এই বনমানুষের সঙ্গে। যেমন, মানুষ ও বনমানুষ—

উভয়েরই মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত বড়ো,
উভয়েরই মাথার খুলি, শরীরের কাঠামো, দাঁতের
গড়নে অনেক খুঁটিনাটি মিল,
উভয়ের মধ্যেই খাড়া হয়ে দাঁড়াবার দিকে ঝোঁক,
উভয়েই লেজবিহীন।

এগুলো সবই গড়নগত মিল, যে কারণে মানুষ ও বনমানুষের চেহারায় এত অভিন্নতা। তবে শুধু গড়নগত মিলের জন্যেই এই দুটি প্রাণীকে পাশাপাশি রাখা হয় নি। তাছাড়াও আছে মৌলিক শারীরগত প্রক্রিয়ার মিল। যেমন, রক্তের রাসায়নিক পরীক্ষায়। মস্তিষ্কের গড়নে। বাচ্চা যখন পেটে থাকে তখন যে-সমস্ত টিস্যু বা কলার মাধ্যমে বাচ্চার পুষ্টিসাধন হয় তাদের গঠনে। এমনি আরো নানা ব্যাপারে।

মিল যেখানে এত বেশি সেখানে সম্পর্কটা স্বীকার করতেই হয়। যেমন-তেমন সম্পর্ক নয়—একেবারে রক্তের সম্পর্ক। জ্ঞাতি সম্পর্ক।

তবে সম্পর্ক যতোই ঘনিষ্ঠ হোক, এই দুই জ্ঞাতির চলাফেরা একেবারেই ভিন্ন। মানুষ চলাফেরা করে মাটিতে, বনমানুষ প্রধানত গাছের ডালে। এ-কারণে বনমানুষের শরীরের গড়নে কতকগুলো বিশেষত্ব আছে। বনমানুষ চলে ডাল থেকে ডালে দোল খেতে খেতে। তাদের হাতদুটো একাজের উপযোগী। হাতদুটো প্রকাণ্ড লম্বা, হাতের বুড়ো আঙুল অপেক্ষাকৃত ছোট (বনমানুষের হাত আঁকড়ে ধরার জন্যে ততোটা নয়, যতোটা ডাল থেকে ডালে দোল খেতে খেতে যাবার সময়ে আঁকশি হিসেবে কাজ করার জন্যে)। হাতের এই বিশেষ গড়ন হওয়াটা অবশ্যই ক্রমবিকাশের ফল এবং একটি অগ্রগতি। মানুষের হাতের গড়নে এই বিশেষত্ব নেই। অন্তত এই একটা ব্যাপারে বনমানুষের চেয়ে মানুষ পিছিয়ে আছে।

আজকের দিনে বনমানুষ দেখতে পাওয়া যায় চার রকমের। এই চার রকমটিই বরাবর ছিল তা নয়। অনেকগুলো রকম আগেই লোপ পেয়েছে। টিকে আছে মাত্র চারটি: (১) গোরিলা, (২) শিম্পাঞ্জী, (৩) ওরাং-ওটাং ও (৪) গিবন।

আফ্রিকার বিষুব অঞ্চলের জঙ্গলে আছে গোরিলা, প্রাইমেট্‌স-এর মধ্যে আকারে যারা সবচেয়ে বড়ো। লম্বায় চওড়ায় ওজনে

সবাদিক থেকেই। একটা পুরুষ গোরিলা লম্বায় প্রায় সাড়ে-ছ' ফুট, ওজনে ২০০ থেকে ৩০০ কেজি। খাড়া হয়ে যখন দাঁড়ায় তখন হাতদুটো ঝুলে পড়ে হাঁটুরও নিচে। দোল খেতে খেতে গাছের ডাল থেকে ডালে চলাফেরা করার উপযোগী হাত। তবুও আজকালকার গোরিলারা কিন্তু গাছের ডালে থাকে খুবই কম। ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঝোপঝাড়েই জীবন কাটায়। চলাফেরা করতে গিয়ে অনেক সময়ে হাতদুটিকেও পায়ের মতো ব্যবহার করে বসে। অর্থাৎ ভঙ্গিটা হয়ে ওঠে চার-পা-ওলা জন্তুর মতো।

এই আফ্রিকার জঙ্গলেই থাকে আরো একদল বনমানুষ—শিম্পাঞ্জী। ওজনে মানুষের মতোই, লম্বায় পাঁচ ফুটের বেশি নয়। গাছের ডালে ডালে দোল খেয়ে চলাফেরা করার উপযোগী হাত হওয়া সত্ত্বেও মাটিতে থপ্‌থপ করে পা ফেলে, প্রায় ৪৫ ডিগ্রি সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটাটাই বেশি পছন্দ। বনমানুষদের মধ্যে মগজ খাটাবার ক্ষমতা এই শিম্পাঞ্জীরই সবচেয়ে বেশি বলে মনে হয়—শেখালে অনেক কিছু শিখতে পারে।

ওরাং-ওটাংরা থাকে এশিয়ার জঙ্গলে। আগে মোটামুটি ছড়ানো ছিল, এখন মাত্র দুটি দেশে—বোর্নিও ও সুমাত্রায়। ওজনে মানুষের মতোই, লম্বায় চার ফুটের বেশি নয়। মাটিতে নামে কদাচিৎ, গাছের ডালে ডালেই জীবন কাটে।

গিবনরা কিন্তু গোরিলা বা শিম্পাজী বা ওরাং-ওটাং-এর মতো বড়ো আকারের নয়। ওজনে সাধারণত সাত-আট কেজি, কখনোই আঠারো কেজির বেশি নয়। লম্বায় খুব যদি বেশি হয় তো তিন ফুট। থাকে গাছের মগডালে। হাতদুটো অতিরিক্ত রকমের লম্বা, পা-দুটো ছোট। এতই লম্বা আর এতই ছোট যে গিবন যখন সিধে হয়ে দাঁড়ায় তখনো তার হাতদুটো মাটি ছুঁয়ে থাকে। দোল খেতে খেতে ডাল থেকে ডালে চলাফেরা করতে গিবনরা খুবই ওস্তাদ। চলাফেরা করার সময়ে পায়ের ব্যবহার বিশেষ নেই। শূন্যে ঝাঁপ দেয় পুরোপুরি হাতের জোরে, পা-দুটো তখন গোটানো থাকে।

কিন্তু গাছের ডালে বা মাটিতে চলার সময়ে দু-পায়ে হাঁটাটাই পছন্দ। সিধে হয়েই হাঁটে কিন্তু ভঙ্গিটা হয় একটু টলমলে, লম্বা দুটি হাত দিয়ে ভারসাম্য রাখে।

বানর

বানররা রয়েছে অ্যান্‌থ্রোপয়ডী উপবর্গের সবচেয়ে নিচের দিকে। প্রথমে মানুষ, তারপরে বনমানুষ, তারপরে বানর।

বানরদের সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এক ভাগে পুরনো জগতের বা 'ক্যাটারাইন' (catarrhine) বানর, অন্য ভাগে নতুন জগতের বা 'প্ল্যাটিরাইন' (platyrrhine) বানর। এই ভাগাভাগি ও নামকরণের সঙ্গে নাকের গড়নের সম্পর্ক আছে, যদিও পার্থক্যটা সব ক্ষেত্রে খুব স্পষ্ট নয়। ক্যাটারাইন বা পুরনো জগতের বানরদের বেলায় নাকের ফুটোদুটোর মাঝখানের আড়ালটা সরু। আর প্ল্যাটিরাইন বা নতুন জগতের বানরদের বেলায় নাকের ফুটোদুটোর মাঝখানের আড়ালটা মোটা, ফলে ফুটোদুটো একটু দূরে দূরে। নিচের ছবি দেখলে বিষয়টি বোঝা যাবে।

বাঁ দিকে ক্যাটারাইন বা পুরনো জগতের বানর।
ডান দিকে প্ল্যাটিরাইন বা নতুন জগতের বানর।

পৃথিবীর এক-এক অংশে এক-এক রকমের বানর, কোথাও পুরনো

জগতের, কোথাও নতুন জগতের। মিলেমিশে কোনো জায়গাতেই নয়, স্পষ্ট দাগ টেনে টেনে সীমানা দেওয়া যায়। আর শুধু নাক নয়, শরীরের অন্যান্য অংশের গড়নেও—যেমন দাঁতের বা মাথার খুলির—দু' দলের মধ্যে অনেক তফাত। কোনো কোনো জীববিজ্ঞানী তাই এই দু' দল বানরকে দুটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী। পুরনো জগতের বানরদের নিয়ে একটি পরিবার, নাম সার্কোপিথিকয়ডী (cercopithecoidea)। নতুন জগতের বানরদের নিয়ে আরেকটি পরিবার, সেবিডী (ceboidea)।

পুরনো জগতের বানরদের পাওয়া যায় এশিয়ায়, আফ্রিকায়, এমন কি দক্ষিণ ইউরোপেও। এই দলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে লাঙ্গুর, কোলোবাস বানর, ম্যাকাকে (macaques), বেবুন ইত্যাদি। সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ম্যাকাকে।

নতুন জগতের বানরদের পাওয়া যায় দক্ষিণ আমেরিকায়। চেহারায় ও আকারে এই নতুন জগতের বানরদের মধ্যেও অনেক রকমফের। থাকে গাছের ডালে, পুরো দলটিই। অনেকের আছে ধারণক্ষমতাবিশিষ্ট (prehensile) লেজ, অর্থাৎ এমন লেজ যা দিয়ে আঁকড়ে ধরা চলে। লেজ দিয়ে ডাল আঁকড়ে ধরে ঝুলে থাকতে বা দোল খেতে পারে, লেজ দিয়ে খাবার আঁকড়ে ধরতে পারে। লেজটা যেন তৃতীয় একটা হাত। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, গাছের ডালে জীবন কাটাতে হলে তৃতীয় হাতের মতো এমনি লেজ থাকাটাই সুবিধের। দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রয়েছে জলাভূমি। ফলে দক্ষিণ আমেরিকার এই বাসিন্দারা পুরোপুরিভাবেই গাছের ডালের জীব। ফলে গাছের জীবনের সঙ্গেই তাদের পুরোপুরি মানিয়ে চলতে হয়েছে। কারও কারও মতে ধারণক্ষমতাবিশিষ্ট লেজ হওয়াটা এই মানিয়ে চলার প্রচেষ্টারই ফল।

নতুন জগতের বানরদের মধ্যে পড়ে মারমোসেট, মাকড়সা-বানর (spider monkey), কাপুচিন ও গর্জনকারী প্রভৃতি। ১৫৫টি প্রজাতি আছে এই দলে। দক্ষিণ মেক্সিকো থেকে পাটাগোনিয়া

পর্যন্ত অঞ্চল জুড়ে এদের আস্তানা। আকারে ছ' ইঞ্চি থেকে দু' ফুট পর্যন্ত।

বানরদের মধ্যে মারমোসেটরা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট আর সবচেয়ে আত্তিকালের। ঘন লোমে ঢাকা নরম তুলতুলে চেহারা। মোটা ঘন লেজ কিন্তু ধারণক্ষমতাবিশিষ্ট নয়। আঙুলের নখগুলো বাঁকানো, অনেকটা নখরের মতো, শুধু পায়ের বুড়ো আঙুলটির বাদে। আঁকড়ে ধরার সময়ে হাতের বুড়ো আঙুল থাকে অন্য আঙুলগুলোর পাশাপাশি কিন্তু পায়ের বুড়ো আঙুল অন্য আঙুলগুলোর বিপরীতে।

মাকড়সা-বানরের চেহারা ছিপছিপে, স্বভাব ছটফটে। কোনো সময়েই স্থির হয়ে থাকতে পারে না, ছুটোপাটি লাগিয়েই আছে। হাত ছুটো লম্বা, পা-ছুটোও তাই, লেজ ততোধিক। গাছের ডালে লেজ দিয়ে আঁকড়ে ধরে ক্লান্তিহীন দোল খেয়ে যেতে পারে, মাথাটা নিচের দিকে ঝুলে আছে বলে কোনো রকম অস্বস্তি হয় বলে মনে হয় না। হাত-পায়ের আঙুল লম্বা ও বাঁকানো। হাতের বুড়ো আঙুল ছোট, পায়ের বুড়ো আঙুল বড়োসড়ো ও আঁকড়ে ধরার উপযোগী। সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হচ্ছে মাকড়সা-বানরের লেজ। লেজ দিয়ে শুধু যে আঁকড়ে ধরতে পারে তাই নয়, স্পর্শও অনুভব করতে পারে। লেজের ডগা লোমশূন্য, হাতের তালুর মতো চ্যাপ্টা ও অতিমাত্রায় স্পর্শানুভূতিসম্পন্ন। লেজ দিয়ে খাবার মুখে তুলতেও কোনো অসুবিধে হয় না। লেজটি প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠেছে তৃতীয় একটি হাত।

নতুন জগতের বানরদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায় কাপুচিন বানর। এদের গোটা মাথা জুড়ে ঝুঁটি গজায়, যা দেখতে হয় অনেকটা টুপির মতো, কাপুচিনরা বা পাদরিরা যা পরেন। এই সাদৃশ্য থেকেই কাপুচিন নাম।

নতুন জগতের বানরদের মধ্যে আকারে সবচেয়ে বড়ো গর্জনকারীরা (Howlers)। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এই বানররা গর্জন করতে পারে—কিচিরমিচির নয়, গাঁক গাঁক আওয়াজ তুলে গর্জন।

এই আওয়াজ তোলার জন্যে এদের গলায় আছে এক বিশেষ ধরনের স্বরযন্ত্র। এরা যখন দল বেঁধে গর্জন করতে শুরু করে তখন বাজের ডাককেও হার মানায়। সেই ডাক মাইলের পর মাইল বনভূমি কাঁপিয়ে তোলে।

পুরনো জগতের বানরদের মধ্যে আছে ২৮৫টি প্রজাতি। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম: লাঙ্গুর, কোলোবাস বানর, ম্যাকাকে ও বেবুন। নতুন জগতের বানরদের চেয়ে এরা আকারে অপেক্ষাকৃত বড়ো—লম্বায় এক ফুট থেকে তিন ফুট পর্যন্ত। উষ্ণ মণ্ডলের ও কিছু পরিমাণে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বাসিন্দা। আগে বলেছি, পুরনো জগতের বানরদের নাকে দুই ফুটোর মাঝখানের আড়াল সরু, ফলে ফুটো দুটো কাছাকাছি। এদের লেজ ধারণ-ক্ষমতাবিশিষ্ট নয়। পাছায় আছে গদির মতো পুরু চামড়া (ischial callosities)।

লাঙ্গুরদের দেখতে পাওয়া যায় ভারতে আর কোলোবাস বানরদের মধ্য আফ্রিকায়। আস্তানা গাছের মগডালে, ছিপছিপে ও ছটফটে, লম্বা লেজবিশিষ্ট। পাকস্থলী একাধিক, এই অর্থে যে পাকস্থলীটি একাধিক কামরাবিশিষ্ট। প্রথম কামরাটি ব্যবহৃত হয় খাদ্য মজুদ করার জন্যে। যখন ফাঁকায় থাকে যতোটা পারে খাদ্য উদরস্থ করে ও এই প্রথম কামরায় জমা করে, পরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় এসে খুশিমতো সময় নিয়ে ভোজন শেষ করে। অনেকটা গোরুর জাবর কাটার মতো।

আমাদের দেশের হনুমানও (entellus monkey) একটি বানর বিশেষ, এই লাঙ্গুরদের দলেই পড়ে। রামায়ণে এই হনুমানকে নিয়ে অনেক কাহিনী। ফলে রামায়ণ যেমন একটি ধর্মগ্রন্থ, তেমনি হনুমানও দেবতাতুল্য। সারা দেশে এখনো হনুমানের পুজো করা হয়। পরে আমরা দেখব, মানুষের কাছে অনেক জন্তুজানোয়ারই নানা কারণে পুজো পেয়েছে ও পাচ্ছে। এসব পুজোআচ্চা থেকেও পণ্ডিতরা মানুষের ঠিকানার কিছুটা হদিশ বার করেছেন। তবে

আমাদের দেশে হনুমানকে দেবতার আসনে বসানো হয়েছে বলেই এই জীবটির গায়ে হাত দেওয়া চলে না। সেজন্যে হনুমানের অনেক অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। বাগান তছনছ, ঘরদোর লণ্ডভণ্ড, হনুমান যে-সব জায়গায় আছে সেখানে এমন ঘটনা তো নিত্যনৈমিত্তিক।

আমাদের আলোচনায় ফিরে আসি। আফ্রিকার বিষুব অঞ্চলের ঘন জঙ্গলে থাকে কোলোবাস বানর। এদের খাতির অন্য কারণে। রেশমের মতো লোম এদের সারা গায়ে, ঘন ও লম্বা, সাদা ও কালো। মধ্য আফ্রিকা থেকে চালান হয়ে এই লোম প্রায় সারা বিশ্বের ফ্যাশনদুরস্ত মহিলাদের অঙ্গে ওঠে।

চিড়িয়াখানায় গেলে পুরনো জগতের বানরদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় যাদের চোখে পড়ে তারা হচ্ছে ম্যাকাকে (macaques) বানর। এদের দেখতে পাওয়া যায় পশ্চিমে জিব্রাল্টার ও উত্তর আফ্রিকা থেকে শুরু করে পুবে জাপান পর্যন্ত—ভারত, বর্মা, মালয়, শ্যাম ও চীন সমেত। এদের গড়ন বেশ শক্তসমর্থ (যদিও লাঙ্গুরদের মতো একাধিক পাকস্থলী নেই), সহজে কাবু হয় না, ট্রপিক অরণ্য হোক বা তুষারঢাকা পর্বতই হোক দিব্যি মানিয়ে নিতে পারে। চিড়িয়াখানায়, বানরের খেলা যারা দেখায় তাদের কাছে, বানরের ওপরে ডাক্তারী পরীক্ষানিরীক্ষা যেখানে চালানো হয় সেইসব গবেষণাগারে এই ম্যাকাকে বানরদেরই কদর বেশি। কেননা এদের সহজে বাঁচিয়ে রাখা চলে আর একটু যত্ন নিলে এদের প্রচুর ছানাপোনা হয়।

পুরনো জগতের বানরদের মধ্যে যাদের কথা এতক্ষণ বলা হল তারা সবাই থাকে গাছের ডালে। কিন্তু গাছ ছেড়ে মাটিতে নেমে এসেছে এমন বানরও এই দলে আছে। তারা হচ্ছে বেবুন ও ম্যানড্রিল (mandrill)। এদের দেখতে পাওয়া যায় আরব ও আফ্রিকার শুকনো পাথুরে পাহাড়-অঞ্চলে কিংবা মরুভূমির মতো এমন সমস্ত জায়গায় যেখানে গাছপালা বিশেষ নেই। এরা হাঁটে

হু' পায়ের পাতা ও হু' হাতের তালুতে ভর দিয়ে। মুখ লম্বাটে, নাকের অংশ কুকুরের মতো, জোরালো ছেদক দাঁত। অনেকেরই মুখের চামড়ায় বিকট ভাঁজ ও নানা রকমের রঙ। পাছার গদি হয় খুবই বড়ো, কখনো কখনো প্রকাণ্ড—গোটা পাছা এই গদিতেই ঢাকা পড়ে যায়। গদির রঙও কখনো কখনো হয়ে থাকে রীতি-মতো চড়া। বেবুনরা থাকে দল বেঁধে, খায় টিকটিকি, গিরগিটি, বিছে ও পোকামাকড়। অন্যান্য বানরদের মতো ফল পাতা খেয়ে এদের জীবনধারণ নয়।

লেমুরদের দল

প্রাইমেট্‌সকে আমরা হুটো ভাগে ভাগ করেছিলাম। একভাগে মানুষ, বনমানুষ ও বানর, যাদের নাম অ্যান্‌থ্রোপয়ডী। অন্যভাগে লেমুর, গেছো-ছুঁচো ও টার্সিয়ার (Tarsier), যাদের নাম প্রসিমাই। ২৯ পৃষ্ঠার ছবিতে **ক খ গ** চিহ্নিত তিনটি প্রাণী প্রসিমাই দলভুক্ত।

গ চিহ্নিত প্রাণীটির নাম টার্সিয়ার। চেহারায় অনেকখানি বানরসুলভ ভাব এসে গিয়েছে। শরীরের গড়নের দিক থেকেও তাই। অনেকের মতে টার্সিয়ারদের স্থান হওয়া উচিত বানর ও লেমুরদের মাঝখানে। টার্সিয়ারদের বলা যেতে পারে আদিম বানর। অতীতে পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে এদের দেখতে পাওয়া যেত, এখন পাওয়া যায় বোর্নিও ও ফিলিপাইনে। নিশাচর জীব, থাকে গাছের ডালে, খায় পোকামাকড়। চোখহুটো মস্ত মস্ত। পিছনের পা-হুটোর এতই ক্ষমতা যে এই পায়ের সাহায্যে ছ' ফুট পর্যন্ত নির্ভুল লাফ দিতে পারে।

খ চিহ্নিত প্রাণীটি লেমুর। ছবি দেখেই বোঝা যাচ্ছে চেহারায় বানরসুলভ ভাবটুকুও বেশ কম। থাকে গাছের ডালে আর স্বভাবের দিক থেকে নিশাচর। চোখহুটো বড়ো বড়ো, খানিকটা পাশের

দিকে। মুখ শেয়ালের মতো। কৃন্তক দাঁত শক্ত ও জোরালো। ওপরের পাটির দু' জোড়া কৃন্তকের মাঝখানে অনেকটা ফাঁক। নিচের পাটির দু' জোড়া কৃন্তক বাইরের দিকে বেরিয়ে আসা, যা দিয়ে চিরুনির কাজ হয়। হাতের সমস্ত আঙুল এবং পায়ের একটি বাদে অন্য সমস্ত আঙুল নখযুক্ত। পায়ের দ্বিতীয় আঙুলে শুধু আছে বাঁকা ধারালো নখর, যার সাহায্যে বাদাম ভেঙে খাওয়ার কাজটি সুসম্পন্ন হয়। নাক বেশ লম্বা, ঠোঁট থেকে অনেকখানি বাইরের দিকে। ওপরের ঠোঁট মাড়ির সঙ্গে আঁটা। মাদাগাস্কার ও সন্নিহিত আফ্রিকায় এদের আস্তানা।

লেমুরের স্থান বানরের নিচে কিন্তু অ-প্রাইমেট নিম্নতর স্তন্যপায়ীর ওপরে। বলা যেতে পারে দুয়ের মাঝামাঝি। কেউ কেউ বলে থাকেন আধা-বানর। তবে বানরত্ব আধাই হোক বা আরো কম হোক, প্রাইমেট্স বটেই। প্রাইমেট্স বর্গের কতকগুলো শারীরগত লক্ষণ এই লেমুরদের মধ্যেই প্রকাশ পেতে শুরু করে—যেমন, মস্তিষ্কের গড়নে, আঁকড়ে ধরার প্রয়োজনে হাত-পায়ের ব্যবহারে, হাতের ও পায়ের বুড়ো আঙুলের স্বাধীন নড়াচড়ায় (যার ফলে 'থাবা' হয়ে ওঠে 'হাত') ও আঙুলের নখে। কিন্তু নাকটা শেয়ালের মতো লম্বা, যা একেবারেই অ-বানরোচিত। আরো অনেক ব্যাপারে অ-প্রাইমেট স্তন্যপায়ীদের সঙ্গে লেমুরের মিল লক্ষ করা যায় (যেমন, ওপরের মাড়ির সঙ্গে আঁটা ঠোঁট, বড়ো ও নড়নশীল কান, ভাবলেশহীন মুখ ইত্যাদি)।

তবুও সন্দেহ থাকে না যে লেমুর প্রাইমেট্স বর্গেই পড়ে, কেননা এই বর্গের সঙ্গে তার মিলগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। মিলগুলোর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে প্রাইমেট্স-এর বিশেষ বিশেষ লক্ষণের সূচনা।

লেমুরদের সম্পর্কে যদি সন্দেহ নাও ওঠে তো গেছো-ছুঁচোদের বেলায় অনায়াসেই উঠতে পারে। যেমন নামে তেমনি চেহারায় ইঁদুরের সঙ্গেই এই প্রাণীটির মিল। বহু প্রাণীবিদ এখনো পর্যন্ত সন্দেহ পোষণ করেন এই গেছো-ছুঁচোদের সত্যি সত্যিই প্রাইমেট্স

দলভুক্ত করা চলে কিনা। এক্ষেত্রেও বহু অমিল থাকা সত্ত্বেও কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এমন মিল লক্ষ করা যায় যা থেকে প্রাইমেট্‌স-এর বিশেষ বিশেষ লক্ষণের সূচনা সম্পর্কে ধারণা হতে পারে।

ভারত, বর্মা, মালয়, সুমাত্রা, জাভা ও বোর্নিও সমেত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে গেছো-ছুঁচোদের আস্তানা। অনেকগুলো প্রজাতি। যারা অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের তারা থাকে গাছের মগডালে, যারা অপেক্ষাকৃত বড়ো আকারের তারা ঝোপঝাড়ে। দেখতে হুবহু কাঠবিড়ালীর মতো, এমনকি অনেকের পিঠে কাঠবিড়ালীর মতো রঙের ছোপও। তবে কাঠবিড়ালীদের চেয়ে এদের নাক অপেক্ষাকৃত ছুঁচলো, কান অপেক্ষাকৃত ছোট (মানুষের কানের গড়নের সঙ্গে যার আশ্চর্য মিল)। তার চেয়েও বড়ো কথা, গেছো-ছুঁচোরা হাতের ও পায়ের আঙুলগুলো অনেক বেশি পরিমাণে নড়াচড়া করতে পারে, হাতের ও পায়ের বুড়ো আঙুলগুলোও যথেষ্ট নড়নশীল—যার ফলে আঁকড়ে ধরার কাজটি হতে পারে। আঙুলের আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা থাকা বিশেষ করে প্রাইমেট্‌স-এর লক্ষণ।। আর এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণটির সূচনা দেখতে পাওয়া যায় গেছো-ছুঁচোদের মধ্যে। তবে আঙুলগুলো সবই নখরযুক্ত, এ-ব্যাপারে আবার প্রাইমেট্‌স-এর সঙ্গে বড়ো রকমের অমিল।

গেছো-ছুঁচোদের চোখদুটি বড়ো বড়ো। শুধু সেজন্যে নয়, চোখের দৃষ্টির উন্নততর আয়োজনের জন্যেও এই গেছো-ছুঁচোরা সাধারণ গর্তের ছুঁচো বা কাঠবিড়ালীদের থেকে পৃথক।

ক্রমবিকাশের ধাপ

প্রাইমেট্‌স বর্গের উঁচু থেকে নিচু পর্যন্ত কয়েকটি নিদর্শন নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। বনমানুষ থেকে গেছো-ছুঁচো পর্যন্ত

সবকটি নিদর্শন একসঙ্গে চোখের সামনে রাখলে স্পষ্টই বোঝা যায়, প্রাইমেট্‌স বর্গের লক্ষণগুলো যেন ধাপে ধাপে প্রকট হয়ে উঠছে সবচেয়ে কম গেছো-ছুঁচোয়, সবচেয়ে বেশি (আমাদের আলোচনাভুক্ত-নিদর্শনগুলির মধ্যে) বনমানুষে। ক্রমবিকাশের এই ধারা ধরে আরেকটু অগ্রসর হলে বনমানুষ থেকে মানুষেও পৌঁছনো যায়। জটিলতাগুলো ক্রমেই বাড়ছে—তাও ধাপে ধাপে। আচমকা ফস্ করে কোনো কিছু ঘটে যাচ্ছে না। মানুষের অনেকগুলো লক্ষণ বনমানুষেই সূচিত হচ্ছে। বনমানুষের অনেকগুলো লক্ষণ বানরে, এমনিভাবে গেছো-ছুঁচো পর্যন্ত। ধাপগুলো এত স্পষ্ট যে ক্রম-বিকাশের তত্ত্ব মানতেই হয়। এখানে একটি বিষয়ে সাবধান করার আছে। ক্রমবিকাশের ধারাটি কোনো সময়েই সিধে ও সরল নয়। প্রাইমেট্‌স বর্গের যতগুলো নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করা হল, তার ধাপগুলো সরাসরি একটি থেকে আরেকটি—এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। প্রতি ধাপেই কম-বেশি ভিন্নমুখী বিশেষত্ব অর্জিত হয়েছে। ফলে ক্রমবিকাশের ধারাটিও সরল থাকে নি। এ-কারণে আমরা কক্ষনো বলব না যে মানুষের পূর্বপুরুষ হচ্ছে শিম্পাঞ্জী, যদিও লক্ষণগত বিচার থেকে তাও ভাবা যেতে পারে। বলব, মানুষ ও শিম্পাঞ্জীর একই পূর্বপুরুষ। ক্রমবিকাশের ধারার মূল গতিপথটি অবশ্যই মানুষের দিকে। কিন্তু প্রতি ধাপেই আরো নানাদিকে ছড়ানো—কোথাও বনমানুষের দিকে, কোথাও বানরের দিকে ইত্যাদি। প্রাইমেট্‌স বর্গের যে-সব নিদর্শন নিয়ে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি, তারা কেউ-ই মূল গতিপথে স্থাপিত নয়।

তাহলে মানুষের পূর্বপুরুষ কারা? কোনো প্রমাণ বা নিদর্শন পাওয়া গেছে কি? কোনো ফসিল? আমরা এবারে এ-বিষয়টি নিয়ে আলোচনা তুলব।

মানুষ কোথা থেকে এল

প্রাইমেট্‌স বলতে একেবারে গোড়ার দিকে রয়েছে গেছো-ছুঁচো ও লেমুর জাতীয় জীব। একেবারে শেষে মানুষ। মাঝখানে বানর, গিবন, শিম্পাঞ্জী ইত্যাদি। অর্থাৎ, পুরোপুরি বানর নয় এমন জীব থেকে শুরু করে বানরের চেয়েও যারা বেশি সেই বনমানুষরা সবাই প্রাইমেট্‌স দলভুক্ত। মানুষ তো বটেই।

প্রাইমেট্‌স-এর বিশেষত্ব এই যে এদের মাথার খুলির মধ্যেকার মগজটি ক্রমেই বড়ো ও জটিল হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এদের শরীরের স্বাভাবিক অস্ত্রসজ্জা গিয়েছে কমে।

অস্ত্রসজ্জা কমে গিয়েছে। কথাটার মানে কি?

প্রাণ বাঁচিয়ে রাখার জন্যে প্রত্যেকটি জীবকে অনবরত লড়াই করে চলতে হয়। নানা ধরনের জীব নানাভাবে চালায় এই লড়াই। কোনো কোনো জীব গোড়াতেই আক্রমণ করে বসে, কোনো কোনো জীব ছুটে পালায়, কোনো কোনো জীব আক্রান্ত হলে পরে আত্মরক্ষা করে। যেমন, বাঘ-সিংহের মতো মাংসাশী জীবদের ধারালো দাঁত ও থাবা আছে, তারা আক্রমণকারীর দলে পড়ে। ঘোড়া বা এ-ধরনের জীবদের সম্বল হচ্ছে জোরে ছুট দিতে পারার মতো পা। তারা ছুটে পালায়। হাতি বা গণ্ডারের মতো জীবদের অস্ত্রসজ্জা বলতে ছুঁচলো দাঁত ও খড়্গ। তারা আক্রমণ করে না কিন্তু আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষা করে। এভাবে জীবজগতের প্রায় সমস্ত জীবই নিজের নিজের ধরনে প্রাণ বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রাইমেট্‌স-এর

বেলায় দেখা যাচ্ছে, শরীরের স্বাভাবিক অস্ত্রসজ্জা বলতে প্রায় কিছুই নেই। তাদের পাঁচ আঙুলওলা পা দিয়ে আর যাই হোক ছুটে পালাবার কাজটি তেমন ভালোভাবে করা চলে না। তাদের আঙুলের নখগুলো চ্যাপ্‌টা, যা বিশেষ কোনো কাজেই আসার কথা নয়। তবে দাঁতগুলো কিছুটা কাজের, তা দিয়ে জোরে কামড় দেওয়া চলে। কিন্তু দাঁতের বেলাতেও দেখা যাচ্ছে, বনমানুষ আর মানুষের মুখে দাঁতের সংখ্যা ছত্রিশের জায়গায় বত্রিশ আর সেগুলো আকারে অনেক ছোট। শরীরের স্বাভাবিক অস্ত্রসজ্জার দিক থেকে প্রাইমেট্‌স-এর বড়াই করবার মতো কিছু নেই।

কিন্তু তাই বলে প্রাইমেট্‌স যে একেবারে নিরস্ত্র তা নয়। বানরদের মধ্যে অনেকেই গাছের ডাল লাঠির মতো ব্যবহার করতে পারে বা পাথর ছুঁড়ে মারতে জানে। আর মানুষের আসল জোরটাই হচ্ছে হাতিয়ারের জোর। হাতিয়ার সম্পর্কে পরে আমরা বিশদ আলোচনা তুলব।

মগজবান হওয়াটাই প্রাইমেট্‌স-এর বিশেষত্ব। এই মগজ ক্রমেই বড়ো হয়েছে, সেই সঙ্গে বেড়েছে মগজ খাটাবার ক্ষমতাও। প্রাইমেট্‌স-এর শরীর দুর্বল আর অসহায়, কিন্তু তারা টিকে আছে এই মগজের জোরে।

প্রাইমেট্‌স-এর মধ্যে সবচেয়ে মগজবান জীব হচ্ছে মানুষ। মানুষের মাথার খুলির মধ্যে রয়েছে মগজ। একটা বানরের মাথার খুলির সঙ্গে মানুষের মাথার খুলি মিলিয়ে দেখলেই দুয়ের তফাতটা স্পষ্ট চোখে পড়ে। বানরের মুখখানা প্রকাণ্ড কিন্তু সেই অনুপাতে করোটিক খুবই ছোট। মানুষের মুখখানা ছোট কিন্তু করোটিক প্রকাণ্ড। জীবজগতে মানুষের মতো এত ছোট মুখ আর এত প্রকাণ্ড করোটিক আর কারও নেই। মানুষ থেকে মানুষেতর জীবের দিকে যতোই যাওয়া যাবে ততোই দেখা যাবে, জীবের মুখ বড়ো হচ্ছে আর করোটিক ছোট হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে জীবটির বুদ্ধি কমছে আর হিংস্র হয়ে উঠছে।

এ থেকেই পাওয়া যায় মানুষ যে কতখানি মানুষ তার একটা মাপ। মাপটি করোটিকের, ঘন সেন্টিমিটারে। করোটিকের মাপ থেকে মগজের মাপ। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, একটি বনমানুষের মগজের মাপ প্রায় ৫০০ ঘন সেন্টিমিটার (সংক্ষেপে সি. সি.) আর একটি মানুষের মগজের মাপ প্রায় ১৬০০ সি. সি.। মানুষ যে কতখানি মানুষ আর বনমানুষ যে কতখানি বুনো তার একটা হিসেবও যেন এই তুটি সংখ্যা থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

মানুষ কথা বলতে পারে, বনমানুষ পারে না। এজন্যেই দেখা যায়, মানুষের জিভ ও আশেপাশের কয়েকটি অঙ্গ একটু বিশেষ ধরনের। মানুষের মগজের যে বিশেষ অংশ থেকে কথাবার্তা বলার ব্যাপারটাকে চালনা করা হয় তারও একটি বিশেষ গড়ন আছে। বানর ও বনমানুষের এসব বিশেষত্বের কোনোটিই নেই।

দাঁতের বিন্যাসের দিক থেকেও মানুষ বনমানুষ থেকে আলাদা। বনমানুষের দাঁতের বিন্যাস ইংরেজি U অক্ষরের মতো। তার মুখের তু' পাটির চারটি ছেদক দাঁত খুবই বড়ো, এত বড়ো যে একদিকের দাঁত উল্‌টো দিকে মাড়িতে গিয়ে ঠেকে। এজন্যে দেখা যায় বনমানুষের ছেদক ও পেষক দাঁতের মধ্যে বেশ খানিকটা ফাঁক। মানুষের দাঁতে এ-ধরনের কোনো ফাঁক নেই।

বনমানুষ ও মানুষের শরীরের গড়নে চোখে পড়ার মতো আরো একটি মস্ত তফাত আছে। বনমানুষ মানুষের মতোই খাড়া হয়ে চলাফেরা করতে পারে বটে কিন্তু সামনের দিকে একটু ঝুঁকে। শরীরের ভারসাম্য রাখার জন্যে হাতত্নটো সমানে ব্যবহার করতে হয়। গাছের ডাল থেকে ডালে ঝুলে ঝুলে যাবার সময়ে বনমানুষের সহায় এই তুটি হাত-ই।

খাড়া হয়ে চলতে হলে শিরদাঁড়ার ওপরে মাথাটাও খাড়া রাখতে হয়। আমরা জেনেছি শিরদাঁড়ার সঙ্গে মগজের যোগাযোগ মহাবিবর বা ফোরামেন ম্যাগনামের মাধ্যমে। মানুষের বেলায় এই মহাবিবর এমন জায়গায় আছে যে মানুষ চলাফেরা করার সময়ে মাথাটিকে

সিধে রাখতে পারে। বনমানুষের বেলায় আছে একটু বাঁকাভাবে, যে-কারণে চলাফেরা করার সময়ে বনমানুষের মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

মানুষের দাঁতের পাটিতে তৃতীয় বা শেষ পেষক দাঁতকে বলা হয় আক্কেল দাঁত। প্রত্যেক পাটিতে দুটি করে, অর্থাৎ মোট চারটি আক্কেল দাঁত থাকার কথা। কিন্তু অনেকেরই থাকে না। আক্কেল দাঁতগুলো গজায় অনেক পরে। পুরো চারটি আক্কেল দাঁত গজিয়েছে এমন মানুষের সংখ্যা কম। অধিকাংশ মানুষের দাঁতের পাটিতে আক্কেল দাঁতের মোট সংখ্যা এক বা দুই বা তিন। এমন মানুষও আছে যাদের সারা জীবনে একটিও আক্কেল দাঁত গজায় না। প্রথম ও দ্বিতীয় পেষকের তুলনায় এই তৃতীয় পেষক দাঁতটির খুবই হীন অবস্থা। যেমন আকারে তেমনি লক্ষণে। আকারে খর্ব, লক্ষণে প্রাথমিক।

মানুষ ও বনমানুষের এই তফাতগুলো মনে রেখে এবার আমরা তাকাব মানুষের পূর্বপুরুষের কতকগুলো নিদর্শনের দিকে। নিদের্শনগুলো সবই ফসিল, পাওয়া গিয়েছে পৃথিবীর নানা অংশে। কোথাও বা চোয়ালের একটি হাড়, কোথাও বা মাথার খুলি ইত্যাদি। এই ফসিলগুলো থেকেই মানুষের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে নেওয়া যায়।

মানুষের পূর্বপুরুষের সবচেয়ে পুরনো সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে আফ্রিকায়, কায়রোর কাছাকাছি ফায়ুম নামে একটি জায়গা থেকে। সাক্ষ্যটি সামান্য—নিচের চোয়ালের হাড় ও দাঁত। প্রায় চার কোটি বছরের পুরনো। তার মানে, এই হাড় ও দাঁত যে জীবটির শরীরের অংশ সেটি এই পৃথিবীতে বেঁচেছিল আজ থেকে প্রায় চার কোটি বছর আগে, অলিগোসিন কালে। এই জীবটির নাম দেওয়া হয়েছে প্যারাপিথেকাস (Parapithecus)।

জীবটি আকারে ছোট, আজকের দিনের একটা কাঠবিড়ালীর চেয়ে বড়ো নয়। তবে দাঁতের সংখ্যা একালের বনমানুষের মতো—

দুটি কৃন্তক, একটি ছেদক, দুটি পুরঃপেষক ও তিনটি পেষক। চোয়ালের গড়নে টার্সিয়ুসের আদল (২৯ পৃষ্ঠার ছবিতে গ দ্রষ্টব্য)। দাঁতের গড়ন দেখে বোঝা যায় জীবটি প্রাথমিক পর্যায়ের। সব মিলিয়ে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে নিচের চোয়ালের এই হাড়টি একটি বনমানুষের লক্ষণযুক্ত নর-বানরের যার পূর্বপুরুষ এয়োসিন কালের টার্সিয়ুস। সম্ভবত এই জীবটি থেকেই পরবর্তী কালের সকল বনমানুষের উদ্ভব। কোনো কোনো বিজ্ঞানীর ধারণা, প্যারাপিথেকাস হচ্ছে সকল হোমিনিডীর (মানুষ সমেত) আদি প্রতিনিধি।

এই একই জায়গা থেকে পরে আরো একটি চোয়াল পাওয়া গিয়েছে, প্যারাপিথেকাসের চেয়েও বড়ো। এই নর-বানরটির নাম দেওয়া হয়েছে প্রোপ্লিওপিথেকাস।

জীবটি আকারে ছোটখাটো গিবনের মতো (২৯ পৃষ্ঠার ছবিতে ঙ দ্রষ্টব্য)। দাঁতগুলোও অনেকটা গিবনের মতোই। তবে গড়নের দিক থেকে আরো সরল। ছেদক দাঁতের মূল যদিও শক্তসমর্থ, কিন্তু দাঁতটি তেমন প্রকট নয়, তেমন ধারালোও নয়।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, আজকের দিনের বনমানুষের ক্রমবিকাশে প্রোপ্লিওপিথেকাস হচ্ছে প্যারাপিথেকাসের চেয়ে আরো অগ্রসর একটি ধাপ।

নিদর্শন দুটি সামান্য, মিশর থেকে পাওয়া দুটি চোয়ালের হাড়। কোনো সিদ্ধান্ত টানার পক্ষে দুটিমাত্র নিদর্শন অবশ্যই যথেষ্ট নয়। তবুও এই দুটিমাত্র নিদর্শন থেকে একথাটি অন্তত সুনিশ্চিতভাবে বলা চলে যে অলিগোসিন কালে ক্ষুদ্রাকৃতি অ্যানথ্রোপয়েড এপ্ বা নর-বানরের অস্তিত্ব ছিল। নর-বানর বটে তবে একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের। কাজেই এই বিশেষ কালের ভূ-স্তরে ব্যাপক অনুসন্ধান হওয়াটা জরুরি। কেননা একথা অনেকটা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে এই নর-বানর থেকেই পরবর্তীকালের সকল হোমিনিডীর উদ্ভব।
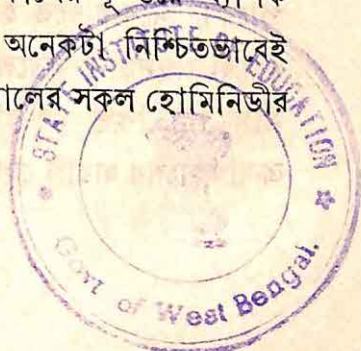
গত একশো বছরে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে মানুষের পূর্বপুরুষের আরো অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। আলাদা আলাদা নামও দেওয়া হয়েছে তাদের। সবকটি নিদর্শন মিলিয়ে দেখার পরে মোটামুটিভাবে বলা চলে, মানুষ ও বনমানুষ এসেছে প্যারাপিথেকাস থেকে, যে-প্যারাপিথেকাস পুরোপুরি বানর নয়, পুরোপুরি বনমানুষ নয়, বনমানুষের লক্ষণবিশিষ্ট এপ্। এই এপ্ পরিবারটি একসময়ে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটি ভাগ শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠে মানুষ, অপর ভাগ বনমানুষ। বিজ্ঞানীদের মতে এই ভাগাভাগির ব্যাপারটা ঘটেছে আজ থেকে প্রায় আড়াই কোটি বছর আগে।

এখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। যেখানে যতো বানর আছে সবাই একসময়ে বনমানুষ বা মানুষ হয়ে উঠবে এমন কোনো কথা নেই। একদল বানর আগেও বানর ছিল, এখনো তাই আছে। কিন্তু আরো একদলকে পাওয়া যাচ্ছে যারা দেখতে বানরের মতো হলেও ঠিক বানর নয়, তার চেয়েও কিছু বেশি। মানুষ বা বনমানুষের চেহারার আভাস পাওয়া যায় তাদের শরীরের গড়নে। এদের আমরা বলেছি এপ্। মানুষের ঠিকানা জানতে গিয়ে এই এপ্‌দের ওপরেই আমাদের বিশেষ নজর রাখতে হবে।

প্যারাপিথেকাস ও প্রোপ্লিওপিথেকাস হচ্ছে দুটি এপ্। এদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ফসিল থেকে। শুধু এই দুটিই নয়, পরবর্তী-কালে আরো কয়েকটির। শেষপর্যন্ত এমন ফসিলও পাওয়া গিয়েছে যাকে আর এপ্ বলা চলে না, যার সঙ্গে চেহারার মিল আধুনিক মানুষের। বানরের মতো চেহারাটি বদলাতে বদলাতে আধুনিক মানুষের মতো চেহারাটি মূর্ত হতে যে ধাপগুলো পার হয়ে আসতে হয়েছে, এবারে সংক্ষেপে তার একটি বিবরণ উপস্থিত করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, সাক্ষ্যগুলো সবই ফসিল থেকে পাওয়া। আরো অনুসন্ধান করলে আরো ফসিল হয়তো পাওয়া যেত, আরো সাক্ষ্য। কিন্তু যে-কটি সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে তা থেকেও ক্রমবিকাশের ধারাটি ছেদহীনভাবেই ফুটে ওঠে।

প্যারাপিথেকাস

একেবারে গোড়ার দিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে খুদে খুদে একদল এপ্‌: প্যারাপিথেকাস। লম্বায় বড়ো জোর এক ফুট। পরবর্তীকালে মিশরের যে অঞ্চলটির নাম হয়েছে ফায়ুম মরূদ্যান, সেই অঞ্চলের বাসিন্দা। আবহাওয়া মাঝারি রকমের উষ্ণ, হালের ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের মতো। আর সত্যিই সেই অঞ্চলটি ছিল ভূমধ্যসাগরের তীরেই, কারণ সে-সময়ে ভূমধ্যসাগর এখনকার চেয়ে অনেক অনেক বড়ো ছিল। সময়টি হচ্ছে নবজীবীয় যুগের একটি কল্প, ভূবিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন অলিগোসিন। আজ থেকে সাড়ে-চার কোটি বছর আগে শুরু, সাড়ে-তিন কোটি বছর আগে শেষ। কিন্তু কল্পের শেষদিকে এসে দেখা যাচ্ছে, প্যারাপিথেকাসের বংশধররা আর সেই ছোট্টটি নেই, লম্বায় প্রায় তিনগুণ বড়ো হয়ে গেছে। এদের নাম প্রোপ্লিওপিথেকাস।

প্রোপ্লিওপিথেকাস

অলিগোসিন-এর পরে মাইওসিন। শুরু সাড়ে-তিন কোটি বছর আগে, শেষ দেড় কোটি বছর আগে। মাইওসিন কল্পে এসে দেখা যাচ্ছে, প্রোপ্লিওপিথেকাসরা মিশরের ওই একটিমাত্র অঞ্চলের সীমানা ছাড়িয়ে ইউরোপ ও আফ্রিকার নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের কারও চেহারা অনেকটা গোরিলার মতো, কারও চেহারা অনেকটা শিম্পাঞ্জীর মতো, এক-এক জায়গায় এক-এক রকম নাম দেওয়া হয়েছে তাদের। কেনিয়ায় তাদের নাম প্রো-কন্‌সাল; ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, শ্লোভাকিয়া ও ব্যাভেরিয়ায় প্লিওপিথেকাস; দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকায় লিম্‌নোপিথেকাস। সবশেষের নামটিকে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার কারণ এর পরের কল্পে যাদের আমরা দেখতে পাব তারা এদেরই বংশধর।

অস্ট্রালোপিথেকাস

পরের কল্পটির নাম প্লাইওসিন। দেড় কোটি বছর আগে শুরু, দশ লক্ষ বছর আগে শেষ।

এই কল্পে এসে প্রথমেই আমাদের নজর দিতে হবে কালাহারি মরুভূমির দিকে, যার উত্তর সীমান্তে রয়েছে মস্ত চুনা-পাথরের পাহাড়, পাহাড়ের নিচে নদী, নদীর ধারে গুটিকতক গাছ। আবহাওয়া উষ্ণ ও আর্দ্র। পরিচিত জন্তুজানোয়ারদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে হরিণ, খরগোশ, ছুঁচো আর বেবুন জাতীয় একদল জীব। কিন্তু এদের দিকে চোখ পড়ে না। এদের সঙ্গেই চলাফেরা করছে নতুন ধরনের আর একটি জীব, তার দিকেই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। জীবটি পেছনের দু' পায়ে ভর দিয়ে সিধে হয়ে হাঁটছে, জীবজগতের ইতিহাসে এমনটি এই প্রথম। এপ্ বললে এই জীবটিকে খাটো করা হয়, আবার পুরোপুরি মানুষও নয়, দুয়ের মাঝামাঝি একটি এপ্-মানুষ। এই এপ্-মানুষটির নাম দেওয়া হয়েছে অস্ট্রালোপিথেকাস (Australopithecus)।

অস্ট্রালোপিথেকাস লম্বায় আরেকটু বড়ো হয়েছে। তিন ফুট চার-ইঞ্চি থেকে চার ফুট পর্যন্ত। মাথাটা একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে চলাফেরা করে। দূর থেকে দেখলে বেঁটেখাটো একটি মানুষ, কিন্তু সামনে এসে ছুঁচলো মুখ আর চ্যাপটানো করোটিকের দিকে তাকালে এপ্ ছাড়া কিছু মনে হয় না। এরা থাকে দল বেঁধে, খাবারের সন্ধানেও বেরোয় দল বেঁধে। হরিণের পাল যখন জল খেতে আসে তখন এরা চারদিক থেকে সেই হরিণের পালকে ঘিরে ধরে, তারপর লাঠির ঘায়ে আর পাথর ছুঁড়ে একটি একটি করে হরিণ মারে। শুধু হরিণ-শিকার নয়, লাঠি বা ছুঁচলো পাথরের সাহায্যে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ছুঁচো বা খরগোশ শিকার করতেও এরা রীতিমতো পটু। এমন কি বেবুনদেরও এদের হাত থেকে রেহাই নেই। ঘাড় বরাবর তাক্ করে এমনভাবে লাঠির ঘা মারতে পারে যে এক-এক ঘায়েই এক-একটি বেবুনের দফা শেষ। শিকার বধ করার পরে এরা

মরা জানোয়ারগুলোকে টানতে টানতে নিয়ে আসে চুনাপাহাড়ের গায়ে নিজেদের গুহায়। ধারালো পাথরের সাহায্যে জানোয়ারগুলোর ছাল ছাড়ায়, তারপর শুরু হয় দলবদ্ধ ভোজ। রান্না করে খায় কিনা সে-সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা চলে না। অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতে আগুনের ব্যবহার এরা জানে না। তবে রান্না করুক বা না করুক, খায় এরা অনেক কিছুই, এমনকি জলের কাঁকড়া ও কচ্ছপও।

মানুষের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই অস্ট্রালোপিথেকাসের বড়ো স্থান। কেননা এখনো পর্যন্ত যতো ফসিল পাওয়া গিয়েছে তাদের মধ্যে এই অস্ট্রালোপিথেকাসের মধ্যেই প্রথম পাওয়া যাচ্ছে এমন সমস্ত লক্ষণ যার সঙ্গে মিল যতো না বনমানুষের তার চেয়ে বেশি মানুষের।

অস্ট্রালোপিথেকাসের মগজের মাপ অন্ততপক্ষে ৬০০ সি. সি., তার বেশি তো কম নয়। মাপের দিক থেকে এই মগজ একালের একটি বড়ো আকারের বনমানুষের মগজের সমান। কিন্তু মানুষের মগজের প্রায় অর্ধেক। শিম্পাঞ্জী ও গোরিলার সঙ্গে তুলনা করলে অস্ট্রালোপিথেকাসের শরীরটি অবশ্যই ছোট। সে তুলনায় তার মগজটিকে অবশ্যই অপেক্ষাকৃত বড়ো বলে স্বীকার করে নিতে হয়। মগজের বিন্যাসেও এমন কিছু জটিলতার লক্ষণ আছে যা ঠিক বনমানুষের মতো নয়।

চোয়াল ভারী, পেষক দাঁত বড়ো। মাথার খুলিটি দেখে এমনিতে মনে হতে পারে বড়ো আকারের একটি এপ্ বুঝি। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে এপ্-এর সঙ্গে অনেক তফাত চোখে পড়বে। হাড়ের ওপরে মাংসপেশীর যে দাগ পড়ে, তফাত সেই দাগে। তফাত হাতের বিন্যাসে। তফাত কপালের গড়নে। তফাত অক্ষিকোটরে। তফাত মহাবিবরের অবস্থানে। সবচেয়ে বড়ো তফাত, অস্ট্রালোপিথেকাসের মগজের আধারটির অবস্থান এপ্‌দের তুলনায় অনেকখানি ওপরের দিকে। এ-লক্ষণটি একেবারেই মনুষ্যোচিত।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে মহাবিবর ও অক্সিপিটাল কন্ডাইলের অবস্থান। অস্ট্রালোপিথেকাসের যে-ক'টি ফসিল পাওয়া গিয়েছে—অন্ততপক্ষে পাঁচটি—সবক'টিতেই অক্সিপিটাল কনডাইলের অবস্থান আরো একটু সামনের দিকে। একালে যে-সব বড়ো আকারের বনমানুষ রয়েছে তাদের কারো বেলাতেই এটি এতখানি সামনের দিকে নয়। এ লক্ষণটি একেবারেই মানুষের। এ থেকে বোঝা যায় অস্ট্রালোপিথেকাস মাথা খাড়া রেখে চলতে পারত (তাই বলে একেবারে মানুষের মতো সিধে খাড়া নয়), বনমানুষরা যা পারে না।

অস্ট্রালোপিথেকাসের মাথার খুলিতে এমনি আরো লক্ষণ আছে যা বনমানুষ-সুলভ নয়, যার সঙ্গে মিল মানুষের।

এ-প্রসঙ্গে দাঁতের কথাও তোলা যেতে পারে। কৃন্তক দাঁত অপেক্ষাকৃত ছোট, ছেদক যদিও বড়ো ও শক্তসমর্থ কিন্তু গড়নের দিক থেকে মানুষের মতোই। নিচের চোয়ালের পুরঃপেষক দাঁতটির গড়ন বিশেষভাবে লক্ষ করবার মতো। বনমানুষদের বেলায় এই পুরঃপেষক দাঁতটিকে ওপরের চোয়ালের শক্তিশালী ছেদকের জন্যে জায়গা দিতে হয়। এটা বনমানুষেরই বিশেষ লক্ষণ, মানুষের নয়। অস্ট্রালো-পিথেকাসের বেলায় এই লক্ষণটি নেই, তার পুরঃপেষক মানুষের মতোই। সবচেয়ে বড়ো কথা, অস্ট্রালোপিথেকাসের দাঁতের পাটির আকার সমান মাত্রায় বাঁক নেওয়া বৃত্তাংশের মতো।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, অস্ট্রালোপিথেকাসের মাথার খুলি মগজের মাপে এবং বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসা প্রকাণ্ড চোয়ালের গড়নে যদিও বনমানুষের মতো কিন্তু বহু ব্যাপারেই মানুষের লক্ষণ বিশিষ্ট।

পরবর্তীকালে অস্ট্রালোপিথেকাসের শুধু মাথার খুলি নয়, শরীরের কয়েকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হাড়ও পাওয়া গিয়েছে। যেমন উরুর হাড় (ফেমুর), হাঁটু ও গোড়ালির মধ্যবর্তী পায়ের হাড় (টিবিয়া), গোড়ালির একটি হাড়, হাতের হাড় (হিউমারাস ও আল্‌না), কবজির একটি ছোট হাড়, কাঁধের ফলকের অংশ বিশেষ,

মেরুদণ্ডের টুকরো, পাঁজরা ও কোমরের হাড়। প্রত্যেকটি হাড়ের গড়ন থেকে সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, বনমানুষ নয়, মানুষের সঙ্গেই তাদের মিল।

এ থেকে বোঝা যায়, প্লাইস্টোসিন কালের শুরুতে (কিংবা তার আগেই) হোমিনিডের ক্রমবিকাশের ধারাটি সুস্পষ্টভাবেই মনুষ্যসদৃশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গড়ে তোলার দিকে অগ্রসর হয়েছিল।

ড্রাইওপিথেকাস

দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে চোখ সরিয়ে এনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দিকে তাকালে দেখা যাবে, অস্ট্রালোপিথেকাসের সমসাময়িক কালে পৃথিবীর অন্য সব দেশে কেনিয়ার প্রো-কন্‌সালরা বিপুলভাবে বংশ-বিস্তার করেছে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে ড্রাইওপিথেকাস (Dryopithecus)। চেহারার দিক থেকে এরা অনেকখানি বনমানুষ, অল্পই মানুষ। দেখে বোঝা যায়, ঝোঁকটা বনমানুষ হবার দিকে। ফ্রান্স, শ্লোভাকিয়া আর আফ্রিকায় এরা রয়েছে। আর রয়েছে ভারতবর্ষের শিবালিক পাহাড়ে। শিবালিক পাহাড় হচ্ছে হিমালয়ের দক্ষিণ শ্রেণীর পশ্চিমাংশ। গত ত্রিশ বছরে এই পাহাড়ে এবং আশেপাশে অনেকগুলো এপ্‌-এর ফসিল পাওয়া গেছে। এসব নিদর্শনের মধ্যে ড্রাইওপিথেকাস তো আছেই, পাশাপাশি আছে অন্য ধরনের এপ্‌। নাম দেওয়া হয়েছে রামপিথেকাস, ব্রহ্মপিথেকাস, শিবপিথেকাস, সুগ্রীবপিথেকাস। চেহারার দিক থেকে এদের সঙ্গে বনমানুষের চেয়ে মানুষের মিল বেশি। এ-কারণেই এপ্‌ থেকে মানুষের ক্রমবিকাশের ধারায় শিবালিক পাহাড়ে পাওয়া নিদর্শনগুলোর গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, এই অঞ্চলে যদি ভালোভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান চালানো যায় তবে আরো অনেক মূল্যবান নিদর্শন পাওয়া যাবে। কোনো কোনো বিজ্ঞানীর ধারণা, এই শিবালিক অঞ্চলেই মানবজাতির শৈশব কেটেছে।

পিকিং মানুষ (সিনানথ্রপাস)

এবার চোখ ফেরাতে হবে চীনের দিকে। দৃশ্যটা আগের মতোই। মরুভূমির সীমানায় চুনাপাহাড়, পাহাড়ের গায়ে মস্ত মস্ত গুহা, আশেপাশে সামান্য গাছপালা। সময়টা হচ্ছে প্লাইস্টোসিন কল্পের শুরু, অর্থাৎ প্রায় দশলক্ষ বছর আগে। নানান ধরনের জন্তুজানোয়ার ঘোরাফেরা করছে। গণ্ডার, ঘোড়া, উট, ভেড়া, বাইসন, মহিষ হাতি, হরিণ, ভালুক, বাঘ, হায়েনা। আর এইসব জন্তুজানোয়ারের সঙ্গেই ঘোরাফেরা করছে বনমানুষের মতো দেখতে একদল মানুষ, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে পিকিং মানুষ বা সিনানথ্রপাস (Sinanthropus)।

পিকিং মানুষ লম্বায় মাঝারি গোছের, চার ফুট এগারো-ইঞ্চি থেকে পাঁচ ফুট তিন-ইঞ্চি পর্যন্ত। ছ'পায়ের ওপরে ভর দিয়েই স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পারে। হাঁটবার সময়ে পা-ছুটো ধনুকের মতো বেঁকে যায় আর শরীরটা একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। শিকার করতে বেরোয় দল বেঁধে। যে-সব পাথরের অস্ত্র এরা ব্যবহার করে সেগুলো ঠুকে ঠুকে ধারালো করা। লাঠিও ব্যবহার করে। শিকার করার ব্যাপারে কোনো বাছবিচার নেই, আশেপাশের সব রকম জন্তুই এদের শিকার। আবার একথাও হয়তো বলা চলে, এদের নিজেদেরও বড়ো বেশি শিকার হতে হয়। চাউ-কাউ-তিয়েনের গুহা থেকে সিনানথ্রপাসের যে কটি হাড় পাওয়া গিয়েছে তা সবই ভাঙা। এমন-ভাবে ভাঙা যে দেখে মনে হয়, কেউ যেন হাড়ের ভেতর থেকে মজ্জা বার করতে চেষ্টা করেছে। তাছাড়া, সিনানথ্রপাসের হাড়গুলো পাওয়া গিয়েছে অন্য অনেক জন্তুজানোয়ারের হাড়ের স্তূপের মধ্যে থেকে। দেখেশুনে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে, সিনানথ্রপাসরা নর-খাদক ছিল, সুযোগ পেলেই তারা একে অন্যকে শিকার করত।

সিনানথ্রপাসের গুহায় সবচেয়ে বেশি পাওয়া গিয়েছে মাথার খুলির করোটিক। ছুটো ব্যাখ্যা আছে। এক হতে পারে যে মাথার খুলির করোটিককে এরা শিকারের গৌরবচিহ্ন হিসেবে রেখে দিত।

আরেক হতে পারে যে করোটিককে এরা ব্যবহার করত পাত্র হিসেবে।

সিনানথ্রপাসের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব, পাথরের অস্ত্র তৈরি করতে পারা। লাঠি বা পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে কোয়ার্টজ্ শিলা থেকে পরতগুলো খসিয়ে ফেলত। তারপর সেই পরত আর মাঝখানের অংশ—দুটোকেই ব্যবহার করত অস্ত্র হিসেবে। এছাড়া, জন্তু-জানোয়ারের হাড় ও হরিণের শিং থেকে অস্ত্র তৈরি করে নেওয়ার কায়দাটা তাদের পুরোপুরি জানা ছিল।

সিনানথ্রপাসের মাথার খুলির মধ্যে এমন সব চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে যা থেকে বলা চলে, তাদের মধ্যে খুব প্রাথমিক ধরনের ভাষার প্রচলন ছিল।

আগুনের ব্যবহারও তারা জানত।

জাভা মানুষ (পিথিকানথ্রপাস)

সিনানথ্রপাস বা পিকিং মানুষ এ-কালের একমাত্র সাক্ষ্য নয়। পিকিং থেকে খুব বেশি দূরে নয়, খানিকটা দক্ষিণেই পাওয়া গিয়েছে অপর একটি সাক্ষ্য : জাভা মানুষ বা পিথিকানথ্রপাস (Pithecanthropus)। শরীরের গড়নের দিক থেকে পিকিং মানুষের সঙ্গে জাভা মানুষের বিশেষ কোনো তফাত নেই।

মানুষের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে সিনানথ্রপাস ও পিথিকানথ্রপাসের বিশেষ স্থান। মানুষের ঠিকানার দিকে যেতে হলে এই দুটি ফসিল সম্পর্কে আরো কিছু খবর জেনে রাখা দরকার।

পিথিকানথ্রপাসের ফসিল বলতে গোড়ায় পাওয়া গিয়েছিল মাথার খুলির করোটিক ও উরুর একটি হাড়। করোটিকের আকার ছিল চ্যাপ্টা ধরনের, অক্ষিকোটর বড়ো ও বেশ প্রকট, কপাল একেবারেই নেই, খুলির আকারটি ছোট। এসবই এপ্-এর লক্ষণ। কিন্তু উরুর

বছর আগে পর্যন্ত পেঁৗছে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে, ইউরোপ এশিয়া ও আফ্রিকার নানা জায়গায় মানুষের আধিপত্য শুরু হয়েছে। অবশ্য পুরোপুরি আধুনিক মানুষ (যাদের বলা হয় হোমো স্যাপিয়েন্‌স) নয়, চেহারায় ও চালচলনে কিছুটা এপ্‌। তবে ঝোঁকটা পুরোপুরি মানুষ হবার দিকে। অস্ট্রালোপিথেকাসকে বলা চলে মানুষের মতো দেখতে এপ্‌। কিন্তু পিকিং ও জাভা মানুষ শুধু নামে নয়, চেহারায় ও চালচলনেও অনেকখানি মানুষ, এপ্‌-এর মতো দেখতে মানুষ। তাছাড়া, পিকিং ও জাভা মানুষের মস্ত কৃতিত্ব, তারা হাতিয়ার তৈরি ও ব্যবহার করতে জানত আর ভাষার মাধ্যমে অল্পবিস্তর ভাব প্রকাশ করতে পারত। আর মানুষ যে পুরোপুরি মানুষ হতে পেরেছে তা এই দুটির জোরেই। হাতিয়ার ও ভাষা।

নেয়ানডার্থাল মানুষ

এপ্‌ থেকে মানুষের ক্রমবিকাশের ধারাটি অনুসরণ করতে করতে এরপর যেখানে এসে তাকাতে হবে সেখানকার দৃশ্য একেবারে ভিন্ন ধরনের। সময়টা হচ্ছে হিমযুগ। আল্পস্‌, পিরেনিজ ও হিমালয় পর্বতের চুড়ো থেকে হিমবাহ নেমে এসেছে। সারা দেশের ওপরে পুরু একটা বরফের চাদর। এই বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড ও উত্তর ইতালি। ওদিকে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে বৃষ্টির আর বিরাম নেই, বন্যার মতো জলস্রোত। এক কথায়, পৃথিবীর আবহাওয়াটাই একেবারে অন্যরকম। কোথাও জোলো স্যাঁৎসেঁতে শীত, কোথাও শুকনো কনকনে ঠাণ্ডা। ইউরোপের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় এতদিন যে-সব জন্তুজানোয়ার বাস করত তারা শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। বাঘ, হাতি, গণ্ডার, হিপোপটেমাস ইত্যাদি জন্তু তারপরে আর কোনো সময়েই ইউরোপে ফিরে

যায় নি। তবে হিমযুগের ইউরোপে হাতি না থাকুক, ম্যামথ আছে। সাধারণ গণ্ডার না থাকুক, আছে বিশেষ ধরনের গণ্ডার যাদের সারা শরীর ঘন পশমে ঢাকা। অর্থাৎ শুধু সেই ধরনের জীব যাদের শরীরের স্বাভাবিক গড়নটাই এমন যে প্রচণ্ড শীতের সঙ্গে যুঝবার মতো আয়োজন শরীরের মধ্যেই বর্তমান।

কিন্তু মানুষের কথা আলাদা। প্রচণ্ড শীত সহ্য করবার মতো স্বাভাবিক আয়োজন তার শরীরে নেই। কাজেই তাকে কৃত্রিম আয়োজন করতে হয়। এই কৃত্রিম আয়োজনের মধ্যে একটি হচ্ছে গুহাবাসী হওয়া।

তার মানে, আবহাওয়া বদলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের জীবনযাত্রাও বদলে যায়। শীত শুরু হলেই গুহায় আশ্রয় না নিয়ে তার উপায় নেই। তারপর গুহাটাকে নানাভাবে বসবাসের উপযোগী করে তুলতে হয়। আগুন জ্বালায়, পাথরের অস্ত্র তৈরি করে, শিকার করা জন্তুজানোয়ারের হাড়গোড় ছড়িয়ে ফেলে রাখে। শীত শেষ হলেই বেরিয়ে পড়ে গুহা ছেড়ে। হয়তো আর কখনো ফিরে আসে না। তখন হায়েনার পাল এসে ঢোকে সেই গুহায় আর ফেলে দেওয়া হাড়গুলোকে চিবিয়ে খেতে চেষ্টা করে। এত হাজার বছর পরেও প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের গুহা থেকে পাওয়া হাড়ের ওপরে হায়েনার দাঁতের দাগ পাওয়া গেছে।

আরো একটা ব্যাপার আছে। মনে করা যাক, একদল প্রাগৈতি-হাসিক মানুষ একটি গুহার মধ্যে কিছুকাল বসবাস করার পরে গুহাটি ছেড়ে চলে গেছে। তখনো সেই গুহার মধ্যে রয়ে গেছে তাদের জীবনযাত্রার অজস্র চিহ্ন ও সাজসরঞ্জাম। ওদিকে ঠাণ্ডায় আর গরমে গুহার ছাদে ফাটল ধরে আর ছাদ থেকে বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই খসে পড়ে মেঝের ওপরে। গুহার ছাদ ও দেওয়াল থেকে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে, জলের সঙ্গে কাদা ও বালি। এই-ভাবে গুহার মেঝের ওপরে নতুন একটি আস্তর জমতে শুরু করে। যতোই দিন যায় ততোই পুরু হয় আস্তরটি। তারপর হয়তো

নতুন আরেক দল মানুষ এসে সেই গুহার মধ্যে আবার কিছুকাল বসবাস করে, আবার মানুষের জীবনযাত্রার কিছু সাজসরঞ্জাম। সেই মানুষের দল চলে যাবার পরে সেই সাজসরঞ্জামের ওপরে আবার নতুন একটা আস্তর—এমনি চলে পর্যায়ক্রমে। প্রত্নবিদরা যখন একটি গুহা খুঁড়তে শুরু করেন তখন কোন্ আস্তরটি কতখানি পুরু আর কোন্ আস্তরে কী কী সাজসরঞ্জাম পাওয়া গেছে তা থেকেই বিভিন্ন যুগের মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক কিছু ধারণা করে নিতে পারেন।

এই হিমযুগের গুহাবাসী মানুষদের নাম দেওয়া হয়েছে নেয়ানডার্থাল মানুষ। তারা সংখ্যায় প্রচুর আর ইউরোপ এশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার নানা অঞ্চলে ছড়ানো। মানুষটার ধড় ছোট, মুণ্ডু প্রকাণ্ড, লম্বায় পাঁচ ফুট এক-ইঞ্চি থেকে পাঁচ ফুট তিন-ইঞ্চির মধ্যে। যদিও খাড়া হয়েই চলাফেরা করে কিন্তু মাথাটা ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে, হাঁটুছটো বেঁকে যায়। মাথার খুলির গড়নটা পুরোপুরি আধুনিক নয়, বরং তার সঙ্গে কিছুটা মিল রয়েছে পিকিং মানুষের সঙ্গে—কিন্তু মগজটা বেশ বড়োসড়ো (১৫৪০ সি. সি.), আধুনিক মানুষের মতোই।

নেয়ানডার্থাল মানুষের গুহার দিকে তাকালে দেখা যাবে, পাথর থেকে পরত খসিয়ে খসিয়ে সে নানারকম হাতিয়ার ও অস্ত্র তৈরি করেছে। এমন কি পশমের পোশাক সেলাই করার হাতিয়ার পর্যন্ত।

জার্মানির ডুসেলডর্ফ ও এল্‌বেরফেল্ড-এর মাঝখানে যে গিরিপথটি রয়েছে তার নাম নেয়ানডার্থাল। এই গিরিপথের ধারে একটি গুহার মধ্যে থেকে ১৮৫৬ সালে পাওয়া গিয়েছিল একটি করোটিক ও কিছু হাড়পাঁজর। এই করোটিক ও হাড়পাঁজরের মালিকটিই আমাদের নেয়ানডার্থাল মানুষ। এটি প্রথম নিদর্শন। হিসেব করে দেখা গেছে যে প্রায় পঁচাত্তর হাজার বছর আগে এই মানুষটি বেঁচে ছিল। পরে অবশ্য পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে নেয়ানডার্থাল মানুষের আরো নিদর্শন পাওয়া গেছে।

সোয়ান্সকোম্ব ও ফোঁতেশভাদ মানুষ

সে-সময়ে পৃথিবীতে শুধু নেয়ানডার্থাল মানুষরাই ছিল না। সাক্ষ্যপ্রমাণ যদিও কম, তবে আরো অন্তত দু'ধরনের মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। একটি দক্ষিণ ইংলণ্ড থেকে, অপরটি ফ্রান্সের আটলান্টিক উপকূল থেকে। একটির নাম সোয়ান্সকোম্ব (Swanscombe) মানুষ, অপরটির নাম ফোঁতেশভাদ (Fontechevade) মানুষ। এই দুটি মানুষের নাম জেনে রাখা দরকার, একদল বিজ্ঞানীর মতে এপ্ থেকে মানুষের ক্রমবিকাশে এই দুটি মানুষের বড়ো ভূমিকা।*

ক্রমবিকাশের ধাপ

এপ্ থেকে মানুষের ক্রমবিকাশকে অনুসরণ করে আমরা এ-পর্যন্ত যতো দূর এসেছি তার মধ্যে চারটি আলাদা ধাপ রয়েছে। একেবারে প্রথম ধাপে নির্ভেজাল এপ্। এই বিশেষ দলটির নাম প্যারাপিথেকাস। দ্বিতীয় ধাপে অস্ট্রালোপিথেকাস। এরাও এপ্ তবে মানুষের কিছু কিছু লক্ষণ যুক্ত। শুধু শরীরের গড়নের দিক থেকে

---

* ইলংণ্ডের সাসেক্স্-এ পিল্ট্ডাউন নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রাম থেকে ১৯০৮ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে কয়েক টুকরো মাথার খুলির হাড় পাওয়া গিয়েছিল। সেই থেকে পিল্ট্ডাউন মানুষ। মানুষটির মগজের আয়তন ছিল ১০৭০ সি. সি.। বলা হয়েছিল যে এই মানুষটিই মানুষের সত্যিকারের পূর্বপুরুষ এবং পঁচাত্তর হাজার থেকে একলাখ বছর আগেকার বাসিন্দা। পরে এই সংখ্যাটিকে আরেকটু কমিয়ে বলা হয়েছিল, চল্লিশ হাজার বছর। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৩ সালে প্রমাণ করা হয়েছে যে পিল্ট্ডাউন মানুষ মস্ত একটা জালিয়াতি। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন পাকাপোক্ত জালিয়াতির দৃষ্টান্ত দুটি নেই। চল্লিশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা ধরতে পারেন নি যে পিল্ট্ডাউন থেকে যে হাড়গুলো পাওয়া গিয়েছিল তা নকল।

নয়, জীবনযাত্রার দিক থেকেও, কারণ, এরা দল বেঁধে বাস করত আর কিছু কিছু হাতিয়ারের ব্যবহার জানত। তৃতীয় ধাপে পিকিং মানুষ (সিনানথ্রপাস) ও জাভা মানুষ (পিথিকানথ্রপাস)। এদের দেখে বলা শক্ত এরা মানুষের মতো দেখতে এপ্, এপ্-এর মতো দেখতে মানুষ। এদের শরীরের গড়নে এপ্-এর লক্ষণ ও মানুষের লক্ষণ সমান মাত্রায়। তবে মগজ খাটানোর ব্যাপারে অনেকখানি মানুষ কেননা এরা পাথর থেকে পরত খসিয়ে নানা ধরনের হাতিয়ার তৈরি করতে পারত। চতুর্থ ধাপে নেয়ানডার্থাল মানুষ। যদিও মাথার খুলির গড়নে কিছুটা এপ্-সুলভ ভাব রয়ে গেছে, কিন্তু মানুষ বলে চিনতে এতটুকু ভুল হয় না।

চারিটি ধাপের কথা বলা হয়েছে। তাই বলে এমন ধারণা যেন না হয় যে এপ্ থেকে মানুষের ক্রমবিকাশে মাত্র এই চারটিই ধাপ রয়েছে। মানুষের ক্রমবিকাশের ধারাটি এতটা সরল নয়। আমরা দেখেছি, পিকিং মানুষ ও জাভা মানুষের সমকালে ময়ার মানুষও এই পৃথিবীতে ছিল। নেয়ানডার্থাল মানুষের সঙ্গে একই সময়ে ফোঁতেশভাদ মানুষ। এ অবস্থায় ক্রমবিকাশের ধাপগুলো সম্পর্কে এখনো নিশ্চিতভাবে কিছু বলা চলে না।

তবে প্রথম দুটি ধাপ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা মোটামুটি একমত। প্যারাপিথেকাস ও অস্ট্রালোপিথেকাস। কিন্তু তার মানেও এই নয় যে আধুনিক মানুষ হচ্ছে সরাসরি অস্ট্রালোপিথেকাসের বংশধর। এই দুটি শব্দের সাহায্যে দুটি ধাপ বোঝানো হয়েছে মাত্র। এপ্ থেকে মানুষে পৌঁছতে শরীরের গড়নের দিক থেকে যতো রকম অদলবদল হয়েছে তারই বিশেষ কতকগুলো লক্ষণ মিলিয়ে এক-একটি ধাপ। প্যারাপিথেকাস ও অস্ট্রালোপিথেকাস সম্পর্কে শুধু এটুকু বলা চলে যে মানুষের পূর্বপুরুষ হয়তো এরাই, কিংবা এরা যদি নাও হয় তো হুবহু এদেরই মতো একদল এপ্।

অস্ট্রালোপিথেকাস থেকে আধুনিক মানুষে পৌঁছতে গিয়ে এক-একদল বিজ্ঞানী এক-একটি রাস্তায় পাড়ি দিয়েছেন। তৃতীয় ধাপটি

সম্পর্কে এক-এক দলের এক-এক মত। একদলের মতে তৃতীয় ধাপটি হচ্ছে পিকিং ও জাভা মানুষ, একদলের মতে হাইডেলবার্গ মানুষ, আবার আরো একদল আছেন যাঁরা মনে করেন তৃতীয় ধাপটি এখনো পর্যন্ত জানা যায় নি বা মিসিং।

নেয়ানডার্থাল মানুষ চতুর্থ ধাপ কিনা, এই নিয়েও নানা মত। তবে অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন, নেয়ানডার্থাল মানুষ কোনো বংশধর রেখে যেতে পারে নি। পৃথিবী থেকে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। কাজেই চতুর্থ ধাপে কেউ কেউ বসাচ্ছেন সোয়ান্সকোম্ব ফোঁতেশভাদ মানুষকে, কেউ কেউ বসাচ্ছেন মস্ত একটা প্রশ্নচিহ্ন।

মোটামুটি এটুকু বোধ হয় বলা চলে যে অস্ট্রালোপিথেকাস থেকে মানুষে পৌঁছতে জীবজগতে অনেকগুলো চেষ্টা একসঙ্গে শুরু হয়েছিল। তার মধ্যে মাত্র একটিই সফল হয়েছে। তবে সেটি যে কোন্‌টি তা স্পষ্টভাবে দেগে দেবার মতো মালমসলা এখনো আমাদের হাতে নেই।

গোড়ার কথা

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি এপ্‌ থেকে মানুষের বিবর্তনের কয়েকটি ধাপ নিয়ে। কিন্তু তার চেয়েও গোড়ার কথা, এপ্‌ থেকে মানুষের বিবর্তনের এই ধারাটির সূত্রপাত কি-ভাবে? এ-প্রশ্নের জবাবে আবার সেই জীবকোষের পরিবর্তনীয়তা ও পরিবর্তমানতার কথা তুলতে হয়। কিন্তু কোনো কোনো বিজ্ঞানী ব্যাপারটাকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন ও একটি তত্ত্ব খাড়া করেছেন। এখানে এই তত্ত্বটি শুধু উল্লেখ করতে চাই।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ করে দেখেছেন, পোকামাকড়-কীটপতঙ্গ জাতীয় কোনো কোনো জীব ভ্রূণ অবস্থাতেই বংশবৃদ্ধি করতে পারে। 'ভ্রূণ-অবস্থা' কথাটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। একটি ব্যাঙের ডিম

সরাসরি পূর্ণাঙ্গ একটি ব্যাঙে রূপান্তরিত হয় না। মাঝখানে থাকে অনেকগুলো পর্ব। এই পর্বগুলোকে বলা হয় ভ্রূণ অবস্থা, ইংরেজিতে লার্ভা (larva)। ব্যাঙ অবশ্য লার্ভা অবস্থাতে বংশবৃদ্ধি করে না, কিন্তু পোকামাকড়-কীটপতঙ্গ জাতীয় কোনো কোনো জীব করে। একটি লার্ভা থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি, চারটি থেকে আটটি— এমনিভাবে বংশবৃদ্ধির ব্যাপারটা চলতে থাকে। এভাবে বংশবৃদ্ধি করাকে ইংরেজিতে বলে নিওটেনি (Neoteny)। কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলেছেন, এপ্ থেকে মানুষের ক্রমবিকাশেও এমনি একটা নিওটেনির ব্যাপার থাকতে পারে। কথাটার মানে কি?

আমরা যখন বলি, এপ্ থেকে মানুষ এসেছে তখন ধরে নিই না যে এপ্-এর সঙ্গে মানুষের কোনো অমিল নেই। অমিল অনেক, সবচেয়ে বড়ো অমিল মাথার খুলির গড়নে। মানুষের চোয়ালের হাড় ছোট, করোটিক বড়ো, কপাল উঁচু। মানুষের গায়ে লোম প্রায় না-থাকার মতো। মানুষের দাঁত বেশি বয়সে গজায়। মানুষের শরীরের হাড় প্রায় পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়ে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা লক্ষ করে দেখেছেন, এপ্-এর ভ্রূণের সঙ্গে মানুষের ভ্রূণের বিশেষ কোনো অমিল নেই। তাই কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলতে শুরু করেছেন, এপ্-এর ভ্রূণ থেকে মানুষের বিবর্তন হয়েছে। আর এই আশ্চর্য বিবর্তনের গোড়ায় নিওটেনির মতো একটা ব্যাপার থাকা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়। অর্থাৎ একটি এপ্-এর ভ্রূণ ভ্রূণ-অবস্থাতেই এক থেকে একাধিক হয়ে গিয়েছিল, যার নাম নিওটেনি। আর তা হতে গিয়ে এই ভ্রূণগুলোর মধ্যে কতকগুলো নতুন লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই নতুন লক্ষণবিশিষ্ট ভ্রূণ থেকেই মানুষের বিবর্তন।

গোড়ার কথা আরও আছে। মানবজাতির শৈশবকাল কোথায় কেটেছে? সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার আগে কোন্ বিশেষ অঞ্চলে পৃথিবীর আলো-বাতাসের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়?

এ প্রশ্নের নিশ্চিত জবাব দেওয়া যাবে না। তবে খানিকটা অনুমান করা চলে।

মানুষের শরীরে লোম না-থাকা, দেরিতে দাঁত গজানো—এসব দেখে এটুকু বোঝা যায় যে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ আবহাওয়াতেই তার শৈশবকাল কেটেছে। তাছাড়া, সে-সময়ে খাদ্যের জন্যে তাকে বেশির ভাগ সময়ে ফলমূলের ওপরেই নির্ভর করতে হত। আর উষ্ণ আবহাওয়াতেই সারা বছর ফলমূলের যোগান থাকা সম্ভব। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা একমত। কিন্তু তর্ক উঠেছে তার পরের প্রশ্নটি নিয়ে। এই উষ্ণ আবহাওয়ার অঞ্চলটি কোথায়? আফ্রিকায় না এশিয়ায়? কেউ বলছেন, আফ্রিকার কেনিয়া বা ট্রান্স্‌ভাল হচ্ছে মানবজাতির জন্মস্থান। কেউ বলছেন, হিমালয়ের শিবালিক পাহাড়-অঞ্চল। দু' দলের দাবিই সমান জোরালো। এখনো পর্যন্ত আফ্রিকার পক্ষাবলম্বীরা দলে ভারী; তবে এশিয়ার পক্ষাবলম্বীরা বলছেন যে শিবালিক পাহাড় অঞ্চলে ভালোভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান চালালে তাদের দাবির সপক্ষে প্রচুর সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যাবে। শিবালিক পাহাড় অঞ্চল থেকে অল্প চেষ্টাতেই যে-সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তা দেখে বলা চলে, এই দ্বিতীয় দলের দাবি ও যুক্তি বাস্তবক্ষেত্রে যাচাই করে নিতে পারলে হয়তো এই প্রশ্নটির চূড়ান্ত মীমাংসা হত।

আধুনিক মানুষ

এপ্‌ থেকে মানুষের ক্রমবিকাশে চারটি ধাপের কথা বলা হয়েছে। পঞ্চম বা শেষ ধাপটি হচ্ছে আধুনিক মানুষ। আধুনিক মানুষের কথা দু' এক কথায় বলার নয়, সারা বইটি জুড়েই বলতে হবে। 'আধুনিক' কথাটাও তর্কসাপেক্ষ। মানুষ ঠিক কোন্‌ সময় থেকে আধুনিক? কৃষি আবিষ্কারের পর থেকে? লোহা আবিষ্কারের পর থেকে? লেখা আবিষ্কারের পর থেকে?

আমরা এতক্ষণ 'আধুনিক' শব্দটি ব্যবহার করেছি জীববিজ্ঞানের দিক থেকে। এখনো তাই করছি। যখন থেকে মানুষের শরীরের

গড়ন এখনকার মানুষের শরীরের গড়নের মতো, তখন থেকেই মানুষ আধুনিক। এই হিসেবে আধুনিক মানুষের বয়স প্রায় ত্রিশ হাজার বছর। আধুনিক মানুষের সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে ফ্রান্সের দোর্দোঞ অঞ্চল থেকে ১৮৬৮ সালে। মানুষটি লম্বায় প্রায় ছ'ফুট, শরীরের গড়নের দিক থেকে পুরোপুরি আধুনিক। এই মানুষটির নাম দেওয়া হয়েছে ক্রো-মাঞঁ (Cro-Magnon) মানুষ। পরে ফ্রান্সের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে ও ইতালির গ্রিমাল্দি গুহা থেকে আধুনিক মানুষের আরো কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। তারা কেউ ক্রো-মাঞঁ মানুষের মতো, কেউ আলাদা। তবে সকলেই পুরোপুরি আধুনিক।*

---

* ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ চীনের কোয়াংসি অঞ্চল থেকে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের একটি নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। একটি মাথার খুলি। লিউকিয়াং গ্রামের তুঙতিয়েনইয়েন গুহা থেকে পাওয়া গিয়েছে বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে লিউকিয়াং মানুষ। মাথার খুলি দেখে বোঝা যায় যে এই মানুষটি হোমো স্যাপিয়েন্স বা আধুনিক মানুষের সগোত্র। খুব সম্ভবত প্লাইস্টোসিন কালের শেষদিকে এই মানুষটি বেঁচে ছিল। আধুনিক মানুষের এটি অন্যতম নিদর্শন (পিকিং রিভিউ, ১৪ই জুলাই ১৯৫৯, সংখ্যা ২৮)।

মানুষ কিসে বড়ো

মানুষ কিসে বড়ো?

এমনিতে মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখলে বড়াই করার মতো কিছু নেই। একটা হাতির গায়ের জোর দশ-বিশটা মানুষের গায়ের জোরের সমান। হাতির একটা পায়ের চাপে মানুষের আস্ত একটা শরীর গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে যেতে পারে। বরফের দেশের ভালুকের গায়ে আছে ঘন লোম, শীত তাকে কাবু করতে পারে না। কিন্তু মানুষের গায়ে এমন কোনো স্বাভাবিক ব্যবস্থা নেই যাতে তার পক্ষে শীত সহ্য করা সম্ভব। বিপদের সামনে পড়লে একটা খরগোশ যে-ভাবে চোখের নিমেষে উধাও হয়ে যায়, মানুষ তা পারে না। একটা গিরগিটি যে-ভাবে গায়ের রঙ পাল্‌টে শত্রুর চোখে ধুলো দেয়, মানুষের পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব। কচ্ছপ বা কাঁকড়ার শরীরের ওপরে যেমন বর্ম আঁটা থাকে মানুষের শরীরে তেমন কোনো স্বাভাবিক বর্ম নেই। পাখির মতো ডানা নেই মানুষের, শকুনির মতো ধারালো চোখ নেই, বাঘের মতো থাবা নেই।

আর অতীত মানুষের যে-সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে বলা চলে, গত কয়েক লক্ষ বছরে মানুষের শরীর মোটামুটি একই রকম। এমন কোনো লক্ষণ কোথাও নেই যা দেখে বলা যেতে পারে, মানুষের শরীরের কোনো একটি প্রত্যঙ্গে এমন পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে যে সেটি কালক্রমে আত্মরক্ষার ধারালো অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে।

তবুও দুর্বল আর অসহায় এই মানুষই গোটা পৃথিবীতে আধিপত্য করছে।

কিসের জোর মানুষের ?

হাতিয়ার

জোর হাতিয়ারের। হাতিয়ার হচ্ছে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলার কৃত্রিম উপায়। যেমন, মানুষের হাতে ধারালো নখ নেই কিন্তু মানুষ অনায়াসেই এক টুকরো ধারালো পাথর হাতে নিয়ে এই ঘাটতি পূরণ করতে পারে। তেমনি বলা চলে, একটা লাঠি হাতে নিয়ে মানুষ পারে নিজের হাতকে অনেকখানি লম্বা আর জোরালো করে তুলতে। আবার লাঠির চেয়েও হাজার গুণ লম্বা ও জোরালো করে তুলতে পারে বর্শা বা তীরধনুকের সাহায্যে। হাতিয়ারের যতো উন্নতি, মানুষের ততো জোর।

তাই হিমযুগে ম্যামথদের টিকে থাকার জন্যে শরীরের ওপরে ঘন লোম থাকার দরকার ছিল, কিন্তু মানুষকে টিকে থাকার জন্যে তার দরকার হয় নি। মানুষ টিকে থাকতে পেরেছিল কারণ আগুন ছিল মানুষের বশে আর ঘন পশমওলা চামড়া দিয়ে কৃত্রিম পোশাক বানিয়ে নেবার কায়দা তার জানা ছিল। ম্যামথদের ক্ষমতা স্বাভাবিক, মানুষের ক্ষমতা কৃত্রিম। একটা ম্যামথের বাচ্চা সারা গায়ে ঘন লোম নিয়েই জন্মাত। কিন্তু মানুষের বাচ্চাকে জন্মাবার পরে হাতে ধরে শেখাতে হত কি-ভাবে আগুনের আঁচে বা ঘন লোমওলা চামড়ার পোশাক পরে শরীরকে গরম রাখতে হয়।

তার মানে, হাতিয়ারের সাহায্যে মানুষ এমন একটা ব্যবস্থা করে নিতে পেরেছিল যাতে হিমযুগের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে কোনো অসুবিধে না হয়।

এজন্যেই হিমযুগের পরে যখন পরিবেশ বদলে গেল তখন মানুষ নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পেরেছিল, কারণ তার পক্ষে

সেটা ছিল শুধু একটা ভিন্নতর আয়োজন করার ব্যাপার। কিন্তু ম্যামথরা সেই নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে নি। কেননা ম্যামথদের শরীরের গড়নটাই ছিল এমন যে তাদের বেঁচে থাকতে হলে বিশেষ করে হিমযুগের পরিবেশটাই দরকার। যতোদিন এই বিশেষ পরিবেশ ততোদিনই তাদের আয়ু।

কথাটা আবার বলছি। মানুষের শরীর এমনিতে বিশেষ কোনো পরিবেশের উপযুক্ত করে তৈরি নয়। যে-কোনো পরিবেশেই সে কিছুটা অসহায়। জন্তু জানোয়ারদের মতো তার শরীরে না আছে নখওলা থাবা, না ছুঁচলো দাঁত, না বিষ, না শিং। বলতে গেলে কিছুই নেই। সহজেই মনে হতে পারে মানুষের মতো এমন অসহায় জীবের পক্ষে এই হিংস্র পৃথিবীতে প্রাণ বাঁচিয়ে চলা বেশ শক্ত। পরিবেশ যদি নিতান্তই সদয় হয় তাহলেই হয়তো সে বাঁচতে পারে।

কিন্তু বাস্তবে ঘটছে ঠিক উল্‌টো ব্যাপারটি। বিচিত্র অস্ত্রসজ্জা সত্ত্বেও জন্তুজানোয়াররাই একান্তভাবে পরিবেশের ওপরে নির্ভরশীল। আর খুশিমতো পরিবেশকে পাল্‌টে নেবার ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই। মেরু-অঞ্চলের জীবজন্তুকে বিষুব-অঞ্চলে বা বিষুব-অঞ্চলের জীবজন্তুকে মেরু-অঞ্চলে জায়গা বদল করালে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখা যায় না। কিন্তু মানুষ এই দুই জায়গাতেই দিব্যি বেঁচে আছে। মেরু-অঞ্চলের ঠাণ্ডা বা বিষুব-অঞ্চলের গরম—কোনোটাই তাকে কাবু করতে পারে না।

কিসের জোর মানুষের?

আবার বলছি, জোর হাতিয়ারের।

শিম্পাঞ্জীর গৃহস্থালি

প্রশ্ন উঠতে পারে, বিশেষ করে মানুষের পক্ষেই বা কেন হাতিয়ার তৈরি করা সম্ভব হয়েছে? গোরিলার পক্ষে নয় কেন? কেন নয় শিম্পাঞ্জী ওরাং-ওটাং বা গিবনের পক্ষে?

বিজ্ঞানীরা এ-প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। একটি ঘটনা শুনলে বিজ্ঞানীদের জবাবটা বুঝতে সুবিধে হবে।

রুশ বিজ্ঞানী ইফান পেত্রোভিচ পাভলভ একজোড়া শিম্পাঞ্জীকে পোষ মানিয়েছিলেন। কর্তার নাম র‍্যাফেল, গিন্নীর নাম রোজা। র‍্যাফেল আর রোজার জন্যে তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল চমৎকার একটি বাড়ি। কোনো কিছুর অভাবটি ছিল না সে-বাড়িতে। আলাদা আলাদা ঘর ছিল শোওয়া, খাওয়া, স্নান করা, বসা, খেলার জন্যে। শোবার ঘরে ছিল চমৎকার দুটি বিছানা, বিছানার পাশে একটি করে টেবিল। খাবার ঘরে সাদা টেবিলক্লথে ঢাকা টেবিল। আলমারিতে থরে থরে সাজানো খাবার। গোটা বাড়িটায় এমনি সব বন্দোবস্ত। মনে হত না যে এই গৃহস্থালি মানুষের জন্যে নয়, একজোড়া শিম্পাঞ্জীর জন্যে।

কিন্তু দেখা গেল, যাদের জন্যে এত বন্দোবস্ত তারা ব্যাপারটাকে ঠিক বরদাস্ত করতে পারছে না। খাবার টেবিলে বসে তারা চামচ সরিয়ে রাখে আর নিতান্ত অভদ্রের মতো জিভ দিয়ে চেটে চেটে পুডিং খায়। রাত্রিবেলা কোথায় বালিশে মাথা দিয়ে শোবে তা না, বালিশগুলোকেই চাপায় মাথার ওপরে।

কিন্তু তাই বলে রোজা আর র‍্যাফেল পুরোপুরি বুনো থেকে যায় নি। কোনো কোনো ব্যাপারে তাদের চালচলন প্রায় মানুষের মতো হয়ে উঠেছিল। 'প্রায়' শব্দটা লক্ষ করতে বলছি। প্রায় মানুষের মতো—পুরোপুরি মানুষের মতো নয়।

যেমন, রোজা করত কি, পেছন থেকে চুপি চুপি এসে দরোয়ানের পকেট থেকে আলমারির চাবি তুলে নিত, তারপর খাবার ঘরে এসে চাবি ঘুরিয়ে আলমারির পাল্লা খুলত, তারপর একটা চেয়ার টেনে এনে আলমারির সামনে বসে মহানন্দে আঙুর আর অ্যাপ্রিকট খেত।

আর র‍্যাফেলের বাহাদুরিটা ছিল আরো বেশি। একটা ঘরের মাঝখানে সিলিং থেকে একগোছা অ্যাপ্রিকট ঝুলত আর ঘরের মধ্যে রেখে দেওয়া হত কয়েকটা ছোট-বড়ো চৌকোনা ব্লক।

বাচ্চাদের খেলার জন্যে যে-ধরনের ব্লক পাওয়া যায় তার চেয়েও বড়ো আর ভারী। ব্লকগুলোকে ওপর-ওপর সাজাতে পারলে তবেই অ্যাপ্রিকটের নাগাল পাওয়া সম্ভব—নইলে কিছুতেই নয়। আবার সাজাবার সময়েও সবচেয়ে বড়ো ব্লকটি বসাতে হবে একেবারে নিচে, তার ওপরে তার চেয়ে আরেকটু ছোট, তার ওপরে আরো ছোট, এমনিভাবে ছোট হতে হতে সবচেয়ে ওপরে সবচেয়ে ছোটটা।

জঙ্গলে থাকার সময়ে র‍্যাফেল অনেকবার গাছের মগডালে উঠে ফল পেড়েছে। কিন্তু ব্লক সাজিয়ে ফল পাড়াটা তার কাছে একে-বারে নতুন। গোড়ার দিকে তাকে সমস্যাটা নিয়ে হিমসিম খেতে হত। একটা ব্লকের ওপরে আরেকটা ব্লক বসিয়ে ফলের গুচ্ছের আরো খানিকটা কাছাকাছি আসা যায়—শুধু এটুকু আবিষ্কার করতেই র‍্যাফেল ব্লকগুলোকে ওলোট-পালোট করে একটা খণ্ডবিপ্লব ঘটিয়েছিল। তারপরে ছিল বড়ো থেকে ছোট হিসেবে সাজানোর সমস্যা। এ ব্যাপারটাও র‍্যাফেলকে আবিষ্কার করতে হয়েছিল অনেক অনেকবার ঠেকে শেখার পরে।

এ-সময়ে র‍্যাফেলকে দেখলে সত্যি সত্যিই মনে হত, মানুষের সঙ্গে তার কোনো তফাত নেই। কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখন সে গালে হাত দিয়ে বসে থাকত তখন সত্যিই মনে হত সে একটা কঠিন সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছে।

এবারে আবার সেই প্রশ্নটা ওঠে। র‍্যাফেল আর রোজা হাজার চেষ্টা করলেও কি মানুষ হতে পারত?

না, পারত না। কিছুতেই নয়।

না পারার কারণটাও বোঝা যায়। শিম্পাঞ্জীর শরীরের গড়ন মানুষের শরীরের গড়ন থেকে আলাদা। তার হাত অন্য ধরনের, পা অন্য ধরনের, মগজ অন্য ধরনের, জিভ অন্য ধরনের।

একটা শিম্পাঞ্জীকে হাঁ করিয়ে মুখের ভেতরে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, জিভটাকে নড়াবার মতো জায়গা বিশেষ নেই। যেটুকু জায়গা আছে তা মস্ত মস্ত দাঁতগুলো দিয়েই ভরাট।

তার মানে, সারা জীবন চেষ্টা করালেও একটা শিম্পাঞ্জীর মুখ থেকে মানুষের মতো কথা বার করা যাবে না।

শিম্পাঞ্জীর হাত মানুষের হাতের মতো একেবারেই নয়। তার হাতের বুড়ো আঙুলটা কড়ে আঙুলের চেয়েও ছোট, আর মানুষের হাতের বুড়ো আঙুল যেমন অন্য চারটি আঙুল থেকে খানিকটা তফাতে থাকে (যে-জন্যে অন্য আঙুলগুলোর সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে বা একসঙ্গে বুড়ো আঙুলের জোট বাঁধতে অসুবিধে হয় না) শিম্পাঞ্জীর হাত তেমন নয়। তার হাতের আঙুলগুলোও অনেকটা পায়ের আঙুলের মতো।

আর সবচেয়ে বড়ো তফাত, শিম্পাঞ্জীর মগজ মানুষের মগজের চেয়ে অনেক ছোট। মানুষের মতো মগজ খাটানো শিম্পাঞ্জীর ক্ষমতার বাইরে।

মগজ, হাত ও ভাষা

মানুষ যে হাতিয়ার তৈরি করতে পারে, তা কেন?

বিজ্ঞানীরা এ-প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, মানুষের মাথার খুলির ভেতরকার মগজটা অতি প্রকাণ্ড, অতি জটিল, এমনটি অন্য কোনো জীবে নেই। এই একটি ব্যাপারে মানুষ অন্য সমস্ত জীবের ওপরে টেক্কা দিয়েছে। আর এমনি একটি মগজ আছে বলেই মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়েছে এমন দুটি কাজ যা অন্য কোনো জীবের পক্ষে অসম্ভব। এক, তার হাতের কারিকুরি। দুই, তার মুখের ভাষা। হাতের কারিকুরি করে মানুষ হাতিয়ার তৈরি করেছে আর ভাষার জোরে একজন মানুষ অপর একজন মানুষকে সেই হাতিয়ার তৈরির ও ব্যবহারের কায়দাকানুন শিখিয়ে যেতে পারছে।

এই জোরেই মানুষ জীবজগতে সবার চেয়ে বড়ো।

মানুষের গায়ে ঘন লোম নেই বটে কিন্তু সে অনায়াসে ঘন

লোমের পোশাক বানিয়ে নিতে পারে। মাথা গুঁজবার ঠাঁই পাবার জন্যে সে খরগোশের মতো গর্ত খোঁড়ে না, তার বদলে সুন্দর ও মজবুত ঘরবাড়ি তোলে। থাবা বা দাঁত বা বিষের অভাব সে মিটিয়েছে মারাত্মক সব অস্ত্র তৈরি করে। পাখির মতো ডানা নেই তার কিন্তু উড়োজাহাজে চেপে পাখির চেয়েও উঁচুতে ওঠার ক্ষমতা রাখে। শকুনির মতো চোখ নেই বটে কিন্তু দূরবীন এঁটে চোখের দৃষ্টিকে শকুনির চেয়েও লক্ষগুণ জোরালো করে নিতে পারে।

অর্থাৎ, যে-সব কাজ মানুষের স্বাভাবিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্ভব নয়, সেগুলোই করা যাচ্ছে হাতিয়ারের সাহায্যে।

লক্ষ করবার বিষয় এই যে, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো এই হাতিয়ারগুলোকে সব সময়ে বয়ে বেড়াবার দরকার নেই। খুশিমতো যে-কোনো হাতিয়ার তুলে নেওয়া বা রেখে দেওয়া যেতে পারে।

আবার, একযুগের মানুষ যে-সব হাতিয়ার তৈরি করে, পরের যুগের মানুষ সেগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে যায়। কথাটার মানে এই নয় যে ঠাকুর্দার আমলের হাতিয়ারটিই আস্ত অবস্থায় বাপের আমলে চলে এসেছে। ঠাকুর্দার আমলের বিশেষ হাতিয়ারটি হয়তো অকেজো হয়ে গেছে কিন্তু সেই বিশেষ হাতিয়ারটি কি-ভাবে তৈরি করতে হয় আর কি-ভাবে ব্যবহার করতে হয় সে-সম্পর্কে জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা ভাষার মাধ্যমে ঠাকুর্দার আমল থেকে বাপের আমলে চলে এসেছে। এই উত্তরাধিকারকে ঐতিহ্যও বলা চলে। মানুষের জন্ম এমনি কতকগুলো ঐতিহ্যের মধ্যে। কাজেই বিশেষ যুগের একটি মানুষ তার আগেকার সমস্ত যুগের সমস্ত মানুষের শ্রম ও অভিজ্ঞতার মোট ফলকে ঐতিহ্য হিসেবে আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে যায়। এই ঐতিহ্য নিয়েই সে বড়ো হয় এবং নিজের জীবনকালের মধ্যে এই ঐতিহ্যকে আরো উন্নত করে তুলতে চেষ্টা করে।

কথাটা আরেকটু স্পষ্ট করা যাক। গত কয়েক লক্ষ বছরে মানুষ যা কিছু জেনেছে-বুঝছে-শিখেছে তার সবটাই ঐতিহ্য হিসেবে পেয়েছে আজকের দিনের মানুষ। এখন আর জাহাজ-রেলগাড়ি-এরোপ্লেন

নতুন করে আবিষ্কার করার দরকার নেই। এখন চেষ্টা চলেছে পারমানবিক শক্তিচালিত জাহাজ-রেলগাড়ি-এরোপ্লেন তৈরি করার, রকেটের সাহায্যে গ্রহান্তরে পাড়ি দেওয়ার, ইত্যাদি।

অর্থাৎ মানুষের সব সময়েই চেষ্টা, হাতিয়ারকে কি করে আরো উন্নত করে তোলা যায়। এই চেষ্টা কখনো থেমে যায় নি। মানুষ জন্মায় ও মরে কিন্তু তার হাতিয়ার থেকে যায় আর হাতিয়ারের ক্রমোন্নতি হয়ে চলে। একযুগের মানুষের সঙ্গে অন্যযুগের মানুষের পার্থক্যটা শারীরগত নয়, হাতিয়ারগত। কল্পনা করা যাক, ত্রিশ হাজার বছর আগেকার একজন ক্রো-মাঞঁ মানুষ আধুনিক পোশাক পরে শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু চেহারা দেখে তাকে কি একালের মানুষ থেকে আলাদা করে চেনা যাবে? যাবে না। কিন্তু কিন্তু তফাত চোখে পড়বে হাতিয়ারে। ক্রো-মাঞঁ মানুষের হাতিয়ার একালের মানুষের হাতিয়ার থেকে একেবারেই আলাদা। ক্রো-মাঞঁ মানুষকে চেনা যাবে তার হাতিয়ার দিয়ে।

একযুগের মানুষের সঙ্গে অন্যযুগের মানুষের তফাতটা শরীরের দিক থেকে নয়, হাতিয়ারের দিক থেকে। এমনকি হাতিয়ার কতখানি উন্নত, তা থেকে একটা ধারণা পাওয়া সম্ভব একযুগের মানুষ আরেক যুগের মানুষের চেয়ে কতখানি এগিয়ে। হাতিয়ার বলতে আমরা কী বুঝব? আগে বলেছি, যা কিছু মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে তাই হাতিয়ার। এ বিচারে এক টুকরো পাথরও হাতিয়ার। সত্যি সত্যিই একসময়ে পাথরের টুকরোই ছিল মানুষের একমাত্র হাতিয়ার। আর এই টুকরো পাথরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার বিদ্যেটা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে সময়ও লেগেছিল অনেক। আচমকা একজন মানুষের মগজে রাতারাতি এই বিদ্যেটা গজায় নি। অনেক বছর ধরে অনেক মানুষের অনেক অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এই হাতিয়ারটির আবিষ্কার। এমনি প্রত্যেকটি হাতিয়ারের পিছনেই রয়েছে অনেক মানুষের ভাবনা ও চেষ্টা। যেমন থাকে এক-একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের

পেছনে। আসলে হাতিয়ার তৈরি করতে গিয়ে মানুষকে যতো কিছু জানতে হয়েছে, বুঝতে হয়েছে আর ভাবতে হয়েছে তা থেকেই বিজ্ঞান। হাতিয়ারকে বলা চলে বিজ্ঞানের নিদর্শন। হাতিয়ারের উন্নতি থেকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা করা চলে।

মগজ

হাতিয়ার সম্পর্কে আরো আলোচনা করার আগে মানুষের মস্তিষ্ক বা মগজ সম্পর্কে দু-একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। ব্যাপারটা এই নয় যে মগজ একমাত্র মানুষেরই আছে, অন্য কোনো জীবের নেই। মগজ কারও একচেটিয়া নয়। স্তন্যপায়ী জীব বলতে যাদের বোঝায় তাদের সকলেরই অল্পবিস্তর মগজ আছে। স্তন্যপায়ী নয় এমন অনেক জীবেরও আছে। আবার স্পষ্ট পরিষ্কার মগজ যাদের নেই তারাও একেবারে 'মগজহীন' নয়। মগজের কাজ-কারবার চলে নার্ভের (nerve) মাধ্যমে। এই নার্ভের মাধ্যমেই বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ, আমাদের হাত-পা নাড়া, কথা বলা, শরীরের যা-কিছু অঙ্গচালনা। শরীরের মধ্যে নার্ভ-বিন্যাসের ব্যবস্থাপনাকে এক কথায় বলা হয় নার্ভতন্ত্র (nervous system)।

জীবজগতের দিকে তাকালে দেখা যায়, একেবারে প্রাথমিক ধরনের জীবের শরীরেও এমন একটা কিছু ব্যবস্থা আছে যাকে বলা চলে নার্ভতন্ত্র। একেবারেই প্রাথমিক ধরনের নার্ভতন্ত্র। যেমন, শামুক। শামুক প্রাথমিক ধরনের জীব। কিন্তু পরিবেশের মধ্যে কোনো অদল-বদল ঘটলে এই জীবটিও শরীরের মাংসপিণ্ডকে কুঁচকিয়ে খোলার মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। তবে এইটুকুই এর ক্ষমতা, এর বেশি কিছু নয়। পরিবেশের অদল-বদল যেমনই হোক, এই জীবটি প্রত্যেকবারেই শরীরটাকে খোলা দিয়ে আড়াল করে। অর্থাৎ, শামুকের শরীরে যে নার্ভতন্ত্র আছে তার দৌড় মাত্র এটুকু—শরীরের

মাংসপিণ্ডের এক বিশেষ ধরনের সংকোচন। পরিবেশের অদল-বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই বিশেষ ধরনের শরীর-চালনাকে প্রবণতাও বলা চলে। প্রত্যেকটি শামুকই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বিশেষ এক ধরনের শরীর নিয়ে জন্মায় তেমনি জন্মায় বিশেষ এক ধরনের প্রবণতা নিয়ে।

আবার, জীবজগতে জীবের অবস্থান যতো উঁচুতে তার শরীরের নার্ভতন্ত্র ততো জটিল। তখন আর সব রকমের পরিবেশগত অদল-বদলের জন্যে মাত্র এক রকমের শরীর-চালনা নয়, নানা রকমের শরীর-চালনা। শুধু তাই নয়, পরিবেশের অদল-বদল ঠিক কোন্ ধরনের হয়েছে তার সঠিক হদিশ পাবার বিশেষ ক্ষমতা এসে যায় শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের। এই বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেই আমরা বলি ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা স্বাদ-গন্ধ-স্পর্শ টের পাই, শব্দ শুনি, আলো দেখি। আর যে বিশেষ ধরনের নার্ভের সাহায্যে পরিবেশের এসব অদল-বদলকে আমরা টের পাই তাকে বলা হয় সংজ্ঞাবহ (sensory) নার্ভ। যে বিশেষ ধরনের নার্ভের সাহায্যে আমরা অঙ্গচালনা করি তাকে বলা হয় চেষ্টা (motor) নার্ভ। নার্ভতন্ত্র জটিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা নার্ভের অঙ্গচালনা করার ক্ষমতাও বেড়ে যায়।

তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই : উচ্চতর জীবের নার্ভতন্ত্র একদিকে যেমন বিভিন্ন পরিবেশগত অদল-বদলকে আলাদাভাবে চিনে নিতে পারে, অন্যদিকে তেমনি পরিবেশগত অদল-বদলের সঙ্গে শরীরকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে বিভিন্ন রকমের অঙ্গচালনাও করতে পারে। প্রথম কাজটি করে সংজ্ঞাবহ নার্ভ, দ্বিতীয় কাজটি চেষ্টা নার্ভ। খুব উঁচু দিকের জীবের শরীরের ব্যবস্থাটি এমন যার ফলে সংজ্ঞাবহ নার্ভ ও চেষ্টা নার্ভের মধ্যে গড়ে ওঠে নিবিড় ও সূক্ষ্ম একটি যোগাযোগ। আর তা থেকেই তৈরি হয় এসব জীবের স্বভাব বা চালচলন। অন্য কথায়, পরিবেশের অদল-বদলের সঙ্গে (তা যতো সামান্যই হোক) খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে অঙ্গচালনা।

সংজ্ঞাবহ নার্ভ ও চেষ্টা নার্ভের মধ্যে নিবিড় ও সূক্ষ্ম যোগাযোগ গড়ে তোলার ব্যবস্থাটি যেখানে, তার নাম মগজ। নিচু ধাপের জীবের শরীরে মগজ নেই, তার বদলে আছে সংজ্ঞাবহ নার্ভ ও চেষ্টা নার্ভের সন্ধিস্থল বা গিঁট। উঁচু ধাপের জীবের শরীরে গিঁটের জায়গায় মগজ। যা ছিল গিঁট তাই বড়ো হতে হতে মগজ।

মগজওলা জীবের শরীরে নার্ভতন্ত্রের সমাবেশটি জটিল। সেখানে একদিকে যেমন সংজ্ঞাবহ নার্ভের মাধ্যমে পরিবেশের সামান্যতম অদল-বদল ধরা পড়ে, অন্যদিকে তেমনি চেষ্টা নার্ভের মাধ্যমে নানান ধরনের অঙ্গচালনাও সম্ভব হয়। তার মানে, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার ক্ষমতা মগজওলা জীবের অনেক বেশি। মগজ আছে বলেই তারা চট করে বাইরের জগৎকে ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে পারে আর সঙ্গে সঙ্গে যেমনটি দরকার হাত-পা-মুখ নাড়তে পারে। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায় যে এক-একটা বিশেষ অনুভূতির সঙ্গে এক-একটা বিশেষ অঙ্গচালনা প্রায় আপনা থেকেই ঘটে যায়। যেমন, চোখের ওপরে হঠাৎ জোরালো আলো এসে পড়লে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যাওয়া, গাছের ডাল মাথার ওপরে ভেঙে পড়তে দেখলে সরে দাঁড়ানো, বা এমনি আরো অসংখ্য রকমের অঙ্গচালনা। মনে হতে পারে, সংজ্ঞাবহ নার্ভের কোন বিশেষ খবরের জবাবে চেষ্টা নার্ভে কোন্ বিশেষ খবর পাঠাতে হবে সেজন্যে মগজ যেন আগে থেকেই তৈরি ছিল। তার মানে, এই বিশেষ অনুভূতিগুলোকে মগজ যেন চিনে রাখতে পেরেছিল। মগজওলা জীবের এটি এক বিশেষ ক্ষমতা। তারা মনে রাখতে পারে।

জীবজগতে স্তন্যপায়ীরা যে প্রভুত্ব কায়েম করতে পেরেছে তার মূল কারণটাও এই। তারা মগজওলা জীব। মগজ থাকার দরুন তারা পরিবেশের সঙ্গে অনেক ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে।

বিশেষ করে মানুষের বেলায় এসে দেখা যাচ্ছে, মানুষের শরীরে স্বাভাবিক অস্ত্রসজ্জা বিশেষ কিছু নেই বটে কিন্তু তার আছে প্রকাণ্ড

ও জটিল একটি মগজ যার দ্বারা তার শারীরগত স্বাভাবিক অস্ত্রসজ্জার ঘাটতি পূরণ হতে পারে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মানুষ যে এতবড়ো একটা মগজের অধিকারী হল তা কি করে? মানুষের মতো দেখতে আরো জীব তো আছে—যেমন শিম্পাঞ্জী, ওরাং-ওটাং, গোরিলা—তারা কেন মানুষের মতো প্রকাণ্ড ও জটিল মগজের অধিকারী হতে পারল না?

এ-প্রশ্নের জবাব পেতে হলে কয়েক লক্ষ বছর আগে ফিরে যেতে হবে।

চার পা থেকে দু পা

মানুষের পূর্বপুরুষরা (এদের আমরা বলেছি নর-বানর) তখনো গাছের ডালে জীবন কাটায়। যেমন কাটায় আজকালকার শিম্পাঞ্জীরা। নিতান্ত বাধ্য না হলে শিম্পাঞ্জী কখনো জঙ্গল ছেড়ে বাইরে আসে না। আমরা যে নর-বানরদের কথা বলছি তারাও আসত না। কিন্তু সেই লক্ষ লক্ষ বছর আগেও শিম্পাঞ্জীর সঙ্গে নর-বানরের একটা তফাত চোখে পড়তে পারত। গাছের ডাল থেকে ফল ছিঁড়তে হলে শিম্পাঞ্জী থাবা দিয়ে ডাল আঁকড়ে ধরে আর পা দিয়ে ফল ছিঁড়ে নেয়। গাছের ডালে ছুটোছুটি করতে হলে শিম্পাঞ্জীরা থাবাছুটোকেও পায়ের মতো ব্যবহার করে—অর্থাৎ তাদের শরীরের ভর রাখার জন্যে ছুটো পা-ই যথেষ্ট নয়, ছুটো থাবাও দরকার। কাজেই শিম্পাঞ্জীকে চার-পা-ওলা জীব বললেও ভুল বলা হয় না। কিন্তু আমরা যে নর-বানরদের কথা বলছি তারা ফল ছিঁড়ত পা দিয়ে নয়—থাবা দিয়ে। আবার এই থাবা দিয়েই তারা গাছের ডালে বাসা তৈরি করত। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, মাঝে মাঝে তারা যখন খাদ্যের খোঁজে গাছের ডাল ছেড়ে মাটিতে নেমে আসত তখন তাদের থাবার মুঠোয় ধরা থাকত পাথরের টুকরো বা লাঠি। পাথরের টুকরো দিয়ে তারা মাটি খুঁড়ত,

লাঠি দিয়ে তারা মাটির ভেতর থেকে শেকড় তুলে আনত। অর্থাৎ, পাথরের টুকরো বা লাঠিকে তারা ব্যবহার করত হাতিয়ার হিসেবে। আর হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারে যে থাবা তা আর থাবা কিছুতেই নয়। তাকে হাত-ই বলতে হবে। চার-পা-ওলা জীব আর নয়, ছু' পা ও ছু'হাত-ওলা জীব।

আবার হাত দিয়ে যদি হাতিয়ার ধরতে হয় তাহলে হাঁটা-চলার কাজটা পুরোপুরি ছেড়ে দিতে হয় পায়ের ওপরেই। আর সত্যি সত্যিই কয়েক হাজার বছরের মধ্যে দেখা গেল, নর-বানর পেছনের ছু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটা-চলা করছে।

এবার এই জীবটিকে কী বলব ? চেহারাটা পুরোপুরি বুনো, মানুষ বলে কিছুতেই মনে হবে না ; কিন্তু আশ্চর্য, পাথরের টুকরো আর লাঠিকে হাতিয়ারের মতো ব্যবহার করতে জানে। তখন নিশ্চয়ই বলতে হবে, মানুষ না হোক, জীবটি নিশ্চয়ই মানুষ হতে চলেছে। কারণ এই পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র হাতিয়ারধারী জীব।

তারপর এল হিমযুগ। হিমযুগ আসার সঙ্গে সঙ্গে এতকালের অভ্যস্ত পরিবেশটাই গেল পাল্টে। বড়ো বড়ো গাছপালার আর কোনো চিহ্ন রইল না। পুরু হয়ে তুষার জমল চারদিকে। আর হি-হি করা ঠাণ্ডায় দিন ও রাত্রির বাতাস শিরশিরিয়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে জীবজগতেও এল প্রচণ্ড একটা ওলোট-পালোট। উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্যের পরিবেশে যে-সব জীবজন্তু চলাফেরা করত (যেমন বাঘ, হাতি ইত্যাদি) তারা প্রাণ বাঁচাবার জন্যে এমন সব অঞ্চলে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করল যেখানে উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্যের পরিবেশ পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু একদল জীব থেকে গেল। যে নর-বানরদের কথা আমরা এতক্ষণ বলেছি তাদেরই মধ্যে থেকে কয়েকটা দল। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হল তাদের। গাছপালাহীন খোলা মাঠের ওপর দিয়ে চলাফেরা করতে গিয়ে পুরোপুরি ছু'পায়ের ওপরেই খাড়া হয়ে দাঁড়াল। হি-হি করা ঠাণ্ডায় প্রাণ বাঁচাবার জন্যে

আবিষ্কার করতে হল নতুন নতুন হাতিয়ার। অর্থাৎ, নর-বানরের বানরত্ব ক্রমশ লোপ পেতে লাগল।

মগজের ঠাঁই

যে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম তার জবাব এখনো পাওয়া যায় নি। জীবজগতে একমাত্র মানুষের মাথার খুলির মধ্যে এত প্রকাণ্ড আর এত জটিল একটা মগজ তৈরি হল কি করে?

নর-বানর যতোদিন গাছের ডালে জীবন কাটাচ্ছিল ততোদিন তাকে থাবাদুটো দিয়ে শরীরের কিছুটা ভার বইতে হত বলে অধিকাংশ কাজই করতে হত দাঁত ও চোয়ালের সাহায্যে। ফলে তার চোয়ালের হাড় ছিল বড়ো আর ভারী। সমতল জমিতে নেমে আসার পরে হাত দিয়েই সমস্ত কাজ করত। ফলে দাঁত ও চোয়াল রেহাই পেয়ে গেল। চোয়ালের হাড় বড়ো আর ভারী থাকার কোনো দরকার রইল না। এবারে কী হতে পারে? আমরা জেনেছি যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাধারণ নিয়মে বাড়তি জিনিস বাতিল হয়ে যায়। এক্ষেত্রেও তাই হওয়াটাই স্বাভাবিক। হাতের কাজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট হয়ে যাওয়া উচিত নর-বানরের দাঁত ও চোয়ালের হাড়। সত্যি সত্যিই তাই হয়েছিল। আর চোয়ালের হাড় যতোই ছোট হয়েছিল ততোই জায়গা বেড়েছিল মগজের জন্যে। এবং মগজটিও ক্রমশ প্রকাণ্ড হয়ে উঠছিল।

কথাটা এভাবেও বলা চলে: মানুষের মগজটি যে প্রকাণ্ড হতে পেরেছে তার কৃতিত্ব মানুষের হাতের। একমাত্র মানুষের হাতই সূক্ষ্ম ও নিপুণ কাজের উপযুক্ত—একমাত্র মানুষের হাতই হাতিয়ার তৈরি করেছে। আবার, হাতিয়ারের পিছনে সবটাই হাতের কেরামতি নয়, মগজের বুদ্ধিও। কথাটা ভালোভাবে বোঝা দরকার। নর-বানরদের মগজে যথেষ্ট বুদ্ধি ছিল বলেই তারা গাছের ডাল থেকে নেমে আসার

পরেও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পেরেছিল। কি ভাবে? না, হাতের সাহায্যে হাতিয়ার বানিয়ে। আবার হাতিয়ার বানাতে পেরেছিল বলেই দাঁত আর চোয়ালের ব্যবহার অনেক হাল্‌কা হয়ে গিয়েছিল। ফলে চোয়ালের হাড় ছোট হয়ে হয়ে জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল মগজের জন্যে। আর মগজ যতো বড়ো হয়েছে ততোই সেই আদিম নর-বানর হয়ে উঠেছে আধুনিক নর।
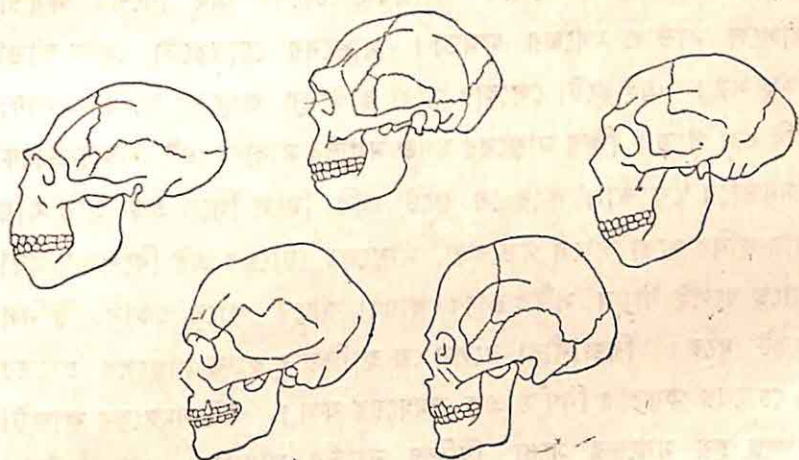
(ওপরের সারি—বাঁ দিক থেকে) পিথিকানথ্রপাস, সিনানথ্রপাস ও নেয়ানডার্থাল (নিচের সারি—বাঁ দিক থেকে) ক্রোমাঞঁ ও আধুনিক মানুষ

নানা সময়ে নানা জায়গা থেকে মানুষের পূর্বপুরুষের যে-সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে নর-বানর থেকে মানুষ হয়ে ওঠার পুরো ছবিটা এঁকে নেওয়া চলে।

চোখ

কথাটা আবার বলছি, শরীরের গড়নের দিক থেকে মানুষ যতোই দুর্বল হোক, তার শরীরে এমন একটা মগজ আর এমন দুটো হাত

আছে যা অসাধ্যসাধন করতে পারে। তবে শুধু মগজ আর হাত নয়, মানুষের শরীরের আরো দুটি বিশেষ ক্ষমতা আছে যা এ-ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে। এক হচ্ছে তার চোখের দৃষ্টি, আরেক হচ্ছে তার মুখের ভাষা।

আগে বলেছি, মানুষ দু' চোখ দিয়ে একই ছবি দেখে। দু' চোখ দিয়ে একই ছবি দেখার ফলে ছবির মধ্যে আসে গভীরতা—স্টিরিও-স্কোপে দেখা ছবির মতো। মানষের চোখের এই বিশেষ ক্ষমতা আসলে নার্ভ ও মগজের ক্ষমতা। মানুষের চোখদুটো লেন্স ছাড়া কিছু নয়। এই দুটো লেন্সের মধ্যে বাইরের জগতের দুটো আলাদা ছবি ধরা পড়ে। কিন্তু মানুষের মগজ নার্ভের মাধ্যমে এই লেন্সদুটোকে এমনভাবে 'ফোকাস' করে যে দুটো ছবি মিলে গিয়ে এক হয়ে যায় আর ছবির মধ্যে আসে গভীরতা, মানুষের চোখের এই বিশেষ ক্ষমতা আছে বলেই মানুষ সঠিকভাবে ধারণা করতে পারে, কোন জিনিস কতটা দূরে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে হাতিয়ার হচ্ছে মানুষের হাতের ও চোখের ক্ষমতার নিখুঁত এক সমন্বয়ের ফল। এই সমন্বয়ের কাজটা সম্পন্ন হয় মগজের মধ্যে বিভিন্ন নার্ভের মাধ্যমে। ব্যাপারটাতে আমরা এত অভ্যস্ত যে শরীরের মধ্যে নার্ভ ও মগজের এতসব কাণ্ড-কারখানার দিকে আমাদের কোনো খেয়ালই থাকে না।

ভাষা

মানুষকে বলা হয় কথা-কওয়া যন্ত্র, কারণ জীবজগতে একমাত্র মানুষই কথা কইতে পারে। ভাষাই মানুষের সার। এ-ব্যাপারেও আসল কৃতিত্ব মানুষের মগজের। যাকে বলা হয় স্বরযন্ত্র তা যেমন আছে মানুষের শরীরে তেমনি বনমানুষের শরীরে। বনমানুষ বড়ো জোর কিচির-মিচির করতে পারে। কিন্তু মানুষের শরীরের স্বরযন্ত্র থেকে এত রকমের বিভিন্ন শব্দ এমন ছন্দ ও পারম্পর্য বজায়

রেখে বেরিয়ে আসে যার ফলে ভাষা তৈরি হয়। ভাষার জন্ম নিয়ে পরে আমরা আলোচনা করব, তখন দেখব মানুষের হাতের সঙ্গেও ভাষার বড়ো রকমের সম্পর্ক।

মগজের কেরামতি

তাহলে বোঝা গেল, মানুষের মাথার খুলির মধ্যে মগজ নামে যে পদার্থটি আছে তার কেরামতি কম নয়। একসঙ্গে হাজারটা কাজ তাকে করতে হয়, হাজারটা ব্যাপারে সজাগ থাকতে হয়। একজন মানুষের কথা ধরা যাক। সে একই সঙ্গে দেখে, কথা বলে, হাত-পা নাড়ে। একটা কাজের জন্যে আরেকটা কাজের কোনো অসুবিধে হয় না, যদিও প্রত্যেকটি আলাদা কাজের জন্যে মগজের মধ্যে আলাদা আলাদা কেন্দ্র নির্দিষ্ট। তবুও যে মানুষটি এতগুলো কাজ এমন চমৎকারভাবে একসঙ্গে করতে পারছে, তার কারণ তার মগজের আলাদা আলাদা কেন্দ্রের মধ্যে আছে একটা সমন্বয়। ব্যাপারটাতে সে নিজে এত অভ্যস্ত যে তার মনে হয়, কাজগুলো আপনা থেকেই হয়ে যাচ্ছে, এজন্যে তাকে বিশেষ কোনো চেষ্টা করতে হচ্ছে না।

আসলে তা নয়। এই সমন্বয়ের ক্ষমতাটা তাকে বেশ কয়েক বছর চেষ্টা করে আয়ত্ত করতে হয়েছে। এই ক্ষমতা নিয়ে সে জন্মায় নি। জন্মের পরে একটি শিশু সব দিক থেকেই অসহায়। কোনো কাজই সে গুছিয়ে করতে পারে না, তার মুখে ভাষা নেই। এমনকি তার মাথার খুলির মধ্যে মগজটা পর্যন্ত অপরিণত। এজন্যেই দেখা যায়, শিশুর মাথার খুলির হাড় খুবই নরম, আলগা আলগাভাবে লাগানো—এমনটি থাকে বলেই শিশুর মগজ বড়ো হতে পারে।

যতোদিনে শিশু একটু একটু করে শেখে কি-ভাবে দেখা বা শোনা বা হাত-পা নাড়ার মধ্যে সমন্বয় করতে হয় আর কি-ভাবে গলার স্বরযন্ত্র থেকে আলাদা আলাদা শব্দ বার করতে হয়, ততোদিনে শিশুর

মগজটিও পরিণত হয়ে ওঠে। গোড়ার দিকে শিশু শেখে অপরকে দেখে, অপরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। এই পর্যায়ে তার সঙ্গে অন্যান্য জীবের বাচ্চার কোনো তফাত নেই। একটা মুরগির ছানাও চলাফেরা করতে শেখে মা-কে দেখে দেখে।

কিন্তু শিশু যেই ভাষা আয়ত্ত করে অমনি শিক্ষার ব্যাপারে তার একটা মস্ত সুবিধে হয়ে যায়। তখন আর তাকে শেখাবার জন্যে সবসময়ে দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে হয় না, মুখের কথাতেই বুঝিয়ে বলা চলে। যেমন, মুরগির ছানা সাপকে ভয় করতে শেখে সাপ সম্পর্কে সত্যি-কারের অভিজ্ঞতা হবার পরে। কিন্তু মানবশিশুর বেলায় সত্যিকারের অভিজ্ঞতা হবার দরকার নেই। মুখের কথাতেই তাকে সাপকে ভয় পেতে শেখানো চলে। ভাষা যে মানুষের কত বড়ো একটা জোর তা এ থেকে বোঝা যায়।

কালজয়ী মানুষ

তাহলে মানুষের সত্যিকারের জোর হচ্ছে তিনটি। মগজ, হাত আর ভাষা। তিনটি বললাম বটে কিন্তু এই তিনটিকে কোনো ক্রমেই আলাদা আলাদাভাবে দেখা চলে না। মগজ না থাকলে হাত হত না, আবার হাত না থাকলে মগজ বাড়তে পেত না। ঠিক এমনি সম্পর্ক ভাষার সঙ্গে মগজের ও হাতের। কোনোটিকে বাদ দিয়ে কোনোটির চলার উপায় নেই।

আর এই মগজ, হাত আর ভাষার জোরেই মানুষ হাতিয়ার তৈরি করতে পেরেছে এবং একযুগের মানুষ পরের যুগের মানুষের কাছে সেই হাতিয়ারের কথা জানিয়ে যেতে পেরেছে। জানিয়ে যাবার ক্ষমতা আছে বলেই মানুষ কালজয়ী। যে-কোনো দেশে, যে-কোনো কালে যদি একটি মানুষ মনে করে যে পরবর্তীকালের মানুষদের কাছে তার জানিয়ে যাবার মতো কথা কিছু আছে তবে তা সে

জানিয়ে যায়। পরবর্তীকালের মানুষকে সেই কথাটি নতুন করে ভাবতে হয় না, সে ভাবতে বসে সেই কথাটির পরের কথাটি। তার মানে, মানুষকে বারে বারে সেই গোড়া থেকে সমস্ত কিছু জানতে ও বুঝতে হয় না ; একযুগের জানা ও বোঝার যেখানে শেষ, পরের যুগের সেখানে শুরু। এই কথাটিকেই আরেকটু ঘুরিয়ে বলা চলে। আজকের দিনের মানুষের কাছে আগেকার কয়েক লক্ষ বছরের কোনো একটি দিনও হারিয়ে যায় নি, কোনো একটি দিনও নিরর্থক নয়।

তার মানে, আজকের দিনের মানুষের ঠিকানা জানতে হলে শুধু আজকের দিনের মানুষের ভাবনাচিন্তা ও কাজকর্মকে জানাই যথেষ্ট নয়। আগেকার দিনের মানুষের কথাও খুঁটিয়ে জানা দরকার।

কি-ভাবে জানব? মানুষের বয়স কম করে অন্তত পাঁচ লক্ষ বছর। আর মানুষ লিখতে শিখেছে মাত্র হাজার পাঁচেক বছর আগে। অর্থাৎ, প্রায় পুরো ঠিকানাটাই আমাদের উদ্ধার করতে হবে অন্য কোনো হদিশ থেকে, লেখা পুঁথির সাহায্য পাবার কোনো উপায়-ই নেই।

এই হদিশটি হচ্ছে হাতিয়ার। ভূ-বিজ্ঞানীরা যেমন শিলালিপি থেকে ভূত্বকের গড়ন ও বিবর্তন জানতে পারেন, জীববিজ্ঞানীরা যেমন ফসিল থেকে জীবজগতের ইতিহাস উদ্ধার করেছেন, তেমনি মানুষের ঠিকানা লেখা রয়েছে মানুষের তৈরি হাতিয়ারের মধ্যে! কোনো এক বিশেষ যুগের মানুষ কী কী যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র বানিয়েছে তা থেকে সেই যুগের মানুষের চিন্তা, ধারণা, সমাজের গড়ন, জীবনযাপনের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কিছু জেনে নেওয়া যায়। একজন নৃ-বিজ্ঞানী যেমন মানুষের শরীরের একটা হাড় দেখে পুরো মানুষের চেহারা কল্পনা করতে পারেন, এও অনেকটা তাই। মানুষের শরীরের গড়নের মতো মানুষের সমাজের গড়নও কতকগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। এই নিয়মগুলোকে যদি ঠিকমতো জেনে নেওয়া যায় তাহলে একটি বিশেষ যুগের বিশেষ একটি নিদর্শন থেকে সেই যুগ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা নিশ্চয়ই অসম্ভব কাজ নয়।

মনে করা যাক, কোনো এক বিশেষ যুগের মানুষের তৈরি হাত-কুড়ুল পাওয়া গেছে। এই সামান্য একটা হাতকুড়ুল থেকেও বিজ্ঞানীরা সেই বিশেষ যুগ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারেন। হাতকুড়ুলটি যদি পাথরের হয় তাহলে বুঝতে হবে মানুষ তখনো ধাতুর ব্যবহার শেখে নি। যদি ব্রোঞ্জের হয় তাহলে বুঝতে হবে মানুষ তখনো লোহার ব্যবহার শেখে নি। তারপর হাতকুড়ুলটির গড়ন ও পারিপাট্য দেখে বুঝতে পারা যাবে সে-যুগের মানুষ হাতের কাজে কতখানি দক্ষতা অর্জন করেছিল। এমনকি সব মিলিয়ে সে-যুগের বিজ্ঞান সম্পর্কেও খানিকটা ধারণা করা যাবে।

বিজ্ঞানীরা এভাবেই পুরনো যুগের নানা নিদর্শন থেকে মানুষের পুরো ঠিকানাটি খুঁজে বার করেছেন। দেখা গেছে, এই ঠিকানায় পৌঁছতে হলে বড়ো বড়ো কয়েকটি যুগ পার হয়ে যেতে হয়। আমরাও আসল ঠিকানার উদ্দেশে রওনা হবার আগে এই যুগ-বিভাগ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করে নেব।

যুগ ও যুগান্তর

আমাদের এই পৃথিবীর বয়স চারশো কোটি বছর। চারশো কোটি সংখ্যাটি লিখতে খুব বেশি জায়গা লাগে না, উচ্চারণেও কষ্ট নেই, কিন্তু ধারণায় আনা শক্ত। চা র শো কো টি! আমাদের লেখা ইতিহাস বড়ো জোর পাঁচ হাজার বছরের। মাত্র এই পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসও কী বিপুল! মোহেন-জো-দড়োর মানুষের কথা যখন ভাবি, মনে হয় সেই কোন প্রাচীনকালের মানুষ না জানি! যেখানে মাত্র পাঁচটি হাজার বছরকেই পুরোপুরি ধারণায় আনা যায় না, সেখানে চারশো কোটি বছরের হিসেব নিতে যাওয়াটা অসম্ভব বলেই মনে হতে পারে।

সুখের বিষয়, মানুষের ঠিকানা জানতে হলে এই চারশো কোটি বছরের পুরো হিসেব নেবার দরকার নেই, কেননা পৃথিবীতে চোখের দেখায় চিনতে পারার মতো জীব এসেছে মাত্র পঞ্চাশ কোটি বছর আগে। মানুষ আরো অনেক অনেক পরে।

নতুন হাতিয়ার : নতুন যুগ

গত একশো বছরে মানুষের পূর্বপুরুষের যে-সব নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার মোটামুটি পরিচয় আমরা নিয়েছি। তবে মনে রাখা দরকার যে এগুলো নিতান্তই নিদর্শন, মানুষের কুলজি নয়। রাস্তার

ধারের মাইলস্টোন দেখে যেমন রাস্তার অবস্থা সম্পর্কে কোনো ধারণা হয় না, শুধু জানা যায় রাস্তাটি কোথা থেকে শুরু হয়ে কতটা এসেছে—এই নিদর্শনগুলোও তাই। এগুলো দেখে শুধু জানা যায়, এপ্ থেকে মানুষের বিবর্তন কোথা থেকে শুরু হয়েছিল আর কতখানি এগিয়েছে। কিন্তু এগুলো থেকে মানুষের সত্যিকারের অবস্থা জানা যায় না। সে কি-ভাবে থাকত, কি-ভাবে খাবার যোগাড় করত, কি-ভাবে বিয়ে করত, কি-ভাবে সংসার করত, কি-ভাবে অবসর কাটাত—এসব প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের অন্যদিকে তাকাতে হয়। আগে বলেছি, কোন মানুষ কি-ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করেছে তা থেকে সেই মানুষটির অবস্থা সম্পর্কে অনেক খবর জানা যায়। কোনো এক বিশেষ সময়ে মানুষের ব্যবহার করা হাতিয়ার দেখে বলা চলে, মানুষ তখন কোন সামাজিক ব্যবস্থায় বাস করত। আগে আরো বলেছি, মানুষের সমাজের অদল-বদলের মধ্যে স্পষ্ট একটা নিয়ম আছে। সেই নিয়মটা যদি জেনে নেওয়া যায় আর বিভিন্ন সময়ের হাতিয়ারের নিদর্শনগুলো যদি চোখের সামনে থাকে তাহলে মানুষের ঠিকানা জেনে নেওয়াটা খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষ আজ পর্যন্ত যতো রকমের হাতিয়ার ব্যবহার করেছে সেগুলো যদি উৎকর্ষের মাপকাঠিতে কতকগুলো ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে সমাজের অদল-বদলের চেহারাটাও আর একটানা থাকে না—সেখানেও কতকগুলো ভাগ এসে পড়ে। বিজ্ঞানীরা এভাবেই মানুষের সমাজের অদল-বদলকে কতকগুলো ভাগে ভাগ করেছেন। এক-একটি ভাগ হচ্ছে এক-একটি যুগ। প্রত্যেকটি যুগেই মানুষের হাতিয়ারে বড়ো রকমের উৎকর্ষ এসেছে।

প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর ধরে এই পৃথিবীতে মানুষের বসবাস। এই পাঁচ লক্ষ বছরের মধ্যে শেষদিকের মাত্র পাঁচ হাজার বছর বাদ দিলে বাদবাকি সমস্ত সময়ে মানুষ ব্যবহার করেছে পাথরের হাতিয়ার। কাজেই এই গোটা সময়টাকে বলা চলে প্রস্তর-যুগ।

শেষদিকের পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে প্রথম দু'হাজার বছর মানুষ ব্যবহার করেছে ব্রোঞ্জের হাতিয়ার। এই দু'হাজার বছরকে বলা হয় ব্রোঞ্জ-যুগ।

আর শেষ তিন হাজার বছরে মানুষ ব্যবহার করছে লোহার হাতিয়ার। এটির নাম লৌহ-যুগ।

তার মানে, মানুষের ইতিহাসের শতকরা নিরানব্বুই ভাগ সময়ে হাতিয়ার বলতে চল ছিল পাথরের হাতিয়ারের। অনুমান করা চলে, এত দীর্ঘ সময় ধরে মানুষ নিশ্চয়ই একই ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করে নি। পাথরের হাতিয়ারের মধ্যেও নিশ্চয়ই বেশি বেশি মাত্রায় উৎকর্ষ এসেছিল। এই অনুমান যে সত্যি তার প্রমাণ হাতেনাতে পাওয়া গিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে যে-সব পাথরের হাতিয়ার সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলে বোঝা যায়, এক প্রস্তর-যুগের হাতিয়ারেই মাঝে মাঝে আচমকা এত বেশি মাত্রায় উৎকর্ষ এসেছে যাকে তুলনা করা চলে বিপ্লবের সঙ্গে। আর প্রত্যেকটি বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রায় বড়ো রকমের অদল-বদল ঘটেছে।

জাক্ বুশে দ্য প্যার্ত্ (১৭৮৮-১৮৬৮)

পাথরের হাতিয়ারের রকমফের সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে একজন মানুষের কথা বলতে চাই। তাঁর নাম জাক্ বুশে দ্য প্যার্ত্। নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে, ফরাসী দেশের মানুষ। ছেলেবেলা কেটেছে সোম নদীর ধারে আবেভিই নামে একটি ছোট মফস্বল শহরে। বড়ো হয়ে এই শহরেই কাস্টম্স অফিসারের চাকরি করেছিলেন। তাঁর চেহারা ছিল যেমন সুন্দর, তেমনি সুন্দর ছিল তাঁর ব্যবহার ও চালচলন। কোনো কাজ হাতে নিলে কাজটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত লেগে থাকতে পারতেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর

মধ্যে গোঁয়ার্তুমি ছিল না। মানুষটি ছিলেন একটু অদ্ভুত ধরনের। ওদিকে বাতের ব্যথায় ভুগতেন কিন্তু ছিয়াত্তর বছর বয়স পর্যন্ত সোম নদীতে সাঁতার-কাটা একদিনের জন্যেও বাদ দেন নি। নিজে সরকারী চাকরি করতেন বটে কিন্তু সরকারী চাকুরিয়াদের নিয়ে তাঁর ঠাট্টাতামাশা শুনে মনে হতে পারত যে এই লোকগুলো তাঁর দু' চোখের বিষ। নিজে ছিলেন কাস্টম্‌স অফিসার কিন্তু অবাধ বাণিজ্যকে সমর্থন করে পুস্তিকা লিখেছিলেন। অবসর সময়ে এক-দিকে যেমন প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতেন অন্যদিকে ব্যঙ্গকবিতা রচনা করতেন।

এই মানুষটিকে বলা হয় পুরাতত্ত্বের জনক।

তাঁর বাবাও ছিলেন এমনি একটু পাগলাটে ধরনের লোক। তিনিও ছিলেন কাস্টম্‌স অফিসার। কিন্তু চাকরি করার চেয়েও তাঁর বেশি ঝোঁক ছিল কিউরিও বা পুরনো যুগের জিনিস সংগ্রহ করার দিকে। নিজের বাড়িটিকে তিনি একটি ছোটখাটো জাদুঘর বানিয়ে তুলেছিলেন। এই মানুষটির চেষ্টায় ১৭৯৭ সালে আবেভিই শহরে 'সোসিয়েতে দেমুলাসিওঁ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সময়টা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার। ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ সারা দেশের ওপর দিয়ে একটা বন্যার মতো বয়ে গেছে। সেই বন্যায় ভেসে গিয়েছে যতো কিছু আবর্জনা ও জঞ্জাল, নতুন এক সম্ভাবনার পলি পড়েছে দেশের জমিতে। এই পরিবেশেই সোসিয়েতে দেমুলাসিওঁর জন্ম। বিজ্ঞান ও শিল্পের চর্চা করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য। আর এই আবহাওয়াতেই জাক্ বুশে দ্য প্যার্ত্‌ বড়ো হয়েছিলেন। ষোল বছর বয়সে তিনি আবেভিই ছেড়ে ইতালির দিকে রওনা হলেন, তারপর কুড়িটা বছর বাইরে বাইরে কাটিয়ে আবেভিই-এ আবার ফিরে এলেন ছত্রিশ বছর বয়সে। ফিরে এসে বাবার জায়গা নিতে হল তাঁকে—একদিকে কাস্টম্‌স অফিসার, অন্যদিকে সোসিয়েতে দেমুলাসিওঁর প্রেসিডেন্ট। জীবনটা হয়তো তাঁর মামুলিভাবেই কেটে যেত। ঊনপঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত বোঝা যায় নি যে পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে

তাঁর বিশেষ কোনো আগ্রহ আছে। তবে বাবার মতোই ছেলেরও কিউরিও সংগ্রহ করার বাতিক ছিল। গোটা বাড়িটায় ঠাসা ছিল নানাধরনের অদ্ভুত সব জিনিস, কোথাও পা ফেলার জায়গা ছিল না। ১৯৪০ সালে জার্মান বোমায় এই বাড়িটা ধ্বংস হয়।

জাক্ বুশে দ্য প্যার্ত্-এর জীবনের একটি বড়ো ঘটনা কাসিমির পিকার নামে একজন তরুণ ডাক্তারের সঙ্গে বন্ধুত্ব। পারী থেকে পাস করার পরে ১৮৩০ সালে চব্বিশ বছর বয়সে এই ডাক্তারটি আবেভিই-এ এসেছিলেন পসার জমাবার জন্যে। কিন্তু দেখা গেল, পসার জমানোর চেয়েও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁজে বার করার দিকে তাঁর আগ্রহ বেশি। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বার করলেন কতকগুলো ছুঁচলো মুখওলা পাথরের টুকরো। এবং ঘোষণা করলেন যে এই পাথরের টুকরোগুলো হচ্ছে মানুষের তৈরি হাতিয়ার। এ-ধরনের পাথর পিকারের নতুন আবিষ্কার নয়, এর আগেও মানুষের হাতে এসেছে। কিন্তু তখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে এগুলো হচ্ছে উল্কা-পাথর, পৃথিবীর বাইরে থেকে এগুলো ছিটকে পড়েছে, আর পাথরের মুখগুলো ছুঁচলো হয়েছে আগুন লেগে। এ অবস্থায় পাথরগুলোকে হাতিয়ার বলে চিনতে পারা পিকারের পক্ষে মস্ত একটা কৃতিত্ব।

মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে পিকারের মৃত্যু হয়। তার মানে আবেভিই-এ তাঁর জীবন মাত্র এগারো বছরের। এই অল্প সময়ের গবেষণাতেই তিনি পাথরের হাতিয়ার সম্পর্কে একটা মূল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত এই :

পাথরের হাতিয়ার দু'ধরনের। এক ধরনের হাতিয়ার তৈরি করা হয়েছে পাথরের খণ্ডকে সুবিধেমতো আকারে ভেঙেচুরে—কিন্তু তাতে মাজাঘষার কোনো চিহ্ন নেই। আরেক ধরনের হাতিয়ার তৈরি করা হয়েছে পাথরের খণ্ডকে ঘষে ঘষে ধারালো করে নিয়ে। আর এই দু'ধরনের হাতিয়ার গড়ে তোলার জন্যে দু'ধরনের শিল্প। দু'ধরনের কালচার। অর্থাৎ, পাথরের যুগটা একটানা একটা যুগ নয়, দুটো

আলাদা যুগ। কথাটা আজকের দিনের স্কুলের ছেলেরাও জানে। কিন্তু সে-যুগে একথা বলতে হলে কী গভীর গবেষণা ও বিশ্লেষণ দরকার—তা শুধু কল্পনা করা চলে।

হাতিয়ারের যুগ সম্পর্কে আরও একটা কথা পিকার বলেছিলেন যা সে-সময়ে সহজে কেউ বিশ্বাস করতে চায় নি। মাটির যে বিশেষ স্তর থেকে পিকার পাথরের হাতিয়ার পেয়েছিলেন সেই একই স্তর থেকে পেয়েছিলেন হাতি, গণ্ডার ও হিপোপটেমাসের হাড়। পিকার বললেন যে প্রস্তর-যুগের কোনো এক সময়ে ইউরোপের মাটিতে হাতি, গণ্ডার ও হিপোপটেমাসের চলাফেরা ছিল। আর এই তিন জাতের প্রাণী একমাত্র উষ্ণ আবহাওয়াতেই বেঁচে থাকতে পারে—কাজেই সে-সময়ে ইউরোপের আবহাওয়াও ছিল উষ্ণ।

অবশ্য এসব কথা পিকার খুব বেশি লোকের সামনে বলতে পেরেছিলেন তা নয়। সোসিয়েতে দেমুলাসিওঁর জনকয়েক সভ্য ছিল তাঁর শ্রোতা। যা-কিছু আলাপ-আলোচনা তাও তাঁদের মধ্যেই। আর এই শ্রোতাদের মধ্যেই একজন ছিলেন জাক্ বুশে দ্য প্যার্ত্। তাঁর বয়স পঞ্চাশে পৌঁছতে আর মাত্র একবছর বাকি। কিন্তু তখনো পর্যন্ত বোঝা যায় নি তাঁর বিশেষ ঝোঁকটা কোন দিকে। তিনি অনায়াসেই নাট্যকার বা গীতিকার হিসেবে নাম করতে পারতেন। রাজনীতির দিকে গেলে বিপ্লবীরা তাঁকে তাঁর সমাজতন্ত্রী মতবাদের জন্যে মাথায় তুলে রাখত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, নাট্যকার বা অন্য কিছু না হয়ে এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে মানুষের প্রথম আসার সময়ে যে নাটকটি জমে উঠেছিল সেই নাটকটি পড়ে দেখার জন্যে তিনি উঠেপ:ড় লেগেছেন।

অবশ্য তার আগে একটি ঘটনা ঘটে গেছে। ১৮৩৫ কি ১৮৩৬ সালে একদিন একটা খালের ধারে ড্রেজার দিয়ে মাটি কাটা হচ্ছিল, তিনি তদারক করছিলেন। হঠাৎ মাটির সঙ্গে বেরিয়ে এল কতক-গুলো ভাঙা হাড়, কয়েকটি ঘষা পাথর ও ধার-দেওয়া পাথরের হাতকুড়ুল। একটি হাতকুড়ুলে হরিণের শিঙের হাতল লাগানো।

জিনিসগুলো দেখে তিনি নিজে ভয়ানক কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। তারপর যখন তাঁর বন্ধু কাসিমির পিকার ব্যাখ্যা করে বললেন যে পাথরের টুকরোগুলো হচ্ছে মানুষের তৈরি হাতিয়ার—তখন থেকেই একদিকে যেমন পিকারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়ে উঠল অন্যদিকে তেমনি পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁজে বার করার দিকে ভয়ানক একটা ঝোঁক এসে গেল। দুই বন্ধু মিলে পরিকল্পনা করলেন যে আবেভিই-এ তাঁরা মস্ত একটা জাদুঘর গড়ে তুলবেন আর আশেপাশের সমস্ত অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান চালাবেন।

এইভাবে জাক্ বুশে দ্য প্যার্ত্-এর পুরাতাত্ত্বিক গবেষণা শুরু। আগেই বলেছি, তাঁর চরিত্রের গড়নটাই ছিল এমনি যে কোনো কাজে লাগলে তার শেষ না দেখে থামতে জানতেন না। কাসিমির পিকারের সঙ্গে তিনি একযোগে নানা জায়গায় মাটি খোঁড়ার কাজ শুরু করলেন। পিকারকে হয়তো রোগী দেখতে অন্যত্র চলে যেতে হত, তিনি একাই কাজের তদারক করতেন। ১৮৪১ সালে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে পিকারের মৃত্যু হয়। জাক্ বুশে দ্য প্যার্ত্ তাতে দমলেন না, আরো বেশি উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে লাগলেন। উনপঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি তাঁর সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক জীবন শুরু করেছিলেন আর আশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়—এই একত্রিশ বছর ধরে লড়াই করে তিনি একা যেভাবে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করেছেন তা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। একত্রিশ বছর ধরে লড়াই করে তিনি নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

জাক্ বুশে দ্য প্যার্ত্-এর কৃতিত্বকে পুরোপুরি বুঝতে হলে জানা দরকার মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে সে-সময়ের শিক্ষিত মহলের ধারণা কী ছিল। মনে রাখা দরকার যে ডারউইনের 'অরিজিন অব স্পিসিস' বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৮৫৯ সালে এবং ডারউইনের বিবর্তনবাদ পুরোপুরি স্বীকৃতি পেয়েছে তারও অনেক বছর পরে। ততোদিন পর্যন্ত মানুষ ও জীবজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে ধর্মপুস্তকের ব্যাখ্যাকেই সকলে মেনে নিয়েছিল। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে মোটামুটি ধরে

নেওয়া হত যে একটি মহাপ্লাবন (Flood) থেকেই এই জীবজগতের শুরু। একমাত্র মানুষই মহাপ্লাবনের আগেও ছিল, পরেও থেকেছে —এমনি মানুষ হিসেবেই। এই মতবাদের বিরোধিতা কেউ করত না। আলোচনা যেটুকু হত তা হচ্ছে মানুষের জন্মের সঠিক তারিখটি নিয়ে। একজন আর্চবিশপ ঘোষণা করলেন যে মানুষের জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে ২৩শে মার্চ তারিখে। তারপর থেকে সমানে আলোচনা চলতে লাগল, মানুষের জন্মের তারিখ হিসেবে ঠিক এই দিনটিই গ্রাহ্য কিনা।

এ অবস্থায় যদি বলা হয় যে একসময়ে মানুষ পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করেছে তাহলে সেটা শিউরে ওঠার মতো কথা। সকলে ধরেই নিয়েছিল যে পৃথিবীর এই স্বর্গরাজ্যে ভগবানের পুত্র মানুষের জীবন ছিল খুবই স্বচ্ছন্দ। মানুষের জীবনে যা-কিছু দরকার হতে পারে সমস্তই তাকে প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয়েছিল। কাজেই মানুষের এমন দীনহীন অবস্থা নিশ্চয়ই কোনোকালে ছিল না যখন তাকে পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করতে হয়েছিল।

পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে ধারণাটা ছিল এই রকম : পৃথিবীর ইতিহাসে এক-একটি যুগ এসেছে, আবার এক-একটি মহাপ্লাবনে সে-যুগের সমস্ত চিহ্ন মুছে গেছে। এইভাবে যুগের পর যুগ, মহা-প্লাবনের পরে মহাপ্লাবন। বাইবেলে যে মহাপ্লাবনের কথা বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ মহাপ্লাবন—যদিও আদম বা ইভ বা নোয়া এই শেষ মহাপ্লাবনের আগের যুগেও বেঁচে ছিল। কিন্তু সে-যুগের কোনো রকম নিদর্শন কোথাও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এ-বিশ্বাস কারও ছিল না।

কাজেই জাক্ বুশে দ্য প্যার্ত্ যখন বললেন যে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যে-সমস্ত পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করেছিল তা মাটি খুঁড়ে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে—তখন এই সামান্য উক্তি সে যুগের সমস্ত বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড একটা ঘা দিয়েছিল।

১৮৪৩ সালে ২৩শে জুলাই থেকে ২৬শে আগস্টের মধ্যে

হাসপাতাল এলাকায় মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে জাক্ বুশে দ্য প্যার্ত্ খুঁজে পেলেন একটুকরো বিশেষ আকারের পাথর, তিনটি পাথরের হাতকুড়ুল আর একটি হাতির দাঁত। জাক্ বুশে দ্য প্যার্ত্-এর মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে তিনি এমন এক যুগের নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন যখন মানুষ আর হাতি একই সঙ্গে এই অঞ্চলে বাস করত আর পাথর থেকে পরত খসিয়ে নিয়ে হাতকুড়ুল তৈরি করত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পারীর জাদুঘরে খবর পাঠালেন কিন্তু সেখানকার কর্তাদের কাছ থেকে কোনো রকম সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

কিন্তু এটুকুতেই হাল ছেড়ে দেবার লোক তিনি নন। তাঁর আবিষ্কারের ভিত্তিতে ১৮৪৬ সালে তিনি একটি নিবন্ধ তৈরি করলেন এবং একটি চিঠি সমেত এই নিবন্ধটি পাঠিয়ে দিলেন অ্যাস্‌তিতু দ্য ফ্রাঁস-এ। চিঠিতে অনুরোধ ছিল, এ-ব্যাপারে অনুসন্ধান করার জন্যে যেন একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়। কিন্তু এবারেও কোনো রকম সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ফ্লুরাঁ জাদুঘরের অধিকর্তার কাছে তিনি চিঠি লিখে জানালেন যে তাঁর সংগ্রহে যে-সব পাথরের হাতিয়ার আছে সেগুলো জাদুঘরে রাখার জন্যে তিনি দান করতে রাজী আছেন। কিন্তু এ চিঠিরও কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

১৮৫৭ সালে তিনি আবার চিঠি লিখলেন অ্যাস্‌তিতুর কাছে। কিন্তু রাজধানীর নামডাকওলা বিজ্ঞানীরা এক মফস্বল শহরের 'হাতুড়ে' প্রত্নবিদের এই চিঠিকে কোনো রকম আমলই দিলেন না। ইউরোপে কোনো এক সময়ে মানুষ আর হাতি একই সঙ্গে বাস করত—কথাটা তাঁদের কাছে উদ্ভট প্রলাপ বলে মনে হয়েছিল।

এই সময়ে দুটি ঘটনা ঘটল।

ডাক্তার রিগোলো নামে একজন প্রত্নবিদ জাক্ বুশে দ্য প্যার্ত্-এর আবিষ্কারের কথা শুনেছিলেন। আমিঅঁ থেকে তিনি হঠাৎ এসে হাজির হলেন আবেভিই-এ নিজের চোখে সমস্ত কিছু দেখার জন্যে। খানিকটা অবিশ্বাস নিয়েই তিনি এসেছিলেন কিন্তু ফিরে গেলেন

পুরোপুরি বিশ্বাস নিয়ে। আর ফিরে গিয়েও চুপচাপ বসে রইলেন না। আমিএঁর কাছাকাছি সোম নদীর ধারে মাটি খুঁড়তে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনিও খুঁজে পেলেন একই ধরনের হাতিয়ার ও জন্তুর হাড়। তখন জোরালো ভাষায় একটি পুস্তিকা লিখে তিনি জাক্ বুশে দ্য প্যার্ত্-এর মতামতকে সমর্থন জানালেন।

এবার একটা আলোড়ন জাগল। ফ্রান্সে নয়, ইংলণ্ডে। ইংলণ্ড থেকে একদল প্রতিনিধি এলেন জাক্ বুশে দ্য প্যার্ত্-এর সাক্ষ্যপ্রমাণ যাচাই করার জন্যে। এই প্রতিনিধি দলটি এসেছিলেন ১৮৫৯ সালের ২৬শে এপ্রিল তারিখে। আর এই দলে ছিলেন সে-সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ ইংরেজ বিজ্ঞানী এবং উনিশ শতকের একজন অগ্রগণ্য বিজ্ঞানী চার্লস লায়ল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরো তিনজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী। এই চারজন বিজ্ঞানীর উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ করার কোনো কারণ ছিল না।

আবেভিই-এ এসে তাঁরা জাক্ বুশে দ্য প্যার্ত্-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন, তাঁর সংগ্রহ দেখলেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলেন —তারপর তাঁরা গেলেন আমিএঁতে ডাক্তার রিগোলোর কাছে। সেখানেও আলাপ-আলোচনা, দেখা, ঘোরাঘুরি। তারপর তাঁরা ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন জাক্ বুশে দ্য প্যার্ত্-এর মতামতে পুরোপুরি বিশ্বাস নিয়ে। ১৮৫৯ সালের শেষদিকে লায়লের রিপোর্ট প্রকাশিত হল। তাতে তিনি জাক্ বুশে দ্য প্যার্ত্‌কে পুরোপুরি সমর্থন জানালেন। আর এই রিপোর্ট পড়ে ফরাসী বিজ্ঞানী-মহল একেবারে থ'।

দু'এক বছরের মধ্যেই ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের আরো নানা জায়গা থেকে একই ধরনের নিদর্শন পাওয়া গেল। এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে পাথরের হাতিয়ারের চল ছিল আর সে-সময়ের জন্তুজানোয়ারের মধ্যে ছিল হাতি, গণ্ডার ও হিপোপটেমাস। তারপর পুরনো নথিপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে প্রমাণ পাওয়া গেল যে পিকার ও জাক্ বুশে দ্য প্যার্ত্-এর আগেও অনেকে একই ধরনের নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু

ব্যাপারটা সকলের কাছে এতই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল যে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি।

১৮৬৮ সালের ২রা আগস্ট জাক্ বুশে গু প্যার্ত্-এর মৃত্যু হয়। ততোদিনে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ সম্পর্কে তাঁর মতামত পুরোপুরি গ্রাহ্য হয়েছে। শুধু তাই নয়, একদল তরুণ গবেষক পুরাতত্ত্বকে যথার্থ বিজ্ঞানের রূপ দেবার জন্যে এগিয়ে এসেছেন।

এডুয়ার লার্তে (১৮০১-১৮৭১)

পুরাতত্ত্বের জনক হিসেবে কাসিমির পিকার ও জাক্ বুশে গু প্যার্ত্-এর সঙ্গে আরো একজনের নাম করা দরকার। তিনি হচ্ছেন এডুয়ার লার্তে।

নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে, ইনিও ফরাসী। আসলে পুরাতত্ত্বের চর্চা শুরু করা এবং পুরাতত্ত্বকে যথার্থ একটি বিজ্ঞানের রূপ দেবার সমস্ত কৃতিত্বই ফরাসীদের। ইংরেজরা মাঝে মাঝে শুধু সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে।

লার্তের জীবনের প্রথম ত্রিশটা বছর কেটেছে খামখেয়ালিভাবে। খুশিমতো বই পড়তেন, খুশিমতো বাপের জমিদারিতে ঘুরে বেড়াতেন, খুশিমতো এটা-ওটা করতেন। ভূতত্ত্ব বা জীবতত্ত্ব বা পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। ১৮৩০ সালের কাছাকাছি সময়ে একদিন এক চাষী তাঁকে অদ্ভুত একটা দাঁত দেখাল। এই দাঁতটি নাকি কয়েক দিন আগে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে। দাঁতটি ছিল ম্যাস্টোডন নামে এক ধরনের জন্তুর, যারা আজকালকার হাতির সমগোত্রীয়। দাঁতটি দেখে লার্তের ভয়ানক কৌতূহল হল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী জীববিজ্ঞানী কুভিএর লেখা সমস্ত বই পড়ে ফেললেন এবং জন্তুজানোয়ার সম্পর্কে যা-কিছু জানা দরকার জেনে নিলেন। নিজেকে পুরোপুরি তৈরি করে নিতে তাঁর মাত্র চার বছর সময় লেগেছিল। তারপরেই তিনি জমিদারির নানা জায়গায়

খুঁড়তে শুরু করলেন। এইভাবে খুঁড়তে খুঁড়তে ১৮৩৪ সালে তিনি আবিষ্কার করলেন একটি বনমানুষের কঙ্কাল, যার নাম দেওয়া হয়েছে প্লিওপিথেকাস। তারপর কয়েক বছরে তিনি আরো অনেক পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন। তার মধ্যে দুটি আবিষ্কারের কথা বিশেষভাবে বলা দরকার। একটি হচ্ছে আরো একটি বনমানুষের কঙ্কাল, সেই একই জায়গা থেকে। এই বনমানুষটির নাম দেওয়া হয়েছে ড্রাইওপিথেকাস। দ্বিতীয় আবিষ্কার কয়েকটি মানুষের কঙ্কাল। অরিঞাঁক্ নামে একটি গ্রামে একটি গুহার মধ্যে এই কঙ্কালগুলো পাওয়া গিয়েছিল। শুধু এই কঙ্কালগুলোই নয়, সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিল পাথরের হাতিয়ার ও বল্গাহরিণ-ভালুক-গণ্ডার-হায়েনার ভাঙাচোরা হাড়। লার্তে সঠিকভাবেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে গুহার মধ্যে কয়েকটি মৃতদেহকে কবর দেবার সময়ে যে পানভোজনের ব্যবস্থা হয়েছিল—এগুলো হচ্ছে তারই নিদর্শন। তারপরে ১৮৬৩ সালে দোর্দোঞঁ অঞ্চলের একটি গুহা থেকে তিনি এমন সব নিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন যা থেকে ম্যামথ ও মানুষের একই সময়ে বেঁচে থাকার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

তিনটি নাম পাওয়া যাচ্ছে। কাসিমির পিকার, জাক্ বুশে দ্য প্যার্ত্, এদুয়ার লার্তে। পুরাতত্ত্বকে বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব এই তিনজন বিজ্ঞানীর। এঁদের সঙ্গে আরো একটি নাম মনে রাখা দরকার। ইংরেজ বিজ্ঞানী চার্লস লায়ল। এঁদের পরে যাঁরা পুরাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং পুরাতত্ত্বকে নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁরা শুধু ফরাসীদেশের নয়, সব দেশের। এবং তাঁরা সংখ্যায় একজন-দু'জন নন, বহু। কাজেই এই ছোট বইয়ে বিশেষ কারও নাম উল্লেখ করা সম্ভব হবে না। তবে নানা সময়ে নানা বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে যে-সব পুরাতাত্ত্বিক খবর জানা গিয়েছে এবং তা থেকে যে-সব সিদ্ধান্ত করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা মোটামুটি আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

গুহা থেকে নানা রকম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার করা ছাড়াও লার্তেকে আরো একটি কৃতিত্ব দিতে হবে। তা হচ্ছে এই পৃথিবীতে মানুষের বসবাসের সময়ের মধ্যে যতিচিহ্ন বসানো। অর্থাৎ, মানুষের ইতিহাসকে কতকগুলো যুগ ও উপযুগে ভাগ করা।

প্রত্নবিদরা মোটামুটি তিনটি বড়ো বড়ো যুগ মেনে নিয়েছিলেন। প্রস্তর-যুগ, ব্রোঞ্জ-যুগ, লৌহ-যুগ। লার্তে করলেন কি, প্রস্তর-যুগটিকে কয়েকটি উপযুগে ভাগ করলেন; যেমন, গুহা-ভালুকের যুগ, হাতি ও গণ্ডারের যুগ, বল্‌গাহরিণের যুগ, এবং সবশেষে অরোক্ বা বুনোষাঁড়ের যুগ। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কোন সময়ে কোন ধরনের জন্তুজানোয়ার ছিল তারই ভিত্তিতে এই উপযুগগুলোর নামকরণ। এ থেকে শুধু জন্তুজানোয়ার সম্পর্কে নয়, আবহাওয়া সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা হতে পারে, কারণ কোন ধরনের জন্তুজানোয়ার কোন বিশেষ আবহাওয়ায় বেঁচে থাকে সে-সম্পর্কে স্পষ্ট একটা ধারণা জীববিজ্ঞানীদের কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব।

পরে দেখা গেল, এই পৃথিবীতে মানুষের বসবাসের সময়কে আরো নানাভাবে ও নানা দিক থেকে ভাগ করা যেতে পারে। একটি হচ্ছে প্রত্নতাত্ত্বিক দিক। এই দিকটির কথা আগে আলোচনা করেছি। মানুষ আজ পর্যন্ত যতো রকমের হাতিয়ার ব্যবহার করেছে সেগুলোকে উৎকর্ষের বিচারে কতকগুলো ভাগে ভাগ করা যায়। কোন সময়ের মানুষ কী অবস্থায় আছে তার একটা উপায় হচ্ছে তার হাতিয়ার-গুলোকে পরখ করে দেখা। যদি দেখা যায়, সে টুকরো-পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করছে তাহলে বুঝতে হবে জন্তুজানোয়ার শিকার করে আর ফলমূল সংগ্রহ করে সে বেঁচে আছে। এই যুগটিকে বলা হয় পুরাতন প্রস্তরযুগ, ইংরেজিতে প্যালিওলিথিক (palaeolithic) যুগ। হাতিয়ার পরখ করতে করতে এর পরের যে যুগটির সন্ধান পাওয়া যাবে সেখানে মানুষ তার খাদ্যের জন্যে পুরোপুরি শিকার ও সংগ্রহের ওপর নির্ভর করছে না, চাষ ও পশুপালন করতে শিখেছে।

এই যুগটির নাম ইংরেজিতে নিওলিথিক (neolithic), বাংলায় নূতন প্রস্তরযুগ। এই নূতন প্রস্তরযুগে এসেই প্রথম দেখা যাচ্ছে, পাথরের হাতিয়ারকে ঘষেমেজে ছুঁচলো ও ধারালো করে নেবার কারিগরি বিদ্যা মানুষের আয়ত্তাধীন।

এখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। পুরাতন প্রস্তরযুগের শেষদিকের কয়েক হাজার বছরকে সাধারণত মেসোলিথিক (meso-lithic) বা প্রস্তরযুগের মাঝামাঝি অবস্থা বলে চিহ্নিত করা হয়। নতুন নাম হওয়া সত্ত্বেও আসলে কিন্তু এটা নতুন যুগ নয়। তাই বলা যেতে পারে, প্রস্তরযুগের মাঝামাঝি অবস্থা। কোনো কোনো অঞ্চল থেকে এমন সব নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে যা থেকে বোঝা যায় কাঠের গুঁড়ি কাটা-চেরার মতো হাতিয়ার সে-যুগের মানুষ বানাতে পেরেছিল। হাতিয়ারের সঙ্গে কাঠের হাতলের ব্যবহারও তখন থেকেই শুরু।

যাই হোক, পাথরের হাতিয়ারকে ঘষেমেজে ছুঁচলো করে নেবার কৃতিত্ব নূতন প্রস্তরযুগের। এই নূতন প্রস্তরযুগে এসে দেখা যাবে, মানুষের জীবনযাত্রার ধরন-ধারন একেবারে পাল্‌টে গেছে। বিশেষ করে তিনটি ব্যাপার চোখে পড়বে : চাষ, পশুপালন ও মাটির পাত্র তৈরি করা। তার মানে বেঁচে থাকার জন্যে যে খাদ্য ও উপকরণ দরকার তা মানুষ নিজেই উৎপাদন করছে। এতদিন পর্যন্ত তাকে হা-পিত্যেশ করে থাকতে হত, কখন কোথায় একটা শিকার জোটে, কখন কোথা থেকে কিছু ফলমূল যোগাড় হয়। এ-ব্যাপারে তার নিজের কোনো হাত ছিল না। আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে হন্যে হয়ে ঘুরে কোনো শিকার জোটাতে বা কিছু ফলমূল যোগাড় করতে পারা গেল তো খাওয়া জুটল। খাওয়া যে জুটবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু এই নূতন প্রস্তরযুগে এসেই প্রথম দেখা যাচ্ছে, খাওয়ার ব্যাপারে একটা নিশ্চয়তা এসেছে। এতদিন মানুষকে খাদ্য যোগাড় করে নিতে হত, এবার মানুষ নিজের হাতে খাদ্য তৈরি করে নিচ্ছে।

একটি যুগের পর আরেকটি যুগ কি-ভাবে আসছে তা প্রত্নবিদরা ছক কেটে কেটে দেখিয়ে দিয়েছেন। এই ছক-কাটা রাস্তা ধরে যতোই এগিয়ে যাওয়া যাবে ততোই দেখা যাবে, মানুষের হাতিয়ারের রকমফের হচ্ছে আর তার মধ্যে মানুষের হাতের কারিকুরি বাড়ছে। প্রাগৈতিহাসিক কালের একেবারে গোড়ার দিকে মানুষ যে-সব পাথরের টুকরোকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে তার মধ্যে তার নিজের হাতের কারিকুরির কোনো ছাপ ছিল না। সাধারণত নদীর ধারে জলের স্রোতে ক্ষয়ে যাওয়া নানা আকারের নুড়ি পাওয়া যেত। তা থেকেই সে সুবিধেমতো আকারের নুড়িগুলোকে কুড়িয়ে আনত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে। পিকিং-মানুষের গুহায় এ-ধরনের কুড়িয়ে-আনা নুড়ি অজস্র পাওয়া গিয়েছে। *

হাতিয়ারের ধরন-ধারন বিচার করে পুরাতন প্রস্তরযুগটিকে প্রত্ন-বিদরা তিনভাগে ভাগ করেছেন : নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ। সহজ কথায়, গোড়ার অবস্থা, মাঝখানের অবস্থা ও শেষদিকের অবস্থা।

গোড়ার অবস্থায় দেখা যাবে, হাতিয়ারের ওপর মানুষের হাতের ছাপ পড়তে শুরু করেছে। এতদিন পর্যন্ত মানুষের হাতিয়ারে নির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার প্রশ্ন ওঠে নি। হাতের কাছে যখন যেমন নুড়ি কুড়িয়ে পাওয়া যেত তাই ব্যবহার করা হত হাতিয়ার হিসেবে। নিতান্তই সাময়িক প্রয়োজনে ব্যবহার—প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই আবার সেই নুড়ির মতোই ফেলে দেওয়া হত। তারপর

---

* সাধারণত পুরাতন প্রস্তরযুগের শুরু সেই সময় থেকে যখন পাথরের হাতিয়ারে মানুষের হাতের কারিকুরির কিছুটা ছাপ পাওয়া গিয়েছে, অর্থাৎ পাথরকে ঠুকে ঠুকে চেষ্টা করা হয়েছে বিশেষ একটা আকার দেবার। তার আগে পর্যন্ত হাতিয়ার বলতে ছিল কুড়িয়ে আনা বিশেষ ধরনের নুড়ি। পুরাতন প্রস্তরযুগের আগের এই যুগটিকে ইংরেজিতে বলা হয় ইওলিথিক (eolithic) যুগ, বাংলায় বলা চলে প্রস্তরযুগের গোড়ার অবস্থা।

আস্তে আস্তে মানুষ আবিষ্কার করল কি-ভাবে একটা কুড়িয়ে-আনা পাথরকে ভেঙেচুরে বিশেষ একটা আকার দেওয়া যেতে পারে। 'আবিষ্কার' কথাটা আমরা ইচ্ছে করেই ব্যবহার করেছি। কি করে পরমাণুকে ফাটাতে হয়, এটা যেমন এই বিশ শতকের একটা বড়ো আবিষ্কার—তেমনি কি করে একটুকরো পাথরকে নির্দিষ্ট আকারে ফাটাতে হয়, এটাও সেই হাজার হাজার বছর আগেকার প্রাগৈতিহাসিক মানুষের পক্ষে একই রকমের বড়ো আবিষ্কার। কামারশালায় আমরা দেখি, কোনো কিছুর ওপরে ঘা মারতে হলে সেটাকে নেহাইয়ের ওপরে রেখে হাতুড়ি দিয়ে ঘা মারা হয়। এই নেহাই ও হাতুড়িও বলতে গেলে সেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরই আবিষ্কার। সেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষ নেহাই হিসেবে ব্যবহার করত কোনো একটা ঠেলে-বেরিয়ে-আসা শিলাখণ্ডকে। আর হাতের মুঠোয় ধরা একটা পাথর বা কাঠ হত হাতুড়ি।

তারপর থেকেই তৈরি হতে লাগল নির্দিষ্ট আকারের ও নির্দিষ্ট প্রয়োজনের হাতিয়ার। পুরাতন প্রস্তরযুগের গোড়ার অবস্থায় নির্দিষ্ট আকারের ও নির্দিষ্ট প্রয়োজনের যে হাতিয়ারটির চল হয়েছিল (আফ্রিকায়, দক্ষিণ এশিয়ায় ও পশ্চিম ইউরোপে) তার নাম দেওয়া হয়েছে হাতকুড়ুল। পাশের ছবি দেখলে হাতকুড়ুলের চেহারা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা হবে। একটা যেমন-তেমন আকারের পাথরের চাঙড়া ঠুকে ঠুকে এমনি বিশেষ আকারের একটা হাতিয়ার তৈরি করতে হলে যেমন দরকার সময় ও ধৈর্য তেমনি দরকার হাতের দক্ষতা। অর্থাৎ, পাথরের চাঙড়াটার ওপরে কোথায়, কতখানি জোরে আর কেমনভাবে ঘা মারতে হবে সে-সম্পর্কে খানিকটা হিসেব থাকা দরকার। পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে প্রায় একই ধরনের হাতকুড়ুল পাওয়া গিয়েছে—এ থেকে প্রমাণ হয় হাতকুড়ুল তৈরি করার কায়দাটা একটা ঐতিহ্য হিসেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। একদল মানুষ পরের দলের মানুষকে শিখিয়ে গিয়েছে কেমনভাবে হাতকুড়ুল তৈরি করতে হয়, পরের দলের মানুষকে এজন্যে নতুন করে মাথা খাটাতে

হয় নি। প্রত্নবিদরা অনুমান করেন, হাতকুড়ুল দিয়ে কাটা, খোঁড়া, চাঁছা, ঘা মারা বা এ-ধরনের অন্য সব কাজ করা হত।
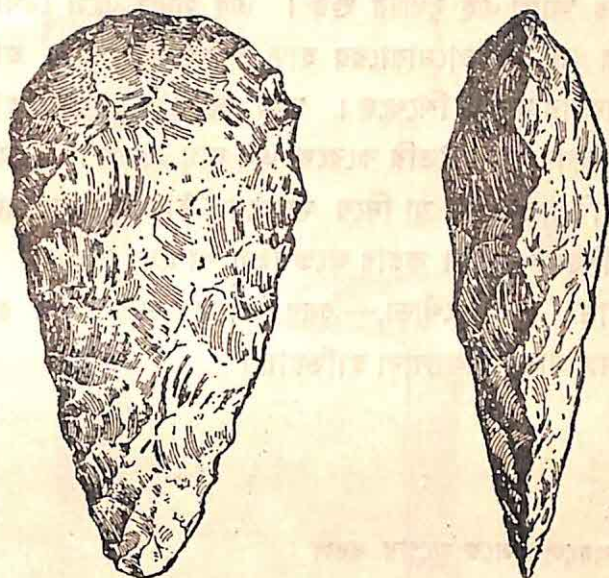
হাতকুড়ুল

'বিশেষ প্রয়োজনের হাতিয়ার' কথাটা হাতকুড়ুলের বেলায় পুরোপুরি খাটছে না, কারণ, দেখাই যাচ্ছে যে কাটা-চাঁছা-খোঁড়া ইত্যাদি সব ধরনের কাজই করা হচ্ছে এই একই হাতিয়ার দিয়ে। কিন্তু পুরাতন প্রস্তরযুগের মাঝামাঝি অবস্থায় এসে দেখা যাবে, হাতিয়ারের রকমফের হয়েছে।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর আগে পুরাতন প্রস্তরযুগের মাঝামাঝি অবস্থার শুরু। ইউ-রোপের নেয়ানডার্থাল মানুষ এ-যুগের একটি নিদর্শন। তারা যে-হাতিয়ার দিয়ে ম্যামথ শিকার করত তার আকার অনেকটা বর্শার ফলকের মতো। কাটা, চাঁছা, এসব কাজের জন্যে তারা যে-হাতিয়ার ব্যবহার করত তার আকার অনেকটা ইংরেজি D অক্ষরের মতো। এ-গুলোকে বলা চলে ছুরি। এই হাতিয়ারের বাঁকানো দিকটা হত ধারালো।

নেয়ানডার্থাল মানুষের ছুরি

পাথরের হাতিয়ারের আরো অনেক বেশি রকমফের দেখা যায় পুরাতন প্রস্তরযুগের শেষদিকে এসে। আজ থেকে প্রায় পঁচিশ হাজার বছর আগে এই যুগটির শুরু। এই সময়ে এসে দেখা যাবে, শুধু পাথর নয় জন্তুজানোয়ারের হাড় ও শিঙকেও মানুষ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে শিখেছে। তার চেয়েও বড়ো কথা, হাতিয়ার তৈরির হাতিয়ার মানুষ তৈরি করেছে এই যুগে এসেই। যেমন, এক ধরনের হাতিয়ার ছিল যা দিয়ে ম্যামথের দাঁতকে বাঁকানো যেত। হাড় ও শিঙকে ফুটো করার জন্যে ছিল পাথরের তুরপুন। কাটা, চাঁছা, খোড়া, বেঁধা, খোঁড়া,—এসব কাজের জন্যে তৈরি হয়েছিল নানা ধরনের আলাদা আলাদা হাতিয়ার।

হাতিয়ার বদলের সঙ্গে যুগের বদল

নিওলিথিক বা নূতন প্রস্তরযুগটি শুরু হয়েছে আজ থেকে সাত হাজার বছর আগে। যদি ধরে নেওয়া হয় যে পাঁচ লক্ষ বছর ধরে মানুষ এই পৃথিবীতে বাস করছে তাহলে বুঝতে হবে যে এই পৃথিবীতে মানুষ বেশির ভাগ সময়টাই কাটিয়েছে পুরাতন প্রস্তর-যুগে।

এখানে একটা বিষয়ে সাবধান হবার আছে। সময়ের হিসেবটা এখানে যেভাবে দেওয়া হয়েছে তা থেকে মনে হতে পারে ঋতু বদলের মতো যুগের বদলটাও নির্দিষ্ট সময় পর পর একটা অবশ্যম্ভাবী নিয়ম হিসেবে ঘটে গেছে। ব্যাপারটা তা নয়। আজ থেকে সাত হাজার বছর আগে নূতন প্রস্তরযুগ শুরু হয়েছে—কথাটার মানে এই নয় যে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যেখানে যতো মানুষ আছে সকলেই এই যুগ-বদলের •আওতায় পড়েছে। যুগের বদলটা শুধু সেইসব মানুষের বেলাতেই হয়েছে যারা চাষ বা পশুপালন করতে শিখেছিল। ব্যাপারটা এই নয় যে হঠাৎ একদিন আকাশে একটা শিঙা বেজে

ফলক
ফলক
ছুরি
হরিণের
শিঙের
কুড়ুল
শিঙের বা
কাঠের
হাতলে
পাথরের
ফলা
লাগানো
কুড়ুল
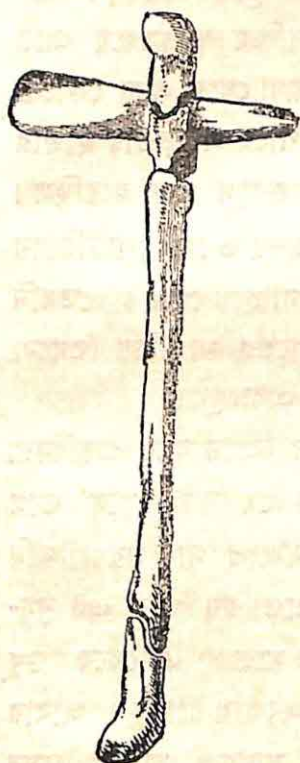
ওঠে আর পেরু থেকে চীন পর্যন্ত সমস্ত মানুষ শিকারের সাজসরঞ্জাম ফেলে রেখে চাষের লাঙল কাঁধে তুলে নেয় বা গোরু-ছাগল চরাবার কাজে লেগে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ও অস্ট্রেলিয়ায় আজো এমন মানুষ আছে যারা পুরাতন প্রস্তরযুগে বাস করছে। অর্থাৎ, তারা এখানো যে-ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করে তা পুরাতন প্রস্তরযুগের।

এ থেকেই অন্য কথাটা আসে। তারা এখনো যে উপায়ে খাদ্য যোগাড় করে তা পুরাতন প্রস্তরযুগের। যেদিন তারা চাষ করতে বা পশুপালন করতে শিখবে সেদিন অন্য ধরনের হাতিয়ারও ব্যবহার করতে হবে তাদের। এ থেকেই বোঝা যায়, যুগকে চিনে নেবার সবচেয়ে নির্ভুল চিহ্ন হচ্ছে হাতিয়ার। হাতিয়ার বদল হওয়া মানেই যুগের বদল।

কথাটা আবার বলছি—যুগের বদলটা সব জায়গায় একই সময়ে নয়। যেমন, মিশর ও মেসোপটেমিয়ার নূতন প্রস্তরযুগ শুরু হয়েছে প্রায় সাত হাজার বছর আগে, পশ্চিম ভারতবর্ষে প্রায় একই সময়ে আর ইউরোপে কোনো জায়গা থেকে এমন কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি যা থেকে মনে হতে পারে সাড়ে-চার হাজার বছর আগে ইউরোপের কোথাও নূতন প্রস্তরযুগ শুরু হয়েছিল। আবার ইংলণ্ডে যখন নূতন প্রস্তরযুগের শুরু, মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় ব্রোঞ্জ-যুগটি তার আগেই হাজার বছরের পুরনো হয়ে গেছে। তেমনি ইংলণ্ডে যখন শিল্প-বিপ্লব হচ্ছে, নিউজিল্যাণ্ডের মাওরিরা তখনো নূতন প্রস্তরযুগে, অস্ট্রেলিয়ায় তখনো পুরাতন প্রস্তরযুগ।

কাজেই, মানুষের হাতিয়ারের রকমফের বিচার করে প্রত্নবিদরা এই পৃথিবীতে মানুষের বসবাসের সময়কে যে কয়টি যুগে ভাগ করেছেন তা ঘড়ির কাঁটা ঘোরার মতো সময়ের মাপ নয়। যদি নিতান্তই কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করতে হয় তবে এই যুগ-গুলোকেও তুলনা করা চলে মাইলস্টোনের সঙ্গে। এ থেকে শুধু বোঝা যাবে, মানুষের সমাজ কোথায় কোন অবস্থায় রয়েছে। আবার মাইলস্টোনের সঙ্গে তুলনা অন্য দিক থেকেও সার্থক। মাইলস্টোনের

বেলায় যেমন প্রথমটি না পেরিয়ে দ্বিতীয়টিতে পৌঁছনো যায় না, তেমনি মানুষের সমাজকেও প্রথম যুগটি পেরিয়ে পৌঁছতে হবে দ্বিতীয় যুগে, দ্বিতীয়টি পেরিয়ে তৃতীয়টিতে—কোনোটিকে বাদ দেবার উপায় নেই বা আগে-পরে হবার উপায় নেই। তার মানে, পুরাতন প্রস্তর-যুগ পেরিয়ে তারপরে পৌঁছতে হবে নূতন প্রস্তরযুগে, নূতন প্রস্তর-যুগ পেরিয়ে ব্রোঞ্জ-যুগে, ব্রোঞ্জ-যুগ পেরিয়ে লৌহ-যুগে। কোন সমাজ কোন যুগে আছে তা থেকে বোঝা যাবে সেই সমাজ কতখানি এগিয়ে আছে বা পিছিয়ে আছে। আবার এমনও হতে পারে যে হাতিয়ার পরখ করে দেখা গেল যে কোনো এক সময়ে এশিয়ার একদল মানুষ যে-ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করছে, কোনো এক সময়ে আফ্রিকার একদল মানুষও সেই একই ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করছে। এ থেকে এ সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই করা চলে যে এই দু'দল মানুষ একই যুগে বাস করছে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই করা চলে না যে এই দু'দল মানুষ একই সময়ে বাস করছে।

সময়ের মাপকাঠি

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে শুধু ধারণা হতে পারে কোন সমাজ কতখানি এগিয়েছে আর কোন বিশেষ যুগে রয়েছে। কোন সমাজ সময়ের বিচারে কতখানি প্রাচীন—সে খবর প্রত্নবিদের কাছ থেকে সঠিকভাবে পাওয়া যায় না।

বয়সের হিসেব জানতে হলে আমাদের যেতে হবে ভূ-বিজ্ঞানীর কাছে। এই পৃথিবীর শিলাস্তরে নির্ভুলভাবে বয়সের খবর লেখা আছে। কাজেই কোন শিলাস্তরে কোন হাতিয়ারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তা থেকেই সেই হাতিয়ারের বয়স সম্পর্কে একটা ধারণা হতে পারে।

আগে বলেছি, পৃথিবীর বয়সকে কতকগুলো অধিকল্পে ও কল্পে

ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগাভাগির মধ্যে সময়ের একটা পাকাপাকি হিসেব আছে। পৃথিবীতে মানুষ এসেছে নবজীবীয় অধিকল্পের প্লাইস্টোসিন কল্পে। যদিও মানুষের বয়স পাঁচ লক্ষ বছর কিন্তু আমরা মাত্র পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস লিখিতভাবে পেয়েছি। এই ঐতিহাসিক কালটুকুকে বাদ দিলে বাকি সবটাই প্রাগৈতি-হাসিক। এই প্রাগৈতিহাসিক কালের অনেক খবর ভূ-বিজ্ঞানীর কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে।

সবচেয়ে বড়ো খবর, প্রাগৈতিহাসিক কালে পর পর কয়েকটি হিমযুগ এসেছিল। প্রত্যেকটি হিমযুগে উঁচু উঁচু পর্বতের চুড়ো থেকে হিমবাহ নেমে এসেছিল নিচের সমতল জমিতে। পৃথিবীর শিলাস্তরে হিমবাহ নেমে আসার নির্ভুল সব চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। ভূ-বিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রাগৈতিহাসিক যুগে পর পর চারবার হিমযুগ এসেছিল।

এই হিমযুগের হিসেব থেকেও প্রাগৈতিহাসিক কালটিকে সময়ের হিসেবের মধ্যে ধরা যেতে পারে। আমরা জানি, হিমযুগের আবহাওয়ায় উষ্ণযুগের জীবজন্তু বেঁচে থাকতে পারে না। উষ্ণযুগের আবহাওয়ায় হিমযুগের জীবজন্তুও নয়। কাজেই যতোবার হিমযুগ এসেছে এবং হিমযুগ পার হয়েছে ততোবারই জীবজগতে বড়ো রকমের অদল-বদল ঘটে গেছে। হিমযুগে সাধারণত দেখতে পাওয়া যাবে ম্যামথ, ঘন লোমওলা গণ্ডার, বল্‌গাহরিণ ইত্যাদি। উষ্ণযুগে সাধারণত দেখতে পাওয়া যাবে হাতি, গণ্ডার, হিপোপটেমাস ইত্যাদি। এমনি এক উষ্ণযুগের জীবজন্তুর মধ্যে ইউরোপে একসময়ে বাঘ পর্যন্ত ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জীবজগতের নিদর্শন থেকেও হিমযুগের আসা-যাওয়ার হদিশ পাওয়া যেতে পারে। আমরা জানি, প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ফসিল পাওয়া খুবই শক্ত। পাঁচ লক্ষ বছর ধরে মানুষ এই পৃথিবীতে বাস করছে কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ফসিল যে-কটি পাওয়া গিয়েছে তা হাতের আঙুলে গোনা যায়। কিন্তু জন্তুজানোয়ারের ফসিল সহজেই পাওয়া যেতে পারে।

পৃথিবীর ইতিহাসের গত পঞ্চাশ কোটি বছরের বিবরণ বেশির ভাগ সংগ্রহ করা হয়েছে এই জন্তুজানোয়ারের ফসিল থেকেই। এই একই উপায়ে গত পাঁচ লক্ষ বছরে মানুষকে কোন কোন সময়ে হিমযুগের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে, কোন কোন সময়ে উষ্ণযুগের—এই ইতিবৃত্তটুকু জেনে নেওয়া খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়।

ভূ-বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে জানা যায়, প্লাইস্টোসিন উপযুগের শেষ হিমযুগটি এসেছিল আজ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। এই হিমযুগেই নেয়ানডার্থাল মানুষ দল বেঁধে ম্যামথ শিকার করতে বেরুত। এই যুগের মানুষের নিদর্শন বলতে একমাত্র এই নেয়ানডার্থাল মানুষকেই আমরা খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু জন্তুজানোয়ারের নিদর্শন অজস্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে—একটু চেষ্টা করলেই সেগুলোকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আর এইসব জন্তুজানোয়ারের ফসিল থেকে এই বিশেষ যুগটি সম্পর্কে অনেক কিছু খবর জানা সম্ভব।

নৃতত্ত্বের দিক থেকে

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রাগৈতিহাসিক কালটিকে জীববিজ্ঞানীরা দেখেছেন কোন যুগে কোন ধরনের জীবের প্রাধান্য ঘটেছে সেই দিক থেকে, প্রত্নবিদরা দেখেছেন কোন যুগে কোন ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে সেই দিক থেকে আর ভূ-বিজ্ঞানীরা দেখেছেন হিমযুগের আসা-যাওয়ার দিক থেকে। আরো একভাবে দেখা যায়, তা হচ্ছে নৃতত্ত্ববিদের দৃষ্টি থেকে। পৃথিবীতে মানুষ সব সময়েই দল বেঁধে বাস করেছে। আর দল বেঁধে বাস করতে হলে কতকগুলো নিয়মকানুন ও রীতিনীতি অবশ্যই মেনে চলতে হয়। এইভাবে গড়ে ওঠে মানুষের সমাজ। নৃতত্ত্ববিদের দৃষ্টি থেকে বিচার করা চলে, প্রাগৈতিহাসিক কালের প্রাচীন সমাজ গোড়ায় কী অবস্থায় ছিল আর পরে কোন কোন অবস্থা পেরিয়ে আজকের চেহারা নিয়েছে।

সমাজের এই গোটা চেহারাটা যদি জানা যায় তাহলেও প্রাগৈতিহাসিককাল সম্পর্কে স্পষ্ট একটা ধারণা হতে পারে।

হেনরি লুইস মর্গান (১৮১৮-১৮৮১)

প্রাচীন সমাজের একটা গোটা চেহারা প্রথম যে নৃতত্ত্ববিদের গবেষণা থেকে স্পষ্টভাবে জানা গিয়েছিল তিনি হচ্ছেন হেনরি লুইস মর্গান, জাতিতে আমেরিকান।

তাঁর জীবনের বেশির ভাগটাই কেটেছে আমেরিকার একদল আদিবাসীদের মধ্যে। আমেরিকার আদিবাসীদের সাধারণভাবে আমরা বলি রেড-ইণ্ডিয়ান। কিন্তু রেড-ইণ্ডিয়ানরা সবাই একদলের নয়। নানান দল তাদের মধ্যে আর প্রত্যেক দলের আলাদা আলাদা নাম। মর্গান যে-দলটির মধ্যে জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছিলেন তাদের নাম ইরাকোয়া।

ইরাকোয়াদের সমাজকে খুঁটিয়ে জানার সুযোগ পেয়েছিলেন মর্গান। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে আরো যে-সব আদিবাসী রয়েছে তাদের বিবরণও তাঁর জানা ছিল। গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। কাজেই হোমারের সময়ে গ্রীকদের অবস্থা, রোম প্রতিষ্ঠার মুখে ইতালীয়দের অবস্থা আর সীজারের সময়ে জার্মানদের অবস্থা সম্পর্কেও তাঁর ধারণা ছিল সুস্পষ্ট। এই সমস্ত উপকরণকে সাজিয়ে-গুছিয়ে তিনি প্রাচীন সমাজের একটা গোটা চেহারা হাজির করলেন তাঁর বিখ্যাত বই 'প্রাচীন সমাজ'-এ। বইটির পুরো নাম—'প্রাচীন সমাজ, বা, বন্য অবস্থা উত্তীর্ণ হয়ে সভ্যতার দিকে মানুষের অগ্রগতি-সংক্রান্ত গবেষণা' (Ancient Society, or Researches in the lines of Human Progress from Savagery, through Barbarism, to Civilization)। ১৮৭৭ সালে বইটি প্রকাশিত হয়।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। ইরাকোয়াদের যে-সমাজকে মর্গান খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করেছিলেন তা হচ্ছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের। এত হাল-আমলের একটি সমাজকে বিশ্লেষণ করে কি করে তিনি হাজার হাজার বছর আগেকার প্রাচীন সমাজের ছবি আঁকলেন ?

এখানেই মর্গানের গবেষণার সবচেয়ে বড়ো কথাটা ওঠে।

সারা পৃথিবীতে মানুষের সমাজ সমান তালে উন্নতি করতে পারে নি। কোনো কোনো সমাজ অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে, কোনো কোনো সমাজ অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে। আদিবাসীদের সমাজ পিছিয়ে-পড়াদের দলে। কথাটা নিয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছি এবং কথাটা মানতে কোনো আপত্তি ওঠার কথা নয়। মর্গান বললেন যে এই পিছিয়ে-পড়া সমাজের চেহারা দেখে প্রাচীন সমাজের চেহারা সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। এইটেই হচ্ছে মর্গানের গবেষণার নতুন কথা এবং সবচেয়ে বড়ো কথা।

পৃথিবীর নানা অঞ্চলের আদিবাসীদের সমাজ বিশ্লেষণ করে মর্গান দেখলেন যে এক-একটি সমাজ উন্নতির এক-একটি ধাপে আটকে রয়েছে। এইসব নানা ধাপে আটকে থাকা সমাজের দৃষ্টান্তও মর্গান দিয়েছেন। মর্গানের দৃষ্টান্তগুলোই ধরা যাক।

মেক্সিকো, নিউ মেক্সিকো, মধ্য-আমেরিকা ও পেরুর আদিবাসীদের সমাজ হচ্ছে একটি ধাপ। এরা পশুপালন ও চাষ করতে শিখেছে কিন্তু লোহার ব্যবহার জানে না, লেখার অক্ষর আবিষ্কার করতে পারে নি।

আরেকটি ধাপ হচ্ছে মিসৌরি নদীর পুব পাড়ের রেড-ইণ্ডিয়ানদের সমাজ। এরা পশুপালন বা চাষ করতে শেখে নি কিন্তু মাটির পাত্র তৈরি করতে শিখেছে। অর্থাৎ, এই ধাপটি আগের ধাপের চেয়ে পিছিয়ে আছে।

আবার এই দ্বিতীয় ধাপের চেয়েও আরো এক ধাপ পিছিয়ে আছে কলম্বিয়া উপত্যকা ও হাডসন-বে-টেরিটরির আদিবাসীদের

সমাজ। এরা মাটির পাত্র তৈরি করতে শেখে নি কিন্তু তীরধনুকের ব্যবহার শিখেছে।

এই তৃতীয় ধাপের চেয়েও পিছিয়ে-থাকা ধাপ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ও পলিনেসিয়ার আদিবাসীদের সমাজ। এরা তীরধনুকের ব্যবহার পর্যন্ত জানে না।

এই চতুর্থ ধাপের চেয়েও পিছিয়ে-থাকা কোনো ধাপের সন্ধান অবশ্য মর্গান পান নি। কিন্তু মর্গান বললেন যে প্রাগৈতিহাসিক কালে মানুষ যখন সবে জানোয়ারের জীবন ছেড়ে মানুষের জীবন শুরু করতে যাচ্ছে সেই সময়ের কোনো নিদর্শন যদি থাকে তবে সেই সমাজটি হচ্ছে সবচেয়ে পিছিয়ে-থাকা ধাপ।

তারপর মর্গান এই পরের-পর ধাপগুলোকে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখলেন যে আদিবাসীদের এক-একটি সমাজ যে এক-এক ধাপে আটকে রয়েছে সেটা কোনো সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার নয়, তার মধ্যে স্পষ্ট একটা পারম্পর্য আছে। ধাপগুলো ঠিক যেন একটা সিঁড়ির ধাপের মতোই পরের-পর আসছে। উঁচু দিকে কোনো একটি ধাপে পৌঁছতে হলে নিচের দিকের প্রত্যেকটি ধাপকে পরের-পর পেরিয়ে আসতে হবে।

ওপরে আদিবাসীদের সমাজের যে-কটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু ধাপে রয়েছে মেক্সিকো ও নিউ মেক্সিকোর আদিবাসীরা।

এরা যদি আরো এক ধাপ উন্নতি করে তাহলে কোন ধাপে পৌঁছবে? এই পরের ধাপটির চেহারা মর্গান খুঁজে বার করলেন গ্রীক ও লাতিন সাহিত্য থেকে। তিনি বললেন যে হোমারের সময়ের গ্রীকদের সমাজ বা সীজারের সময়ের জার্মানদের সমাজ বা রোম-প্রতিষ্ঠার সময়ের ইতালীয়দের সমাজ—এই হচ্ছে মেক্সিকো ও নিউ মেক্সিকোর আদিবাসীদের সমাজের পরের ধাপ।

মর্গানের এই সূত্রটি মেনে নিলে আর এই সূত্র দিয়ে আদি-বাসীদের সমাজের নানান ধাপগুলোকে পর পর গেঁথে তুললে যে

অখণ্ড চেহারাটি ফুটে ওঠে তাই হচ্ছে মানবজাতির চেহারা। মর্গানের নিজের ভাষায়, "মানুষের অগ্রগতির ছ'টি প্রধান ধাপের পর পর নিদর্শন হচ্ছে এই: শুরুতে অস্ট্রেলীয় ও পলিনেসীয়, মধ্যে আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ান, শেষে রোমান ও গ্রীক; এদের মিলিত অভিজ্ঞতার যোগফলকে মোটামুটি বলা চলে মধ্য-বন্য-দশা থেকে প্রাচীন সভ্যতার শেষ পর্যন্ত মানবগোষ্ঠীর নিদর্শন।"

মানবগোষ্ঠীর এই নিদর্শনকে মর্গান তিনভাগে ভাগ করেছেন: (১) স্যাভেজারি (Savagery), (২) বার্বারিজ্‌ম (Barbarism), (৩) সিভিলাইজেশন (Civilization)। বাংলায় বলা চলে বন্য, বর্বর ও সভ্য দশা।

মানুষের সভ্য দশার কথা ইতিহাসেই লেখা আছে, তা নিয়ে মর্গান মাথা ঘামান নি। বন্য ও বর্বর দশাকে তিনি খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। বন্য ও বর্বর দশা সবসুদ্ধ ছ'টি স্তরে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এই ছ'টি স্তরকেই এর আগে আমরা ছ'টি ধাপ বলেছি। তাহলে প্রাচীন সমাজের পুরো চেহারাটা দাঁড়াচ্ছে এই:

১। বন্য দশা

একেবারে আদিম অবস্থা থেকে মাটির পাত্র তৈরি করতে শেখার আগে পর্যন্ত এই বন্য দশা। ওপরে আদিবাসী সমাজের যে-সব দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ও পলিনেসিয়ার আদি-বাসীদের সমাজ এবং কলম্বিয়া-উপত্যকা ও হাডসন-বে-টেরিটরির আদিবাসীদের সমাজ এখনো বন্য দশায় রয়েছে।

(ক) বন্য দশার নিম্ন স্তর

এই স্তরকে বলা হয় মানবজাতির শৈশব। মানুষ তখনো প্রায় জানোয়ারের মতো বনেজঙ্গলে দিন কাটায়। গাছ ছেড়ে পুরোপুরি মাটিতে নেমে আসে নি, অন্তত হিংস্র জন্তুর কবল থেকে বাঁচবার জন্যেও তাকে মাঝে মাঝে গাছে আশ্রয় নিতে হয়। ফলমূল হচ্ছে খাদ্য। এই স্তরের মানুষদের প্রধান কৃতিত্ব, তারা কথা বলতে

শিখেছে। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে থাকতে হয়েছে এই স্তরে কিন্তু প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ নেই কারণ আদিবাসীদের মধ্যে কোথাও এমন কোনো দল নেই যারা এখনো এই স্তরে রয়েছে।

(খ) বন্য দশার মধ্য স্তর

মাছ ধরতে এবং খেতে শেখা আর আগুন বশে আনার সময় থেকে এই স্তরের শুরু। এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক আছে কারণ আগুনে ঝল্‌সে না নিলে খাদ্য হিসেবে মাছ থেকে পুরো পুষ্টি পাওয়া যায় না। মাছকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে শেখার পর থেকেই মানুষের চলাফেরার মধ্যে খানিকটা স্বাধীনতা এসে যায়। নদীর ধার ধরে ধরে তারা অনায়াসে দূর দূর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তারা যে সত্যিই ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ, পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই পুরাতন প্রস্তরযুগের হাতিয়ার অজস্র পাওয়া গিয়েছে। বাইরের জগতে মুক্তি পেয়ে তার মগজ খাটাবার ক্ষমতা বেড়ে গেল। একদিকে যেমন সে নতুন নতুন খাদ্য আবিষ্কার করতে লাগল, অন্যদিকে নতুন নতুন হাতিয়ার। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে তার খাদ্যের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠত আর তখন সে হয়ে উঠত নরখাদক। অস্ট্রেলিয়া ও পলিনেসিয়ার আদিবাসীরা এখনো এই স্তরে আছে।

(গ) বন্য দশার উচ্চ স্তর

তীরধনুক আবিষ্কার করা থেকে এই স্তরের শুরু। এর পর থেকে খাদ্যের জন্যে শিকারের ওপরে অনেকখানি নির্ভর করতে পারা গেল। শিকার করাটা হয়ে উঠল নৈমিত্তিক কাজ। সহজেই বোঝা যায়, তীরধনুক হাতিয়ার হিসেবে খুবই জটিল একটা ব্যাপার— অনেক মাথা খাটিয়ে অনেক অভিজ্ঞতা হবার পরে এই হাতিয়ারটির আবিষ্কার। যাদের এতখানি কৃতিত্ব তারা নিশ্চয়ই আরো অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছিল। এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে এই স্তরের মানুষরা কাঠের পাত্র তৈরি করতে জানত, গাছের ছাল বুনে চুবড়ি তৈরি করতে জানত, আর পাথরের হাতিয়ারকে বিশেষ কায়দায় ঠুকে ঠুকে ধারালো করতে জানত। এ ছাড়াও জানত

আগুন ও পাথরের কুড়ুলের সাহায্যে গাছের গুঁড়ি থেকে নৌকো তৈরি করতে। ঘরবাড়ি তোলার জন্যেও মাঝে মাঝে কাঠের খুঁটি ও তক্তা ব্যবহার করত। তাহলে দেখা যাচ্ছে, তীরধনুক আবিষ্কার করার পর থেকেই মানুষের সমাজ অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। বন্য দশার তীরধনুককে তুলনা করা চলে বর্বর দশার লোহার তলোয়ারের সঙ্গে বা সভ্য দশার বন্দুকের সঙ্গে। তিনটিই মারাত্মক অস্ত্র।

২। বর্বর দশা

মাটির পাত্র তৈরি করতে শেখা থেকে বর্বর দশার শুরু। আর লেখার হরফ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই দশার শেষ।

(ক) বর্বর দশার নিম্ন স্তর

মাটির পাত্র তৈরি করতে শেখা থেকে এই স্তরের শুরু। নানা জায়গা থেকে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে গোড়ার দিকে মানুষ চুবড়ি বা কাঠের পাত্রকে আগুন থেকে বাঁচাবার জন্যে সেগুলোর ওপরে কাদা লেপে দিত। সেই থেকে আবিষ্কার করতে পেরেছিল যে ভেতরকার চুবড়ি বা কাঠের পাত্রটি না থাকলেও শুধু মাটি পুড়িয়েও পাত্র তৈরি করে নেওয়া চলে। এই স্তরটি শেষ হয়েছে কৃষি ও পশুপালন করতে শেখার অবস্থায় এসে।

(খ) বর্বর দশার মধ্য স্তর

কৃষি ও পশুপালন করতে শেখা থেকেই এই স্তরের শুরু। লোহার ব্যবহার শেখার পর এই স্তরের শেষ।

(গ) বর্বর দশার উচ্চ স্তর

লোহার ব্যবহার শেখা থেকে এই স্তরের শুরু আর লেখার হরফ আবিষ্কারে এসে এই স্তরের শেষ।

এই স্তরের দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রীক, জার্মান ও ইতালীয়দের যে সময়ের কথা মর্গান উল্লেখ করেছিলেন তা আগেই বলেছি।

এই স্তরে এসেই প্রথম দেখা যাচ্ছে, লোহার লাঙলের ব্যবহার শুরু হয়েছে আর সেই লাঙল টানছে মানুষ নয়—পশু। চাষের

কাজে পশুশক্তিকে ব্যবহার করতে পারা মানুষের পক্ষে মস্ত একটা কৃতিত্ব। ফলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ক্ষেত জুড়ে চাষ হতে লাগল। বনজঙ্গল পরিষ্কার হয়ে তৈরি হতে লাগল গৃহপালিত পশু চরাবার জমি ও নতুন নতুন চাষের ক্ষেত। লোহার হাতিয়ার দেখতে দেখতে গোটা দেশের চেহারা পাল্‌টে দিল। হুহু করে মানুষের সংখ্যা বাড়তে লাগল আর অল্প জায়গায় অনেক মানুষ এসে জড়ো হতে লাগল। মানুষের সমাজের এমন একটা সমৃদ্ধি এর আগে আর কোনো কালে দেখা যায় নি।

সব মিলিয়ে

প্রাগৈতিহাসিক কালকে যতোভাবে চেনার চেষ্টা করা হয়েছে এতক্ষণ তা আলাদা আলাদাভাবে বলেছি। সব মিলিয়ে মোট চেহারাটা কি দাঁড়াল সেটা এবারে দেখা যেতে পারে।

(১) আমাদের কাহিনীর শুরু পাঁচ লক্ষ বছর আগে যখন মানুষ সবে গাছ থেকে মাটিতে নেমে এসেছে। নিজের হাতে খাদ্য তৈরি করার ক্ষমতা তার নেই, তাকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হয় শিকার ও সংগ্রহের ওপরে। মর্গান এই অবস্থার নাম দিয়েছেন বন্য দশা, প্রত্নবিদরা নাম দিয়েছেন পুরাতন প্রস্তরযুগ, ভূ-বিদরা নাম দিয়েছেন প্লাইস্টোসিন। শেষদিকের মাত্র সাত হাজার বছর বাদ দিলে পাঁচ লক্ষ বছরের মধ্যে বাদবাকি সমস্ত সময়ে মানুষ এই অবস্থার মধ্যে দিন কাটিয়েছে। এবং এখনো পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে এমন সমাজ আছে যারা এই অবস্থা পার হয়ে আসতে পারে নি।

(২) সাত হাজার বছর আগে পশ্চিম ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে মানুষ কৃষি ও পশুপালন শেখে। অর্থাৎ এতদিন খাদ্যের জন্যে তাদের নির্ভর করতে হয়েছিল শিকার ও সংগ্রহের ওপরে—এবার তারা নিজেরাই খাদ্য উৎপাদন করছে। মর্গান এই অবস্থার নাম

দিয়েছেন বর্বর দশা। প্রত্নবিদের দিক থেকে এটি হচ্ছে নূতন প্রস্তরযুগ, ভূ-বিদদের দিক থেকে সাম্প্রতিক।

(ঃ) পাঁচ হাজার বছর আগে আফ্রিকার নীল ও ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস নদীর উপত্যকায় এবং ভারতবর্ষের সিন্ধু উপত্যকায় এক নতুন ধরনের সভ্যতা গড়ে ওঠে, যার নাম দেওয়া চলে নগর-সভ্যতা। এই সময় থেকেই মানুষ লিখতে শেখে। মর্গান এই অবস্থার নাম দিয়েছেন সভ্য দশা। প্রত্নবিদের চোখ দিয়ে দেখলে সভ্য দশার মধ্যে দুটি ভাগ আছে। সভ্য দশার প্রথম দু'হাজার বছরকে বলা হয় ব্রোঞ্জ-যুগ আর শেষ তিন হাজার বছরকে লৌহ-যুগ।

বিপ্লব ও যুগান্তর

মাত্র তিন হাজার বছরের লৌহ-যুগটি সময়ের মাপকাঠিতে কিছুই নয় কিন্তু ঘটনা হিসেবে চমকপ্রদ। মাত্র তিন হাজার বছরের মধ্যে মানুষ যে বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে তার কোনো তুলনা নেই। ভাবতে অবাক লাগে যে পাঁচ লক্ষ বছর ধরে মানুষ এই গ্রহে বাস করছে কিন্তু মানুষের সত্যিকারের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে মাত্র শেষদিকের কয়েক হাজার বছরে। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই এই নয় যে শেষদিকের কয়েক হাজার বছরে মানুষ অন্য ধরনের মগজ নিয়ে জন্মাচ্ছে। মগজের দিক থেকে নেয়ানডার্থাল মানুষও হালের মানুষের চেয়ে এমন কিছু খাটো ছিল না। হালের মানুষ এতভাবে মগজ খাটাতে পারছে কিন্তু নেয়ানডার্থাল মানুষ পারে নি, তার কারণ কি?

আসল কথা মানুষের মগজ খাটাবার ক্ষমতাটা নির্ভর করে বাস্তব অবস্থার ওপরে—যে বাস্তব অবস্থার মধ্যে সে বড়ো হয়। পুরাতন প্রস্তরযুগের অবস্থায় মানুষকে যে কয়েক লক্ষ বছর কাটাতে হয়েছিল তার কারণটাও রয়েছে পুরাতন প্রস্তরযুগের বাস্তব অবস্থার মধ্যেই।

সেটা ঠিক কী, সে-আলোচনায় আমরা পরে আসব। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মানুষ যখনই সেই বাস্তব অবস্থার মধ্যে একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন আনতে পেরেছিল, অর্থাৎ কৃষি ও পশুপালন শিখে খাদ্যের ব্যাপারে আত্মনির্ভর হয়েছিল, তখনই মানুষের মগজ খাটাবার ক্ষমতা অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল।

আর শুধু এই একবারই নয়, যতোবারই মানুষ তার বাস্তব অবস্থার মধ্যে এমনি বড়ো রকমের পরিবর্তন আনতে পেরেছে ততোবারই মানুষ হিসেবে তার ক্ষমতা যেন আচমকা অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে।

বাস্তব অবস্থার মধ্যে এমনি বড়ো রকমের এক-একটা পরিবর্তন আনার নাম বিপ্লব—একটি যুগের শেষ, নতুন একটি যুগের শুরু। মানুষের প্রথম বিপ্লব পুরাতন প্রস্তরযুগ থেকে নূতন প্রস্তরযুগে আসার সময়ে। মানুষের দ্বিতীয় বিপ্লব নীল ও সিন্ধু উপত্যকায় নগর-সভ্যতা পত্তনের সময়ে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এক-একটি বিপ্লবের পরে যে নতুন বাস্তব অবস্থা তৈরি হয় তার মধ্যে মানুষের ক্ষমতা যেন মুক্তি পায়। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই আবার নতুনতর বাস্তব অবস্থা তৈরি করার প্রয়োজন এসে পড়ে—নইলে মানুষের ক্ষমতার বিকাশ হয় না। কেন এমনটি হয় সে-আলোচনায় আমাদের পরে আসতে হবে। কিন্তু আপাতত এটুকু বোঝা যাচ্ছে, মানুষের ঠিকানায় পৌঁছতে হলে কয়েকটি বড়ো বড়ো বিপ্লবের মোড় পার হতে হয়। অতএব এই বিপ্লবের দিকেই যাত্রা শুরু করা যাক।

পুরাতন প্রস্তরযুগ

পৃথিবীতে মানুষ এসেছে পাঁচ লক্ষ বছর আগে। এই পাঁচ লক্ষ বছরের মধ্যে শেষদিকের মাত্র সাত হাজার বছর বাদ দিলে সবটাই পুরাতন প্রস্তর বা প্রত্নপ্রস্তর বা পুরোপলীয় (palaeolithic) যুগ*। মানুষের পুরো জীবনটাই প্রায় কেটেছে পুরাতন প্রস্তরযুগে।

অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতে পুরাতন প্রস্তরযুগে হিমযুগ এসেছে চারবার আর পর পর দুই হিমযুগের মাঝখানের সময়ের উষ্ণযুগ তিনবার। এক-একটি হিমযুগে পৃথিবীর কতটা অংশ হিমবাহের নিচে ঢাকা পড়েছিল আর কতটা অংশ মানুষের বাসের যোগ্য ছিল তার একটা সীমানা বিজ্ঞানীরা মোটামুটি আন্দাজ করতে পেরেছেন। সে-সময়ে মানুষের চলাফেরার জন্যে খুব যে জায়গা ছিল তা নয়। নতুন নতুন জায়গায় গিয়ে আস্তানা পাততে হয়েছিল মানুষকে। 'আস্তানা' কথাটা ব্যবহার করলাম বটে কিন্তু আস্তানা মানে ঘরবাড়ি নয়। শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে মানুষকে বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল গুহার মধ্যে। আবার হিমযুগ পার হতেই মানুষ গুহা ছেড়ে বাইরের ফাঁকা জায়গায় আস্তানা পেতেছে। পরের হিমযুগে আবার এসে আশ্রয় নিয়েছে গুহায়। অবশ্য কথাগুলো যতো সহজে বলা যাচ্ছে, আসল ব্যাপারটা ততো সহজে ঘটে নি। হাজার

* মেসোলিথিক বা প্রস্তরযুগের মাঝামাঝি অবস্থাটি আসলে পুরাতন প্রস্তরযুগের আওতাতেই পড়ে।

হাজার বছর পার হয়ে তবে এক-একবার আস্তানা বদলের পালা এসেছে। তবে বিজ্ঞানীদের একদিকে স্থবিধে হয়েছে এই যে তাঁরা একই জায়গা থেকে নানান সময়ের মানুষের নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন।

প্রত্নবিদরা এমন হাতিয়ারও খুঁজে পেয়েছেন যা প্রথম হিমযুগেরও আগেকার কালের। হাতিয়ারগুলো এমন যে চোখের দেখায় নিতান্তই কতকগুলো চকমকি পাথরের টুকরো ছাড়া কিছু মনে হয় না। বড়ো একখণ্ড পাথর নানা প্রাকৃতিক কারণে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। এই টুকরোগুলোকে নিশ্চয়ই হাতিয়ার বলা চলে না। একটুকরো পাথর তখনই হাতিয়ার হিসেবে গণ্য যখন দেখা যায় পাথরের ভাঙচুর এলোমেলো নয়, কেউ যেন এমনভাবে ভেবেচিন্তে পাথরটাকে ভেঙেছে যেন তা দিয়ে কাটা-চাঁছা-থোড়া-খোঁড়া বা এ-ধরনের কোনো কাজ করা সম্ভব।

অবশ্য এই একেবারে গোড়ার দিকের হাতিয়ার সম্পর্কে কোনো কোনো প্রত্নবিদ সন্দেহ পোষণ করেন। তাঁদের ধারণা, এগুলো নিতান্তই পাথরের টুকরো। তবে অধিকাংশ প্রত্নবিদের মতে প্রথম হিমযুগ শুরু হবার আগে থেকেই মানুষ হাতিয়ার ব্যবহার করতে শিখেছিল।

পুরাতন প্রস্তরযুগের একেবারে গোড়ার দিকের হাতিয়ার সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ পোষণ করার কারণ থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু এই যুগ খানিকটা পুরনো হবার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়, মানুষ হাতিয়ার তৈরি করতে ও ব্যবহার করতে শিখেছে। পিকিং-মানুষ ও জাভা-মানুষের কথা আগে বলেছি। হাতিয়ার তৈরি করা ও ব্যবহার করা ছাড়াও তারা আগুনকে বশে এনেছিল।

কিন্তু হাতিয়ার ও আগুনের কথা বলার আগে মানুষের অন্য একটা বড়ো কৃতিত্বের কথা বলা দরকার। তা হচ্ছে মানুষের ভাষা— মুখের কথায় একজনের মনের ভাব আরেকজনের কাছে প্রকাশ করার ক্ষমতা।

ভাষা

ভাষা নিয়ে মানুষ জন্মায় না। জন্মের পরে শিশুর গলা দিয়ে যে আওয়াজ বেরোয় তা ভাষা নয়। ভাষা তাকে শিখতে হয়। বড়োদের মুখের ভাষা শুনে সে ভাষা শেখে।

কিন্তু সেই আদিম মানুষকে ভাষা শিখিয়েছিল কে?

এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব যদি দিতে হয় তবে বলতে হবে—আদিম মানুষকে ভাষা শিখিয়েছিল মানুষের হাত।

কথাটা ব্যাখ্যা করা দরকার।

বাঁচার তাগিদে মানুষকে চিরকাল দল বাঁধতে হয়েছে। একা থাকাটা তার পক্ষে কোনো দিক দিয়েই নিরাপদ নয়। হিংস্র জন্তুজানোয়ারের আক্রমণ ঠেকাতে হলে আর খাদ্যের জন্যে শিকার করতে হলে দশহাত এক হওয়া দরকার। আর মিলেমিশে কাজ করতে হলে গোড়াতেই দরকার নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার ব্যবস্থা—একজনের ভাবনাকে দশজনের ভাবনা করে তোলা। তার মানে, ভাবের আদানপ্রদান করা।

যতোক্ষণ মানুষের মুখে ভাষা আছে ততোক্ষণ ভাবের আদান-প্রদান করাটা কোনো একটা সমস্যা নয়। আমি যা ভাবছি তা অনায়াসেই মুখের কথায় আরেকজনকে জানাতে পারি। কিন্তু মুখের ভাষা যদি না থাকে? ধরা যাক, একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে কাছে ডাকতে চায়। মুখের ভাষা ছাড়া অন্য কি-ভাবে সে ডাকতে পারে? আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারি। মুখের ভাষা ছাড়াও শুধু চোখের আর হাতের ভঙ্গি করে দূরের মানুষকে কাছে ডাকা যেতে পারে। প্রয়োজন-বোধে আমরা ডাকিও। একজন আমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে আর তার জবাবে আমি বলতে চাই—হ্যাঁ। জবাব মুখের ভাষায় না দিয়ে ঘাড় কাত করে ইঙ্গিতেও দেওয়া যেতে পারে। বড়ো হয়েও যাদের মুখে ভাষা ফোটে না, যাদের বলা হয় বোবা, তারা কি-ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে? তারা মনের ভাব প্রকাশ

করে নানা ধরনের অঙ্গভঙ্গি করে। তার মানে তারা কথা বলে মুখ দিয়ে নয়, সমস্ত শরীর দিয়ে।

তাই বলে আদিম মানুষদের সঙ্গে বোবাদের তুলনা করছি না। এ তুলনা শুধু একথা বোঝবার জন্যে যে মুখের ভাষা ছাড়াও ভাবের আদানপ্রদান চলতে পারে।

আবার কথাটাকে উল্‌টো দিক থেকেও ভেবে দেখা যেতে পারে। যদিও মনের ভাব প্রকাশ করার জন্যে মুখের ভাষাই যথেষ্ট কিন্তু তবুও আমরা প্রত্যেকেই কথা বলার সময়ে কিছু না কিছু অঙ্গভঙ্গি করি। অঙ্গভঙ্গি না করে বক্তৃতা দিতে পারেন এমন লোক খুবই কম। রেডিওতে নাটক অভিনয়ের সময়েও অঙ্গভঙ্গি না করলে অনেক পাকা অভিনেতা অভিনেত্রীও মুখের ভাষায় ভাব ফোটাতে পারেন না। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যখন কথা বলে তখন তাদের কথাটাই আসল না অঙ্গভঙ্গিটাই আসল তা বুঝে ওঠা ভার।

অর্থাৎ, মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে মানুষের অঙ্গভঙ্গির সম্পর্ক খুব গভীর।

ভাষার গোড়াতেও এই অঙ্গভঙ্গি। অঙ্গভঙ্গি থেকেই ভাষার জন্ম। কল্পনা করা যাক, আদিম মানুষদের একটা দল শিকার করতে বেরিয়েছে। তারা তখনো কথা বলতে পারে না। কথা বলতে হলে জিভটাকে যতোভাবে নাড়াতে-চাড়াতে হয় ততোভাবে নাড়াবার-চাড়াবার মতো জায়গা তখনো তাদের মুখের মধ্যে তৈরি হয় নি। তারা গলা দিয়ে আওয়াজ বার করতে পারে বটে কিন্তু সে-সব আওয়াজের মধ্যে কোনো ভাষা নেই। বড়ো জোর একটা হুংকার বা চিৎকার বা গোঙানি—তার বেশি কিছু নয়। মানুষের মগজের যে-অংশ থেকে কথা বলার ব্যাপারটাকে চালনা করা হয় তাও তাদের মগজের মধ্যে তখনো তৈরি হয় নি। কিন্তু এই মানুষদেরও চোখ আছে, কান আছে, কাজেই শিকার করতে বেরিয়ে এদের চোখ-কান থাকে খুবই সজাগ। কোথাও হয়তো একটা খস্‌-খস্‌ আওয়াজ উঠল, কোথাও ঝোপঝাড়ের সবুজের মধ্যে দিয়ে হল্‌দে একটা ছোপ

ছুটে পালিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে তারা একটা সংকেত পেয়ে যায়। এক-এক রকম সংকেতের এক-একটা অর্থ: কখনো বুঝতে হবে বিপদ আসছে, সাবধান হওয়া দরকার; কখনো বুঝতে হবে শিকার ছুটে পালাচ্ছে, পেছনে ধাওয়া করা দরকার। এ পর্যন্ত জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের কোনো তফাত নেই। জন্তুজানোয়াররাও এ-ধরনের সংকেতই পেয়ে থাকে। তফাত আসছে পরের পর্বে। একজন মানুষ যদি সামনে দিয়ে একটা হরিণ ছুটে যাবার সংকেত পায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে দলের অন্য মানুষদের সংকেতটি জানিয়ে দিতে পারে। তার মানে, অন্যরা নিজেদের চোখে না দেখেও বা নিজেদের কানে না শুনেও অন্য একজনের সংকেতের মারফত একটি সংকেত পেতে পারে। এভাবে জানানি দেওয়াকে বলা যেতে পারে সংকেতের সংকেত (signal of signals)।

মানুষের ভাষাকেও বলা হয় সংকেতের সংকেত। আদিম মানুষদের ভাষা ছিল না কিন্তু তারা সংকেতের সংকেত দিত গলা দিয়ে বোবা আওয়াজ বার করে আর হাত-পা নেড়ে।

গোড়ার দিকে মানুষ যখন সবে সামান্য দু'একটা হাতিয়ার ব্যবহার করতে শিখেছে তখন সামান্য দু'একটা অঙ্গভঙ্গির সাহায্যেই তার মনের ভাব প্রকাশ করা চলত। কেননা, নানা ধরনের কাজ যদি না করতে হয় নানা ধরনের অভিজ্ঞতা যদি না হয়ে থাকে, তাহলে নানা ধরনের মনের ভাব হয় না। কিন্তু তারপরে হাতিয়ার যতো জটিল হয়ে ওঠে, যতোই এক-এক ধরনের কাজের জন্যে এক-এক ধরনের হাতিয়ারের ব্যবহার শুরু হয় ততোই তার অভিজ্ঞতা বাড়ে, ততোই নানা ধরনের মনের ভাব প্রকাশ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে অঙ্গভঙ্গি, বা যাকে বলা হয়েছে সংকেতের সংকেত, তাও নানা ধরনের হয়ে ওঠে।

মানুষের মগজের কথাটাও এবার একটু ভাবা দরকার। আগে যে-মগজকে সামান্য দু'একটা সংকেতের মানে বুঝতে হত আর সেইমতো চেষ্টা নার্ভের মারফত অঙ্গচালনা করতে হত, সেই

মগজকেই এখন হাজারটা সংকেতের মানে বুঝতে হচ্ছে আর সেইমতো চেষ্টা নার্ভের মারফত হাজার রকমের অঙ্গচালনা করতে হচ্ছে। কাজেই মগজটিও আর আগেকার মতো ছোট্টটি নেই, কাজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়তনেও বেড়েছে। আবার মগজকে আয়তনে বাড়তে হলে মগজের জন্যে জায়গা ছেড়ে দেওয়া দরকার। চোয়ালের হাড়কে ছোট হয়ে এই জায়গা ছাড়তে হয়েছে। আবার চোয়ালের হাড় ছোট হতে পেরেছে কারণ মানুষের হাতের নিপুণতা বেড়েছে। মানুষকে বনমানুষের মতো চোয়ালের জোরে ছেঁড়াখোঁড়ার কাজ করতে হয় না, তা সে করে তার নিজের হাতের তৈরি হাতিয়ারের সাহায্যে।

এইভাবে হাতিয়ারের উন্নতি হবার সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের সংকেত দেবার ক্ষমতা ও বোঝার ক্ষমতা হয় মানুষের : কিন্তু শুধু অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে সংকেত দিতে হলে একটা অসুবিধে এই যে রাত্রির অন্ধকারে বা গাছপালার আড়াল থেকে সংকেত দেওয়া চলে না। কাজেই অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে গলার আওয়াজকেও সংকেত হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। নানা ধরনের সংকেতের জন্যে নানা ধরনের গলার আওয়াজ। কিন্তু তখনো পর্যন্ত জিভকে নানা ভাবে নাড়াবার মতো জায়গা তৈরি হয় নি। কাজেই সব ধরনের আওয়াজকে প্রায় একই ধরনের আওয়াজ বলে মনে হয়।

গোড়ার দিকে অঙ্গভঙ্গিটাই ছিল আসল, গলার আওয়াজটা তার সঙ্গে পোঁ ধরত। তারপর আস্তে আস্তে জিভকে নানা ভাবে নাড়াবার ক্ষমতা মানুষ আয়ত্ত করে, মানুষের গলা থেকে নানা ধরনের আওয়াজ বেরিয়ে আসতে থাকে, বিশেষ বিশেষ সংকেতের জন্যে বিশেষ বিশেষ ধরনের আওয়াজ সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়ে যায়।

এ-অবস্থায় শেষ পর্যন্ত আওয়াজগুলোই হয়ে ওঠে আসল আর অঙ্গভঙ্গি তার সঙ্গে পোঁ ধরে। ওদিকে মগজের মধ্যেও বিশেষ একটা অংশ তৈরি হয়েছে স্বরযন্ত্রকে চালনা করার জন্যে। এইভাবে মানুষের মুখে ভাষা ফোটে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভাষার জন্মেরও একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসকে খুঁজতে হবে মানুষের বাস্তব জীবনযাত্রার মধ্যে, বেঁচে থাকার তাগিদে তার দল বাঁধা ও হাতিয়ার তৈরি করার মধ্যে।

আবার, ভাষা তৈরি না হলে মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা হত না। চিন্তা করার ক্ষমতা না হলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হত না। তাহলে কথাটা দাঁড়ায় এই যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কোনো একটা অলৌকিক দান নয়। হাত আর হাতিয়ারকে ঠিকভাবে কাজে লাগিয়েই এই বুদ্ধিবৃত্তি সে অর্জন করেছে। কথাটাকে অন্যভাবেও বলা চলে। মানুষকে তৈরি করেছে মানুষের শ্রম।

আগুন

পুরাতন প্রস্তরযুগে মানুষের সবচেয়ে বড়ো আবিষ্কার—আগুন। জীবজগতে একমাত্র মানুষ ছাড়া আর সকলের কাছেই আগুন একটা ভয়ের ব্যাপার। আগুনের ধারকাছে কেউ ঘেঁষতে চায় না। আগ্নেয়গিরি থেকে যখন দমকে দমকে আগুন বেরিয়ে আসে বা আকাশ থেকে বাজ পড়ে গোটা একটা গাছ দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে বা মাটি ফুঁড়ে জ্বলন্ত গ্যাস আগুনের ফোয়ারার মতো ছিটকে বেরোয়—সব জায়গাতেই আগুনের চেহারাটা এমন বুনো আর হিংস্র আর ভয়ংকর যে ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই ভয়-পাওয়া ভয়ানককেও বশে আনার দুর্জয় সাহস মানুষের হয়েছিল। এটা যে কতবড়ো একটা কৃতিত্বের পরিচয় তা আজকালকার দিনে যখন আমরা মস্ত একটা অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপারকে সামান্য একটা দেশলাইয়ের খোলে পুরে পকেটের মধ্যে ফেলে রাখি তখন ধারণা করাও সম্ভব নয়।

আগে বলেছি, জীবজগতে একমাত্র মানুষই যে-কোনো পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। মানুষের এই ক্ষমতার অনেকখানি

আয়ত্ত হয়েছে আগুন বশে আনার পরে। যতোই ঠাণ্ডা পড়ুক, মানুষের আর ভয় পাবার কোনো কারণ থাকে না, আগুনের আঁচে সে অনায়াসে গা গরম করতে পারে। গুহার মধ্যে সূর্যের আলো না ঢুকুক, আগুন জ্বালিয়ে গুহার সমস্ত অন্ধকার কাটানো যায়। আশেপাশে যতোই হিংস্র জানোয়ার ঘোরাফেরা করুক, আগুন জ্বালিয়ে রাখলে কেউ আর কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না। তাছাড়া আগুনে ঝল্‌সিয়ে রান্না করে নিলে একদিকে তার খাবারে যেমন একটা নতুন স্বাদ আসে, অন্যদিকে যে-সব জিনিস এতকাল কাঁচা খেয়ে হজম করা যেত না সেগুলোও তার ভোজ্যবস্তুর তালিকায় এসে যায়।

ঠিক কোন সময়ে মানুষ আগুন আবিষ্কার করেছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। তবে পিকিং-মানুষ যে আগুনের ব্যবহার জানত তার প্রমাণ পিকিং-মানুষের গুহায় পাওয়া গিয়েছে। ব্যাপারটা যে-সময়েই ঘটুক, একথা ঠিক যে আগুনকে বশে আনতে পেরে প্রকৃতির অসহায় জীব মানুষ প্রকৃতির এক প্রচণ্ড শক্তিকে বশে আনতে পেরেছিল। এতদিন পর্যন্ত মানুষের ক্ষমতার দৌড় ছিল এটুকু যে পাথরকে ভেঙেচুরে সে দু'একটা হাতিয়ার বানাতে পারত। তাও একেবারে প্রাথমিক ধরনের হাতিয়ার। তা দিয়ে কাটা-চাঁছা-খোঁড়া ছাড়া অন্য কিছু করা যেত কিনা সন্দেহ। এই সামান্য কয়েকটা হাতিয়ারের সম্বল নিয়ে তার পক্ষে প্রাণ বাঁচিয়ে চলাটা বড়ো সহজ ব্যাপার ছিল না। একদিকে ছিল হিংস্র জন্তুজানোয়ারের আক্রমণ, অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্বিপাক। সব কিছুকেই ভয় করে চলতে হত। কোথাও এমন কিছু জোর ছিল না যা থেকে তার মনে এই ভরসা আসতে পারে যে প্রাকৃতিক রাজ্যে সেও রুখে দাঁড়াতে পারে। সেও নিজের প্রভুত্ব কায়েম করতে পারে। আগুন আবিষ্কার করে মানুষ নিজের এই জোর আবিষ্কার করেছে।

পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের যে শাখাটি রসায়নবিদ্যা হিসেবে গড়ে উঠেছে তার সূত্রপাতও এই আগুনের আবিষ্কারের মধ্যে। একখণ্ড

কাঠ আগুনের মধ্যে ফেললে কি-ভাবে কাঠের খণ্ডটা থেকে আগুনের শিখা বেরিয়ে আসে, কি-ভাবে ধোঁয়া ওঠে, আর শেষ পর্যন্ত কি-ভাবে কাঠের খণ্ডটা মিলিয়ে গিয়ে পড়ে থাকে একমুঠো ছাই—আদিম মানুষ চোখের সামনে এই আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে দেখেছিল। আর এই আশ্চর্য ঘটনার নায়ক কিনা সে নিজে! খুশিমতো সে এই ঘটনাকে ঘটাতে পারছে! আদিম মানুষের আদিম কল্পনা এতে ভীষণভাবে নাড়া খেয়েছিল।

এজন্যেই দেখা যায়, আগুনকে নিয়ে আদিম মানুষ যতো গল্পগাথা তৈরি করেছে এমন আর কোনো কিছু নিয়ে নয়।

গোড়ার দিকে আদিম মানুষ আগুন তৈরি করতে জানত না। বাইরে থেকে আগুন সংগ্রহ করে এনে গুহার মধ্যে তাকে জীইয়ে রাখত। আগুনকে নিবতে দেওয়া হত না কখনো। চকমকি পাথর ঠুকে বা কাঠে কাঠ ঘষে আগুন তৈরির কায়দাটা মানুষ শিখেছিল অনেক পরে, শেষ হিমযুগের সময়ে।

আদিম গুহা-মানুষ অনির্বাণ আগুন জ্বালিয়ে রাখত কারণ নতুন করে আগুন তৈরির কায়দা তার জানা ছিল না। প্রথাটা এখনো টিকে আছে ধর্মস্থানে অনির্বাণ প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার অনুষ্ঠানের মধ্যে। পরে আমরা দেখব, আমরা এখনো যে-সব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করি তার মধ্যে আদিম মানুষের জীবনযাত্রার অনেক ছাপই থেকে গিয়েছে।

যাই হোক, যদিও সেই আদিম যুগে বিজ্ঞানের জন্ম হয় নি, কিন্তু আগুনের আবিষ্কারকে একটা বড়ো রকমের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে তুলনা করা চলে। আগুন বশে আনার জন্যে মানুষকে অনেক দিন ধরে অনেকভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েছে; অনেক দিন ধরে অনেকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে আগুন কি-ভাবে তৈরি হয়, কি-ভাবে ছড়িয়ে পড়ে, কি-ভাবে নিভে যায়; অনেক দিন ধরে অনেকভাবে জানতে হয়েছে আগুন কি-ভাবে জীইয়ে রাখা চলে—তারপরেই আগুনকে পুরোপুরি বশে আনা
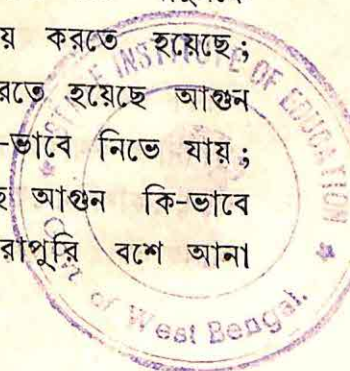
গিয়েছে। এতখানি অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে যে আবিষ্কার তাকে নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মর্যাদা দেওয়া চলে।

শিকার ও সংগ্রহ

পুরাতন প্রস্তরযুগে মানুষ খাদ্য তৈরি করতে শেখে নি। খাদ্যের জন্যে হয় তাকে আঁতিপাঁতি করে ফলমূল খুঁজে বেড়াতে হত কিংবা দল বেঁধে শিকারে বেরুতে হত। খাদ্যসংস্থানের আর কোনো তৃতীয় উপায় ছিল না। কাজেই পুরাতন প্রস্তরযুগকে শিকার ও সংগ্রহের যুগও বলা চলে।

অনুমান করা চলে, খাদ্যসংস্থানের জন্যে যদি শুধু শিকার ও সংগ্রহের ওপরে নির্ভর করতে হয় তাহলে খাদ্যের ব্যাপারে খুব একটা নিশ্চয়তা থাকে না। সে-অবস্থায় মুখের গ্রাসের ব্যবস্থা করার জন্যেই মানুষের সব সময়ের মনোযোগ ও প্রচেষ্টাকে নিবদ্ধ রাখতে হয়।

এই অবস্থার মধ্যে হাজার হাজার বছর কাটাতে হয়েছে বলে বাঁচার তাগিদেই মানুষকে খুঁটিয়ে জানতে হয়েছে কোন আবহাওয়ায় আর কোন সময়ে কোন কোন গাছপালা-ঝোপঝাড়-লতাঘাস জন্মায়, কখন তাতে ফুল ও ফল ধরে আর কোন অবস্থায় সেগুলো মরে যায়। এই জানার চেষ্টার মধ্যেই উদ্ভিদবিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা ও ভূ-বিদ্যার সূত্রপাত। তেমনি শিকার পাবার জন্যে মানুষকে জন্তুজানোয়ারের চালচলন ও স্বভাব খুঁটিয়ে জানতে হয়েছে। আবার ঠিকমতো যদি শিকার করতে হয় তাহলে কতকগুলো খুঁটিনাটি ব্যাপারে ধারণা থাকা দরকার; যেমন, কখন পূর্ণিমা আসে, কখন অমাবস্যা হয়, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার মাঝখানের দিনগুলোতে চাঁদ কি-ভাবে বাড়ে-কমে, কোনদিন কোন সময়ে চাঁদ ওঠে, সারা বছরে কোন কোন সময়ে আবহাওয়ার অদল-বদল ঘটে, আকাশের তারা দেখে কি-ভাবে

রাত্রির প্রহর জানা যায়, ইত্যাদি। এই জানার চেষ্টার মধ্যেই প্রাণিবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার সূত্রপাত।

একটু আগে বলেছি, পুরাতন প্রস্তরযুগে মানুষের সমস্ত মনোযোগ ও প্রচেষ্টা নিবদ্ধ ছিল শিকার ও সংগ্রহের কাজে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, এই শিকার ও সংগ্রহের কাজের মধ্যে দিয়েই তার চিন্তাজগতে নতুন জ্ঞানের সূত্রপাত হচ্ছে। কথাটা সব যুগের পক্ষেই সত্যি। মানুষের ধ্যানধারণা, জ্ঞানবিজ্ঞান, কোনো কিছুই মানুষের মগজের মধ্যে আচমকা গজিয়ে ওঠে না। বাস্তব অবস্থার মধ্যে, জীবনযাত্রার ধরনের মধ্যে এমন কতকগুলো কারণ তৈরি হয় যা থেকে ধ্যানধারণা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সূত্রপাত। একটু পরেই আমরা শিল্প ও সংগীত সম্পর্কে আলোচনা তুলব। সেখানেও এই একই কথা। কিন্তু তার আগে পুরাতন প্রস্তরযুগের হাতিয়ার সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা সেরে নেওয়া দরকার।

হাতিয়ার

হাতিয়ার তৈরি করতে গিয়ে মানুষকে প্রথমেই ভাবতে হয়েছে কোন জিনিস দিয়ে সবচেয়ে পাকাপোক্ত হাতিয়ার তৈরি হতে পারে। বাঁশ, কাঠ বা এ-ধরনের পল্‌কা জিনিস দিয়েও নিশ্চয়ই হাতিয়ার তৈরি হয়েছিল। কিন্তু হাজার বা লক্ষ বছর পরে সে-সব হাতিয়ারের কোনো রকম নিদর্শন পাবার উপায় নেই, কেননা বাঁশ বা কাঠ অল্প সময়ের মধ্যেই ধুলো হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। মাটির নিচে চাপা পড়লেও যে-জিনিস হাজার বা লক্ষ বছরে সহজে নষ্ট হবার নয় তা হচ্ছে পাথর। কাজেই আজ পর্যন্ত আদিম মানুষের হাতিয়ারের যে-সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা সবই পাথরের।

কিন্তু পাথর মানে যে-কোনো পাথর নয়। আদিম মানুষকে অনেক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে জানতে হয়েছিল, ঠিক কোন ধরনের

পাথর দিয়ে সবচেয়ে ভালো হাতিয়ার হতে পারে। পিকিং-মানুষের গুহায় কোয়ার্ট্জ পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সাধারণত দেখা যায়, পৃথিবীর সব জায়গার মানুষ হাতিয়ার তৈরির জন্যে বাছাই করেছে চকমকি পাথর (flint)।

একখণ্ড চকমকি পাথরকে নির্দিষ্ট আকারে ভাঙাচোরা করাটা বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। একজন ফরাসী কারিগর এ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছিলেন। তাঁর গবেষণা থেকে জানা গিয়েছিল যে একখণ্ড চকমকি পাথরকে নির্দিষ্ট আকারে ভাঙতে হলে বেশ খানিকটা কারিগরি দক্ষতা আয়ত্ত করা দরকার। আদিম মানুষকেও নিশ্চয়ই অনেক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এই কারিগরি বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়েছিল। আর পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে পাওয়া পাথরের হাতিয়ারের মধ্যে আশ্চর্য একটা মিল আছে। আলাদা আলাদা জায়গা, আলাদা আলাদা মানুষ, কিন্তু হাতিয়ার তৈরি হয়েছে হুবহু একই ধরনের। অনায়াসে মনে হতে পারে, এইসব আলাদা আলাদা জায়গার মানুষের মধ্যে কোনো এক ধরনের যোগাযোগ ছিল।

একেবারে গোড়ার দিকে হাতিয়ার তৈরি হত পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি করে একখণ্ড বড়ো পাথরকে টুকরো টুকরো করে নিয়ে। কিন্তু পুরাতন প্রস্তরযুগের মাঝামাঝি সময়ে এসে দেখা যাচ্ছে, হাতিয়ার তৈরির কাজে কারিগরি দক্ষতা এসেছে। কোথাও হাতিয়ার তৈরি হচ্ছে বড়ো একখণ্ড পাথর থেকে পাতলা পরত খসিয়ে নিয়ে। এ-ধরনের হাতিয়ারের নাম দেওয়া হয়েছে পরত-পাথরের, হাতিয়ার (flake-tools)। মূল পাথরটার দিকে এখানে নজর দেওয়া হয় নি। আবার কোথাও হাতিয়ার তৈরি হয়েছে পরত খসিয়ে নেবার পরে মূল পাথরটা দিয়ে। পরতের দিকে এখানে নজর দেওয়া হয় নি। এ-ধরনের হাতিয়ারের নাম দেওয়া হয়েছে মূল পাথরের হাতিয়ার (core-tools)।

পরত-পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে হিমযুগের ইউরোপে ও ইউরেশিয়ার উত্তরাঞ্চলে (আল্পস, বল্কান, ককেসাস, হিন্দুকুশ ও

হিমালয় পর্বতমালাকে যদি একটা রেখা হিসেবে ভাবা যায় তাহলে তার উত্তরদিকের অঞ্চলে)। মূল-পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে আফ্রিকার সমস্ত অঞ্চলে, পশ্চিম ইউরোপে ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে। তাছাড়া, চীন, উত্তর ভারতের সোহন উপত্যকা ও মালয় উপদ্বীপ থেকে তৃতীয় আরেক ধরনের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে যা পরত-পাথরেরও নয়, মূল-পাথরেরও নয়, যাকে বলা চলে নুড়ি-পাথরের হাতিয়ার।

লক্ষ করার বিষয় এই যে যদিও পুরাতন প্রস্তরযুগে নানা ধরনের হাতিয়ার তৈরি হয়েছে কিন্তু এক-একটি বিশেষ অঞ্চলে এক-একটি বিশেষ ধরনের হাতিয়ারেরই চল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আবহাওয়া বা বাসস্থানের সঙ্গে হাতিয়ার তৈরির ধরনের কোনো সম্পর্ক আছে। এক-একটি বিশেষ অঞ্চলে যে এক-একটি বিশেষ ধরনের হাতিয়ার তৈরি হয়েছে তা নিতান্তই একটা পুরুষানুক্রমিক ধারা অনুসরণের ব্যাপার। কারণ দেখা যাচ্ছে, যেখানে যে-বিশেষ ধরনের হাতিয়ার তৈরি হয়েছে সেখানে হাজার হাজার বছরেও সেই বিশেষ ধরনের মধ্যে বিশেষ কোনো রদবদল হয় নি।

তবে, আগে বলেছি, পুরাতন প্রস্তরযুগে সম্ভবত চারবার হিমযুগ এসেছিল। প্রত্যেকটি হিমযুগ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে বাধ্য হয়ে কিছুটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে হয়েছিল। যেমন, যারা পরত-পাথরের হাতিয়ার তৈরি করত তারা সরে গিয়েছিল ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, সিরিয়ায় ও আফ্রিকায়। যারা মূল পাথরের হাতিয়ার তৈরি করত তারা সরে গিয়েছিল আরও দক্ষিণে। এর ফলে হাতিয়ার তৈরির দুটি আলাদা ধরনের মধ্যে যোগাযোগ ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। হয়তো তা ঘটেও ছিল। কারণ দেখা গিয়েছে, দুটি হিমযুগ পার হবার পরে কোনো কোনো অঞ্চলের হাতিয়ার তৈরির ধরনের মধ্যে চিরাচরিত ধারাটি বজায় থাকে নি।

এসব খুঁটিনাটির ব্যাপার। মোটা কথাটা এই: মানুষের ইতি-হাসের পাঁচ লক্ষ বছরের মধ্যে সাড়ে চার লক্ষ বছরই হাতিয়ার বলতে

ছিল একমাত্র হাতকুড়ুল। হাতকুড়ুলের ছবি আমরা আগে দেখেছি। ছবিটির দিকে আরেকবার তাকিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, হাতিয়ারটি নিতান্তই মামুলি, একখণ্ড জুতসই পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরি। এমনকি যেটুকু চেষ্টা করলে এই পাথরের টুকরোটার মধ্যে একটা ছিরি বা ছাঁদ আনা যেত তারও অভাব।

এই ছিরি বা ছাঁদের জন্যে আমাদের নেয়ানডার্থাল মানুষ * পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, অর্থাৎ পুরাতন প্রস্তরযুগের মাঝারি অবস্থার শুরু পর্যন্ত। এ-সময়ের হাতকুড়ুলগুলো হাতিয়ারও বটে আবার শিল্পকর্মও বটে। এসব হাতকুড়ুলের মধ্যে শুধু যে সূক্ষ্ম কারিগরির ছাপ রয়েছে তা নয়, দেখেই বোঝা যায়, অনেকখানি সময় খরচ করা হয়েছে এগুলোকে দেখতে সুন্দর করার জন্যে।

কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কৃতিত্ব, আলাদা আলাদা কাজের জন্যে আলাদা আলাদা হাতিয়ারের ব্যবহার। বর্শা এ-যুগের সবচেয়ে বড়ো আবিষ্কার, কেননা এই হাতিয়ারটি হাতে আসার পরেই হিংস্র জন্তুদের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস পেয়েছিল মানুষ। বর্শা এমন একটি হাতিয়ার যা মানুষের হাতকে অনেকখানি লম্বা আর হাতের নখকে ভীষণরকমের ধারালো করে তুলেছিল। ফলে, হিংস্র জন্তু মানুষকে আর নাগালের মধ্যে পেত না, তার আগেই মানুষের এই 'লম্বা ও ধারালো হাতটি' এসে বিঁধত তার বুকে।

বর্শা যে মানুষের জোর কতখানি বাড়িয়ে তুলেছিল তার প্রমাণ, নেয়ানডার্থাল মানুষ বর্শা দিয়ে ম্যামথ ও গণ্ডার শিকার করত—যে ম্যামথ ও গণ্ডার এমনিতে মানুষের চেয়ে অনেক অনেক বেশি পরাক্রমশালী।

যে-সব শিকার দূর থেকেই ছুটে পালাত (যেমন ঘোড়া, বাইসন) তাদের শিকার করা হত উড়ন্ত বর্শা দিয়ে। ছোট একটা লাঠির ডগায় হাল্‌কা হাড়ের ফলক লাগিয়ে তৈরি হত উড়ন্ত বর্শা।

* অর্থাৎ, শরীরের গড়নের দিক থেকে নেয়ানডার্থাল। সাধারণভাবে এদের নাম দেওয়া হয়েছে মুস্তেরীয় (Mousterians)।

ফলে, দূর থেকে ছুটে পালানো জন্তুজানোয়ারেরও মানুষের হাত থেকে রেহাই ছিল না। অর্থাৎ, মানুষের হাত যেন আরো অনেকখানি লম্বা হয়ে গিয়েছিল।

তারপরেই পুরাতন প্রস্তরযুগের তাক্‌-লাগানো আবিষ্কার—তীর-ধনুক। 'আবিষ্কার' মানে এই নয় যে আচমকা একদিনে ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছিল। কয়েক হাজার বছর লেগেছিল উড়ন্ত বর্শা থেকে তীরধনুকে পৌঁছতে। এই তীরধনুক আবিষ্কারের পর থেকে আকাশের উড়ন্ত পাখিও মানুষের হাতের নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছিল।

এমনিভাবেই মানুষের হাত হয়েছিল ক্রমেই লম্বা, ক্রমেই জোরালো।

আচ্ছাদন ও আস্তানা

খাদ্য ও হাতিয়ার বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে মানুষকে নিজের শরীর-টাকে নানাভাবে কাজে লাগাতে হত। নিজেদের শরীরের দিকে তাকিয়েই আমরা বুঝতে পারি—চুল, ঘাড়, কবজি, কোমর, হাঁটু, এসব জায়গায় এমন ব্যবস্থা করা সম্ভব যে জিনিসপত্তর অনায়াসে বেঁধে বা ঝুলিয়ে নেওয়া চলে। আদিম মানুষও তাই করেছিল। এই ব্যবস্থাগুলোই ক্রমে হয়ে উঠেছিল বিশেষ একটা সজ্জা। পালক, হাড়, চামড়া ও রং-বেরঙের পাথর দিয়ে তৈরি সজ্জাই ক্রমে হয়ে উঠেছিল পোশাক ও অলংকার। ঘন পশমওলা চামড়া দিয়ে শরীরটাকে ঢেকে রাখলে শীতের সময়ে শরীর গরম থাকে—এ আবিষ্কার করতে মানুষের খুব বেশি দেরি হয় নি। গোড়ার দিকে আস্ত একটা চামড়াকেই গায়ে জড়িয়ে রাখা হত, পরে শরীরের মাপে রীতিমতো সেলাই করে নেওয়া হত। সেলাইয়ের জন্যে ব্যবহার করা হত হাড়ের তৈরি সূঁচ আর শক্ত গাছের বাকল দিয়ে তৈরি সুতো।

তার মানে, আমরা বলতে পারি, বেঁচে থাকার তাগিদ থেকেই মানুষ পোশাক ও অলংকার ব্যবহার করতে শিখেছিল। একই তাগিদ থেকে শিখেছিল আস্তানা গড়তে। গোড়ার দিকে মানুষ প্রকৃতির গড়া আস্তানাতেই আশ্রয় নিত, যেমন জন্তুজানোয়াররা নিয়ে থাকে। তবে জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে মানুষের তফাত ছিল এটুকু যে মানুষ গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেবার আগে গুহাকে প্রয়োজন-মতো অদল-বদল করে নিতে পারত।

তারপরে খাদ্যের সন্ধানে মানুষকে নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে হয়েছিল। সব জায়গায় আস্তানা নেবার মতো গুহা পাওয়া যেত না। তখন মানুষ এমন সব জায়গা খুঁজে বার করত যা পুরো-পুরি না হলেও অনেকটা গুহার মতো। হয়তো মাথার ওপরে একটা চালার মতো আছে আর দু-দিকে দুটো দেওয়াল—মানুষ করত কি, বাকি দুটো দিক গাছের গুঁড়ি আর লতাপাতা দিয়ে ঘিরে নিত।

আর দুদিকে দুটো দেওয়াল তোলা যদি সম্ভব হয়ে থাকে তবে চারটে দেওয়াল তুলতেই বা বাধা কিসের? মাথার ওপরে একটা চালা? অল্প কিছুকালের মধ্যেই দেখা গেল, একেবারে ফাঁকা মাঠের মধ্যেও মানুষ ঘর বানিয়েছে। অবশ্য একালের চোখ দিয়ে এসব ঘরকে কিছুতেই ঘর বলে চেনা যেত না।

প্রথমে মস্ত একটা গর্ত খুঁড়ে নেওয়া হত। গর্তের দেওয়াল যাতে ধ্বসে না পড়ে সেজন্যে থাকত পাথর আর হাড়ের ঠেক্না। গর্তের মুখটাকে ঢেকে দেওয়া হত বাঁশ আর ডালপালা দিয়ে তৈরি চালা দিয়ে।

বাইরে থেকে তাকিয়ে শুধু গর্তের ওপরকার চালাটা চোখে পড়ত। মাটি-লেপা চালাটাকে দেখে মনে হত একটা মাটির ঢিবি।

কিন্তু তবু গর্তও নয়, মাটির ঢিবিও নয়—এই ছিল মানুষের হাতের তৈরি আস্ত একটা ঘর। অন্তত, ঘর বলতে আমরা যা বুঝি—রান্না, শোওয়া, খাওয়া, বসা ও কাজ করার জায়গা ও বন্দোবস্ত থাকা—তা সবই ছিল এই মাটির ঢিবির তলার গর্তের মধ্যে।

অবশ্য এত কথা বলার পরেও একথা স্বীকার করতে হবে যে এই গর্তগুলোকে ঘর না বলে আস্তানা বলাই ভালো। মানুষ সত্যিকারের ঘর বানাতে শিখেছিল চাষের কাজ শেখার পরে। আমরা আগে আলোচনা করেছি, চাষের কাজ শুরু করার আগে পর্যন্ত মানুষকে বেঁচে থাকার জন্যে পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়েছিল শিকার ও সংগ্রহের ওপরে। শিকার ও সংগ্রহের তাগিদেই মানুষকে অনবরত ঘুরে বেড়াতে হত। একজায়গার জন্তুজানোয়ার ও ফলমূল ফুরিয়ে গেলে ছুটতে হত অন্য জায়গায়। ফলে কোনো একটা জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই পুরাতন প্রস্তরযুগে সত্যিকারের ঘরবাড়ি বানাবার তাগিদ মানুষ অনুভব করে নি।

জীবনযাত্রার এই ধরনের জন্যে অন্য কতকগুলো দিকেও তেমন তাগিদ ছিল না। যেমন মাটির পাত্র। পুরাতন প্রস্তরযুগে মাটির পাত্র তৈরি হয় নি তার কারণও মানুষের এই যাযাবর জীবন। তাই বলে তরল পদার্থ রাখার জন্যে বা একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার জন্যে সেই যাযাবর মানুষদেরও কি পাত্রের দরকার হত না? নিশ্চয়ই হত। চামড়ার বা কাঠের পাত্র দিয়েই তারা কাজ চালিয়ে দিত, ভারী অথচ পল্‌কা মাটির পাত্র তাদের কাছে বিরক্তিকর একটা বোঝা বলে মনে হত নিশ্চয়ই। এই একই কারণে পুরাতন প্রস্তরযুগে কাপড়-বোনার বিদ্যা মানুষের অনায়ত্ত ছিল—যদিও তারা গাছের ছাল দিয়ে চুবড়ি বুনতে পারত।

সুতো কাটা, কাপড় বোনা, মাটির পাত্র তৈরি করা—এসব কাজের ধরনই এমন যে অস্থির যাযাবর জীবনে তাদের স্থান নেই।

পুরাতন প্রস্তরযুগের ধ্যানধারণা

পুরাতন প্রস্তরযুগ সম্পর্কে আমরা এতক্ষণ যা-কিছু আলোচনা

করলাম সবই সে-যুগের কতকগুলো বাস্তব নিদর্শনকে ভিত্তি করে। যেমন, আমরা কতকগুলো হাড় খুঁজে পেয়েছি আর তা থেকে আঁচ করতে পেরেছি সে-সময়ের মানুষের চেহারা কি-রকম ছিল। কতকগুলো হাতিয়ার খুঁজে পেয়েছি আর তা থেকে অনুমান করেছি সে-সময়ে মানুষের জীবনযাত্রার ধরন কি-রকম ছিল।

কিন্তু এমন কোনো নিদর্শন কি নেই যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে, সে-সময়ে মানুষের ধ্যানধারণা কি-রকম ছিল?

তাও আছে। তাছাড়া আগে বলেছি, আজকালকার দিনেও পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া আদিবাসীদের মধ্যে যারা এখনো পুরাতন প্রস্তরযুগে রয়েছে—তাদের দেখেও আমরা এই যুগের ধ্যানধারণা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি।

এক এক করে আলোচনা তোলা যাক।

মৃতের কবর

পুরাতন প্রস্তরযুগের প্রায় একেবারে গোড়া থেকেই মৃতকে কবর দেবার রীতি ছিল। এমনি কয়েকটি কবরের নিদর্শনও পাওয়া গিয়েছে। অমোঘ ও অনিবার্য মৃত্যু আদিম মানুষের কল্পনাকে কি ভীষণ নাড়া দিত তা এসব কবর দেখলে বোঝা যায়।

তারা বিশ্বাস করত না যে মৃতের শরীরে আর কোনো কালেই জীবন ফিরে আসবে না। তাই তারা কবরের মধ্যে মৃতের জন্যে নানা ধরনের পার্থিব আয়োজন করে রাখত। প্রায় প্রত্যেকটি কবর-খানাতেই মৃতের কঙ্কালের পাশে জন্তুজানোয়ারের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ মৃতের জন্যে কবরের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য মজুদ রাখা হয়েছিল। অনেক কবরে দেখা গিয়েছে যে নুড়ি সাজিয়ে এমন একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে মৃতদেহের ওপরে মাটির চাপ না পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে মৃতদেহকে হাত-পা মুড়ে এমন ভঙ্গিতে

শুইয়ে রাখা হত যে-ভঙ্গিকে বলা হয় 'ভ্রূণ'-ভঙ্গি, শিশুরা মায়ের পেটে থাকার সময়ে যে-ভঙ্গিতে থাকে। অর্থাৎ, যেন কল্পনা করা হচ্ছে যে মৃতব্যক্তির আবার জন্ম হবে। এ ছাড়াও মৃতদেহের শরীরে লাগানো হত লালরঙের প্রলেপ, যা ছিল রক্তের প্রতীক। আবার এমনও দেখা গিয়েছে যে কবর তৈরি করা হয়েছে অগ্নিকুণ্ডের কাছাকাছি জায়গায়। উদ্দেশ্য, আগুনের আঁচে মৃতের ঠাণ্ডা শরীর যেন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।* মৃত্যুর সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার এবং জীবনের সঙ্গে শরীর উত্তপ্ত থাকার একটা সম্পর্ক আছে—এটুকু সেই আদিম মানুষরাও বুঝতে পেরেছিল।

এসব আয়োজন ছাড়াও প্রত্যেকটি কবরে মৃতদেহের পাশে নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র সাজিয়ে রাখা হত। এককথায়, এমনভাবে সমস্ত কিছুর বন্দোবস্ত করে রাখা হত যেন মৃতব্যক্তি বেঁচে উঠে কোনো কিছুর অভাব বোধ না করে।

মৃতকে জীবিত হিসেবে কল্পনা করে নিয়ে তার আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সম্ভবমতো সমস্ত বন্দোবস্ত করে রাখার এই যে আদিম মনোভাব—এ মনোভাব এখনো পর্যন্ত আমাদের মধ্যে নানাভাবে টিকে আছে।

রিচুয়াল ও ম্যাজিক

এখন যদি বলি যে সেই পুরাতন প্রস্তরযুগেও মৃতদেহকে কবর দেবার একটা আচার ছিল তাহলে কথাটা হয়তো মেনে নেওয়া চলে। আচার না বলে আমরা বলব রিচুয়াল। অর্থাৎ মৃতদেহকে কবর দেবার সময়ে বিশেষ কতকগুলো নিয়ম পালন করা হত, বিশেষ কতকগুলো অনুষ্ঠান—সব মিলিয়ে রিচুয়াল।

* এখনো পর্যন্ত কবরের ওপরে প্রদীপ বা মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখার রেওয়াজ আছে।

এই রিচুয়ালের মধ্যে ছ'একটি অনুষ্ঠানের দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। একটি হচ্ছে মৃতের ঠাণ্ডা শরীরকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা, আরেকটি হচ্ছে মৃতের শরীরে রক্তের প্রতীক হিসেবে লালরঙের প্রলেপ লাগানো। এই দুটি অনুষ্ঠান কেন? কবরের মধ্যে খাদ্য ও হাতিয়ার মজুদ রাখার তবু যা হোক একটা অর্থ আছে—এ দুটি জিনিস ছাড়া মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু ঠাণ্ডা শরীরকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা কেন? শরীরের ওপর লাল প্রলেপ কেন?

তারা মনে করত, এই দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মৃতব্যক্তি জীবন ফিরে পাবে। মনে করার কারণটা খুবই সহজ। উত্তাপ ও রক্ত হচ্ছে জীবনের প্রতীক। এই দুটি প্রতীককেই কবরের মধ্যে বাস্তব করে তোলা হচ্ছে। অর্থাৎ, জীবনের একটা নকল তৈরি করা হচ্ছে কবরের মধ্যে। আর এই নকল তৈরি করার পেছনে রয়েছে একটি কামনা—মৃতের শরীরে জীবন ফিরিয়ে আনা।

তার মানে, আদিম মানুষের এই কামনাটির মধ্যে রয়েছে একটি অন্ধ বিশ্বাস যে কামনার একটি নকল তৈরি করতে পারলেই কামনা সফল হবে। এই বিশ্বাসের নামই জাদুবিশ্বাস, ইংরেজিতে ম্যাজিক।

খুব মোটা কথায় এখানে বিজ্ঞানের সঙ্গে ম্যাজিকের তফাতটা বলে নেওয়া যেতে পারে। ওপরের দৃষ্টান্তই ধরা থাক। মৃতের শরীরে উত্তাপ সঞ্চার করতে পারলে প্রাণ ফিরে আসবে—এটি একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় কোনো বিজ্ঞানীরও বিশ্বাস থাকতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানী বারকয়েক চেষ্টার পরেই বুঝতে পারবেন যে এই প্রক্রিয়ায় সফল হবার আশা নেই। তখন আর এই বিশেষ প্রক্রিয়ায় তাঁর বিশ্বাস থাকবে না, তিনি অন্য কোনো প্রক্রিয়ার সন্ধান করবেন। কিন্তু জাদুবিশ্বাসী হাজারবার অসফল হবার পরেও এই একটি প্রক্রিয়াকেই আঁকড়ে থাকবে। তার অন্ধ বিশ্বাস কিছুতেই চিড় খাবে না।

তার মানে বিজ্ঞানীর কাছে অসফলতা একটা বাস্তব ঘটনা কিন্তু

জাদুবিশ্বাসীর কাছে তা নয়। জাদুবিশ্বাসী তারপরেও আশা রাখে এবং অন্য কোনো পথে চলতে ভয় পায়। অর্থাৎ, জাদুবিশ্বাস বা ম্যাজিক আশ্রয় পায় মানুষের অসহায়তার মধ্যে। প্রকৃতির নিয়ম তার কাছে যতো বেশি অনাবিষ্কৃত ততোই তার ম্যাজিক-নির্ভরতা।

গুহাচিত্র

এই ম্যাজিক-নির্ভরতার আরেকটি দৃষ্টান্ত গুহাচিত্র। অজন্তা এলোরা ইত্যাদি গুহাচিত্রের কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু এসব গুহাচিত্র নিতান্তই আধুনিককালের। আপাতত আমাদের নজর রয়েছে পুরাতন প্রস্তরযুগে। এই বিশেষ যুগের অনেকগুলো গুহাচিত্র ফ্রান্সে ও স্পেনে আবিষ্কৃত হয়েছে। মধ্যভারতের কয়েকটি গুহা-চিত্রকেও কোনো কোনো প্রত্নবিদ এই বিশেষ যুগের বলে মনে করেন।

স্পেনের আল্তামিরা গুহাটি আবিষ্কৃত হয় ১৮৭৩ সালে। এই গুহার ছাদে লাল আর কালো রঙে আঁকা একপাল বাইসনের ছবি আছে।

পরের আবিষ্কার ১৮৯৫ সালে ফ্রান্সের লা মূথ্ গুহা। স্থানীয় একজন চাষী এই গুহাটিকে মদের গুদাম হিসেবে ব্যবহার করত। গুহাটিকে পরিষ্কার করতে গিয়ে একটি সুড়ঙ্গ-পথের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এই সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে অনেকখানি ভেতরে যাবার পরে চোখে পড়েছিল বাইসন, হরিণ, ঘোড়া ও গণ্ডারের ছবি।

তারপরের আবিষ্কার ১৮৯৬ সালে পেয়ার-নন-পেয়ার গুহা। এটিও ফ্রান্সে। এই গুহার দেওয়ালে দশটি জন্তুজানোয়ারের ছবি পাওয়া গিয়েছে।

তারপর থেকে ফ্রান্সে ও স্পেনে এ-ধরনের প্রায় সত্তরটি গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে। ইতালিতেও দুটি। প্রত্যেকটি গুহার দেওয়ালেই নানা ধরনের জন্তুজানোয়ারের ছবি আঁকা।

প্রত্যেকটি গুহাচিত্রের ক্ষেত্রেই একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে ছবিগুলো আঁকা হয়েছে গুহার একেবারে ভেতরের দিকে। এবং দেওয়ালের এমন এক জায়গায় যা সব দিক থেকে খুবই বেকায়দার। ছবির অবস্থান দেখে বোঝা যায়, ছবি আঁকার জন্যে শিল্পীকে হয় চিত হয়ে শুয়ে থাকতে হয়েছিল কিংবা অন্য কারও কাঁধের ওপরে চেপে বসতে হয়েছিল। কোনো কোনো গুহায় ছবির কাছাকাছি জায়গা থেকে পাথরের প্রদীপ পাওয়া গিয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, প্রদীপের আবছা আলোয় কাজ করতে হয়েছিল শিল্পীকে।

প্রত্যেকটি ছবিতে পাকা হাতের ছাপ। ছবিগুলো দেখে একালের শিল্পীরা পর্যন্ত অবাক হয়েছেন। বহুদিন ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলনের পরেই শিল্পীর হাতের টান এত সূক্ষ্ম ও এত ঋজু হতে পারে। আর পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা খুবই গভীর হলে এমন অল্প কয়েকটি রেখায় এমন আশ্চর্য জীবন্ত ছবি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব।

দেওয়ালের গায়ে আঁকা ছবি ছাড়াও টুকরো টুকরো পাথরের ওপরে আঁকা টুকরো টুকরো ছবিও পাওয়া গিয়েছে। প্রত্নবিদরা মনে করেন, এগুলো হচ্ছে শিল্পীর হাত মক্‌শো করার নিদর্শন। যে-কোনো শিল্পীকে মূল ছবি আঁকার আগে যেমন কতকগুলো রাফ স্কেচ করতে হয়—এও তাই। এ থেকে বোঝা যায়, পুরাতন প্রস্তরযুগের শিল্পীদের কাছে এই ছবি আঁকার ব্যাপারটা খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ। এও হওয়া সম্ভব যে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার যার ওপরে ন্যস্ত থাকত, শিকার ও সংগ্রহ করার কাজ থেকে সে অব্যাহতি পেত।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কী? এতখানি মেহনত করে আর এতখানি অসুবিধে সহ্য করে গুহার এমন সব জায়গায় ছবি আঁকাই বা কেন যেখানে গুহাবাসী কারও নজর পড়ার কথা নয়? এ কি নিছক শিল্পচর্চা?

এ-প্রশ্নের জবাব পাওয়া গিয়েছে হালের পৃথিবীর পিছিয়ে-থাকা মানুষদের দেখে।

উত্তর-আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানরা শিকারে বেরুবার আগে দল বেঁধে নাচে। এই নাচকে বলা যেতে পারে বাইসন নাচ। শিকারীদের মাথায় থাকে বাইসনের মুণ্ডুসমেত চামড়া, কিংবা অভাবে বাইসনের মুণ্ডু আঁকা মুখোশ। প্রত্যেকের হাতে থাকে বর্শা বা তীরধনুক। তারপর শুরু হয় নাচ। নাচটা আর কিছুই নয়, বাইসন শিকারের একটা মহড়া মাত্র। নাচতে নাচতে যখন কেউ ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে তখন তার গায়ে দু'একটা ভোঁতা তীর মারা হয়। তারপর তার ঠ্যাঙ ধরে টানতে টানতে তাকে নিয়ে আসা হয় দলের বাইরে। তার সারা গায়ের ওপরে এমনভাবে ছুরি আস্ফালন করা হয় যেন তার গা থেকে মাংস কেটে নেওয়া হচ্ছে।

এই নাচের অর্থ খুবই পরিষ্কার। শিকারীরা বাইসন শিকার করছে। কিন্তু আগাগোড়া ব্যাপারটাই একটা অভিনয়—একটা নকল সাজানো অর্থাৎ বাস্তবে ঠিক এমনটি ঘটুক—শিকারীদের এই কামনা সফল হবারই একটা ছবি ওরা সকলে মিলে নাচের মধ্যে ফুটিয়ে তুলছে।

আমরা ভালো করেই জানি, বাইসন নাচ নাচলেই শিকারীদের হাতিয়ারের পাল্লায় বাইসনরা এসে পড়বে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু রেড-ইণ্ডিয়ানরা সত্যিই বিশ্বাস করে যে কামনা সফল হবার একটা ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারলেই তাদের কামনা নিশ্চয়ই সফল হবে। এবার তাহলে বোঝা যাচ্ছে, রেড-ইণ্ডিয়ানদের এই নাচটা আসলে নাচ নয়, একটা জাদুক্রিয়া—ম্যাজিক।

প্রায় একই ধরনের ছবি পাওয়া গিয়েছে পুরাতন প্রস্তরযুগের গুহাতেও। বাইসনের মুণ্ডুওলা চামড়া পরে মানুষ নাচছে। এই ছবি সম্পর্কেও একই কথা। এটি নিছক শিল্পচর্চা নয়—ম্যাজিক।

পুরাতন প্রস্তরযুগের মানুষ বিশ্বাস করত যে ম্যাজিক অনুষ্ঠিত হলে খাদ্যের যোগান সম্পর্কে নিশ্চয়তা থাকবে, শিকারের জন্তু-জানোয়াররা সংখ্যায় বাড়বে এবং সাফল্যের সঙ্গে তাদের শিকার করা সম্ভব হবে।

এই বিশ্বাস নিয়েই জাদুবিশ্বাসী শিল্পীরা দেওয়ালের গায়ে রঙে ও রেখায় ফুটিয়ে তুলত গণ্ডার, ম্যামথ, বাইসন, হরিণ ও আরো সব জন্তুজানোয়ার। তারা বিশ্বাস করত, দেওয়ালে যেমন জন্তুজানোয়াররা মূর্ত হয়ে উঠছে বাস্তবেও তেমনি জন্তুজানোয়াররা জঙ্গলের আড়াল থেকে শিকারীর হাতিয়ারের নাগালের মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে।

ম্যাজিকের একটি নিদর্শন

পুরাতন প্রস্তরযুগের যে-সব নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে ম্যাজিকের সাক্ষ্য আরো আছে।

কয়েকটি গুহায় রয়েছে স্তূপ করে সাজানো ভালুকের হাড়। ধরন দেখে মনে হয়, বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে সাজানো। অনুমান করা চলে, ভালুকের হাড়গুলোকে এভাবে সাজিয়ে কোনো একটা আচার পালন করা হয়েছিল। কোনো একটা ম্যাজিক। সেটা কী হতে পারে?

হালের আদিবাসীদের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক, এ-ধরনের কোনো আচার-অনুষ্ঠান তাদের মধ্যে আছে কিনা। কিছুকাল আগেও সাইবেরিয়ার আদিবাসী শিকারীদের মধ্যে একটা উৎসবের প্রচলন ছিল যার নাম 'ভালুক উৎসব'। শিকার করার পর ভালুককে তারা এনে বসাত একটা বেদীর ওপরে, সবচেয়ে সম্মানের আসনে। থাবাদুটোকে মাথার দু'পাশ দিয়ে তুলে দিত আর কয়েকটা হরিণের মূর্তি নৈবেদ্যর মতো সাজিয়ে রাখত ঠিক সামনেটিতে। তারপর কয়েক রাত ধরে চলত উৎসব। শিকারীরা প্রথমে ভালুকটাকে প্রণাম করত, তারপর শুরু হত উদ্দাম নাচ ও গান। নাচ-গানের শেষে ভালুকের গা থেকে মাংস কেটে নিয়ে খাওয়া। অক্ষত অবস্থায় থাকত শুধু মাথা ও সামনের থাবাদুটো, বাদবাকি অংশ কয়েক রাতের মধ্যেই শিকারীদের পেটে চলে যেত।

এই অনুষ্ঠানটিও আসলে একটি ম্যাজিক। নাচ, গান আর প্রণামের মধ্যে দিয়ে ভালুকের কাছে নিবেদন জানানো হচ্ছে, ভালুককে খাওয়া হচ্ছে বলে ভালুক যেন অপরাধ না নেয়, সে যেন ভবিষ্যতেও শিকারীদের প্রতি সদয় থাকে এবং তার যেন বংশবৃদ্ধি হয়।

এবার তাহলে ধরে নেওয়া চলে যে পুরাতন প্রস্তরযুগেও এ-ধরনের কোনো ম্যাজিক অনুষ্ঠিত হত। শিকার ও সংগ্রহের ওপরে পুরোপুরি নির্ভরশীল মানুষের জীবনযাত্রায় এ-ধরনের কোনো একটি ম্যাজিকের প্রচলন নিশ্চয়ই হওয়া সম্ভব। পুরাতন প্রস্তরযুগের গুহায় আবিষ্কৃত নিদর্শনও একই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এসব সাক্ষ্য থেকে সে-যুগের মানুষের ভাবনা-চিন্তা সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে। তখনো পর্যন্ত প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত—এসব দেখে তার মনে শুধু আতঙ্কই জাগে। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সে তখন প্রবল পরাক্রমশালী অতীন্দ্রিয় একটা কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা করে নেয়। এই একটা কিছু যে কী সে-সম্পর্কে তার মনে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। কিন্তু এটুকু সে ভালো করেই জানে যে এই একটা কিছুর ওপরেই তার ভালো-মন্দ সমস্ত নির্ভর করছে। এই একটা কিছুকে বলা যেতে পারে—আত্মা। আত্মা যতোক্ষণ জীবের শরীরে আছে ততোক্ষণ তার জীবন। শরীর থেকে বেরিয়ে এলেই জীবন শেষ। পাথরে সে হোঁচট খেয়েছে সেটা কি তার অসাবধানতার জন্যে? নিশ্চয়ই নয়। পাথরটার মধ্যে দুষ্ট আত্মা ভর করেছে। যে বাইসনটিকে সে শিকার করেছে, সেটা কি তার নিজের কৃতিত্ব? নিশ্চয়ই নয়। বাইসনের আত্মা তার প্রতি সদয় হয়ে বাইসনের শরীরটাকে তার হাতিয়ারের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছে। এদিক থেকে বাইসনের আত্মা তার অন্নদাতা ও রক্ষাকর্তা।

অর্থাৎ সে যে এই পৃথিবীতে বেঁচে আছে তা তার নিজের ক্ষমতায় নয়, বাইসনের দয়ায়। বাইসনকে যতোদিন সে খুশি রাখতে পারবে

ততোদিনই তার খাদ্যের সংস্থান। কাজেই শিকার করার পরেও বাইসনকে সে বেদীতে এনে বসায়, তাকে প্রণাম করে, নেচে গেয়ে তার কাছে সন্তুষ্ট থাকার ও বংশবৃদ্ধি করার কামনা জানায়।

আর এভাবে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত সে ভাবতে আরম্ভ করে যে সে নিজেও বাইসনের বংশধর। বাইসন তার পূর্বপুরুষ।

এমনিভাবে সেই আদিম যুগ থেকেই জন্তুজানোয়ারের নামে বংশপরিচয় শুরু হয়েছিল। কেউ বাইসন বংশ, কেউ হরিণ বংশ, কেউ ভালুক বংশ ইত্যাদি।

এই একই কারণে পোকামাকড় বা গাছগাছড়ার নামেও বংশ-পরিচয় হতে কোনো বাধা ছিল না।

আমাদের দেশের প্রাচীন পুঁথিতে পশুপাখি বা গাছগাছড়ার নামে বংশ-পরিচয় দেবার অজস্র দৃষ্টান্ত আছে।

"ঋগ্বেদে একদল মানুষের উল্লেখ রয়েছে যাদের পরিচয় হল অজ। অজ মানে ছাগল। আর একদল মানুষের খবর পাওয়া যাচ্ছে যাদের নাম হলো শিগ্রু বা সজনে। আবার একদলের নাম হলো মৎস্য।... ব্যাস-বাল্মিকীর রচনা পড়লে মনে হয় হেন জন্তু-জানোয়ার বা গাছ-গাছড়ার নাম বুঝি আমাদের জানা নেই যার পরিচয়ে সেকালের কোনো না কোনো মানুষের দল নিজেদের পরিচয় দিতে দ্বিধা করেছে।...নমুনা হিসেবে মাত্র দু'চারটের উল্লেখ করা যাক: প্যাঁচা, বিছে, কাক, আখ, বেল, শেয়াল, গাধা, গোসাপ, মুরগি, হাতি, ভেড়া, শুয়োর, বাঘ, পঙ্গপাল, হাঁস, মাগুরমাছ, খরগোশ, ঘোড়া, তাল, শাল, বাঁশ, জাফ্রান—আরো কতো!...বৈদিক সাহিত্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি ঋষি-নাম হলো: কৌশিক, মাণ্ডুক্যেয়, গোতম, বৎস, শুনক ইত্যাদি। কৌশিক মানে প্যাঁচা, মাণ্ডুক্যেয় মানে ব্যাঙের বাচ্চা (ব্যাঙাচি?), গোতম মানে ষাঁড়, বৎস মানে বাছুর।...শুনক মানে কুকুর।"*

যে বিশেষ জন্তু বা গাছের নাম থেকে বংশের পরিচয়, তাকে বলা

* দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'লোকায়ত দর্শন' থেকে (পৃঃ ১৩২-৩৩)।

হয় টোটেম। যেমন, বাইসন বংশের সকলেই মনে করে যে বাইসন তাদের পূর্বপুরুষ, অতএব বাইসন এই দলের টোটেম।

এ-আলোচনা আপাতত এ-পর্যন্তই থাক। পরে আবার আমাদের এ-আলোচনা তুলতে হবে।

নাচ ও গান

মানুষ কি করে ভাষা শিখেছে তা আমরা জেনেছি। ভাষা শেখার পেছনেও ছিল বাঁচার তাগিদ, জীবনধারণের কতকগুলো অত্যন্ত বাস্তব কারণ। গোড়ার দিকে অঙ্গভঙ্গিটা ছিল মুখ্য, ভাষা গৌণ। পরে ভাষা মুখ্য, অঙ্গভঙ্গি গৌণ। আমরা যে-ভাষায় কথা বলি তা মূলত আদিম মানুষের ভাষা। অর্থাৎ, পুরাতন প্রস্তরযুগ যদিও অনেককাল আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু সে-যুগের ভাষা এখনো মরে নি। এই ভাষার মধ্যেই রয়েছে সে-যুগের জীবন্ত সব নিদর্শন। ভাষা অনুশীলন করে পুরাতন প্রস্তরযুগ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যেতে পারে।

এখানে একটা বিষয়ে সাবধান করার আছে। আমরা এখন কথা বলতে গিয়ে যে-সমস্ত শব্দ ব্যবহার করি, হুবহু সেই শব্দগুলোই পুরাতন প্রস্তরযুগ থেকে চলে এসেছে—একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। হাজার হাজার বছর পার হয়ে এক একটি শব্দ আমাদের কাছে এসেছে এবং এই সময়ের মধ্যে প্রত্যেকটি শব্দের শুধু যে চেহারা পাল্‌টেছে তা নয়, অর্থও পাল্‌টেছে। এমন বহু শব্দ আছে যার পুরনো অর্থ একেবারেই লোপ পেয়েছে, এখন ব্যবহার হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন অর্থে। কাজেই ভাষাবিদ পণ্ডিত ছাড়া অন্য কারও পক্ষে শব্দের মধ্যে থেকে প্রাচীন প্রস্তরযুগের নিদর্শন খুঁজে বার করা সম্ভব নয়।

এই ভাষাবিদ পণ্ডিতরাই আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে

পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন ভাষাতেই কামনার সঙ্গে গানের খুব নিকট সম্পর্ক। যেখানেই কোনো কামনার কথা উঠছে সেখানেই গান করার কথা বলা হচ্ছে।

পুরাতন প্রস্তরযুগ সম্পর্কে আমরা যতোটুকু আলোচনা করেছি তা থেকেই বলতে পারি, কথাটা পুরোপুরি ঠিক। পুরাতন প্রস্তরযুগে মানুষের কামনা কী ছিল? কামনা ছিল খাদ্যের। খাদ্যের সংস্থান হত কি-ভাবে? না, শিকার ও সংগ্রহের সাহায্যে। শিকার ও সংগ্রহ যাতে প্রচুর পরিমাণে হয় সেজন্যে মানুষ কী করত? না, ম্যাজিকের আশ্রয় নিত। ম্যাজিক জিনিসটা কী? না, সবাই মিলে নেচে-গেয়ে কামনা সফল হবার একটা ছবি ফুটিয়ে তোলা। কাজেই স্বীকার করতে হবে যে সেই পুরাতন প্রস্তরযুগে মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদেই গান গাইত আর নাচত।

কথাটা অন্য দিক থেকেও ভাবা চলে। জীবজগতে মানুষ যে প্রভুত্ব কায়েম করতে পেরেছিল তার কারণ কী? তার কারণ মানুষ দল বাঁধতে পেরেছিল। বাঁচতে চেষ্টা করেছিল একার নয়, সকলের মিলিত চেষ্টায়। জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে এখানেই মানুষের মৌলিক তফাত। জন্তুজানোয়াররা একা ভোগদখল করতে চায়, মানুষ যৌথভাবে। কোনো কোনো অঞ্চলের আদিবাসীদের ভাষায় এখনো পর্যন্ত 'আমার হাতিয়ার' বা 'আমার ঘর' বা এ-ধরনের একক মালিকানাসূচক কোনো ভাষা নেই। একা একা নয়, সকলে মিলে একসঙ্গে শিকার করত বলেই মস্ত মস্ত জানোয়ারকেও শিকার হতে হত মানুষের হাতে।

এবার যদি বলি, যখনই একদল মানুষ একসঙ্গে কোনো কাজ করে তখনই তারা গান গায়, বা, গান গেয়ে গেয়ে তারা কাজ করে—তাহলে একথার প্রমাণ খুঁজবার জন্যে পুরাতন প্রস্তরযুগে না গেলেও চলবে। যেখানেই একদল লোক একসঙ্গে ছাদ পিটছে বা দাঁড় টানছে বা ভারী কোনো মাল টেনে তুলছে সেখানেই কান পাতলে শোনা যাবে—আর কিছু নয়—গান।

কথাটা আবার বলছি, বাঁচার তাগিদ থেকেই যেমন ভাষার জন্ম, তেমনি জন্ম গানের ও নাচের।

বাদ্যযন্ত্র

পুরাতন প্রস্তরযুগে কী ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হত তারও কিছু কিছু নিদর্শন মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে। প্রধান বাদ্যযন্ত্র ছিল হাড়ের তৈরি পাইপ বা ভেঁপু। কোনো কোনো গুহাচিত্রে জাদুকরের হাতেও ভেঁপু দেখানো হয়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ ভেঁপু তৈরি করার কায়দাটা আবিষ্কার করা পুরাতন প্রস্তর-যুগের মানুষদের পক্ষেও কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। তারা ভালো করেই জানত যে বাতাসও একটা বস্তু, বাতাসের ছোঁয়া টের পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, একটা নলের মধ্যে ফুঁ দিয়ে যে-কোনো দিকে বাতাসের একটা ঝাপ্‌টা তৈরি করা চলে, একটা নলের মধ্যে দিয়ে বাতাসকে টেনে নেওয়াও সম্ভব। এ-ধরনের অভিজ্ঞতা থেকেই শেষ পর্যন্ত পুরাতন প্রস্তরযুগের মানুষ ভেঁপু তৈরি করতে পেরেছিল।

আরেক ধরনের বাদ্যযন্ত্র তারা ব্যবহার করত যার নাম বুল্‌-রোরার, অর্থাৎ, যে যন্ত্র থেকে ষাঁড়ের মতো গর্জন বেরোয়। এটি তৈরি হত বল্‌গাহরিণের শিঙ থেকে। এই শিঙটিকে কোনো কিছুতে বেঁধে নিয়ে মাথার ওপরে এমন কায়দায় ঘোরানো হত যে বাতাসের ধাক্কায় গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরিয়ে আসত শিঙের ভেতর থেকে। এখনো পর্যন্ত কোনো কোনো অঞ্চলের আদিবাসীরা এই বিশেষ বাদ্যযন্ত্রটি ব্যবহার করে।

শিঙ থেকে অপর যে বাদ্যযন্ত্রটি তৈরি হয়েছিল তার নাম শিঙা।

লক্ষ করার বিষয় এই যে, যে-কটি বাদ্যযন্ত্রের কথা বলা হল সবই বাজানো হচ্ছে বিশেষ ধরনের নলের মধ্যে দিয়ে বিশেষভাবে বাতাস চালিয়ে। কিন্তু অন্য এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র তৈরি হওয়াও অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। আমরা জানি, পুরাতন প্রস্তরযুগের শেষদিকে

তীরধনুকের চল হয়েছিল। ধনুকের টেনে-ধরা ছিলা আল্‌গা হওয়া মাত্রই টং করে শব্দ করে ওঠে, যাকে বলা হয় টংকার। এই টংকারকেও বাজনা হিসেবে ব্যবহার করা চলে। কাজেই সেই পুরাতন প্রস্তরযুগেও এমন কোনো বাদ্যযন্ত্র তৈরি হয়ে থাকতে পারে যার পরিণত রূপটিকে পরবর্তীকালে আমরা তারের যন্ত্র হিসেবে দেখছি।

পুরাতন প্রস্তরযুগের সীমাবদ্ধতা

পুরাতন প্রস্তরযুগের সীমাবদ্ধতা ছিল এই যে মানুষ নিজের খাদ্য নিজে উৎপাদন করতে জানত না, খাদ্য তাকে কুড়িয়ে আনতে হত বা শিকার করতে হত। অর্থাৎ খাদ্যের ব্যাপারে তার কোনোরকম আত্মনির্ভরতা ছিল না। অবশ্য একথা ঠিক যে তার হাতিয়ার যতো উন্নত হয়েছে ততোই তার শিকার করার ক্ষমতা বেড়েছে, ততোই সে বেশি-বেশি শিকার করতে পেরেছে। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়, এই ছিল তার ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা। খাদ্য উৎপাদন করার ক্ষমতা তখনো তার আয়ত্তের বাইরে, পশুপালন বা চাষবাস করতে তখনো সে শেখে নি। অর্থাৎ, খাদ্যের ব্যাপারে পুরোপুরি অনিশ্চয়তার অবস্থা। প্রকৃতির রাজ্যে তার খাদ্যের যোগানটা নির্ভর করত নিতান্তই কতকগুলো ঘটনার যোগাযোগের ওপরে।

যেমন ধরা যাক হিমযুগের কথা। হিমযুগে বিস্তৃত প্রান্তর জুড়ে ছিল স্তেপ্‌ ও তুন্দ্রা অঞ্চল। মানুষ থাকত গুহার মধ্যে এবং স্তেপ্‌ ও তুন্দ্রা অঞ্চলে শিকার করত ম্যামথ, বাইসন ও বুনো ঘোড়া। মাঝে মাঝে তারা জন্তুজানোয়ারের পথে এমনভাবে ফাঁদ পাতত যে হাজার হাজার জন্তুজানোয়ার মারা পড়ত একসঙ্গে। কাজেই হিমযুগে এমন একটা সময় এসেছিল যখন মানুষের জীবনযাত্রা রীতিমতো সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই সমৃদ্ধ যুগের অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে আছে নানা ধরনের পাথরের হাতিয়ারে ও গুহাচিত্রে। আর

সমৃদ্ধির যুগে সাধারণত যা ঘটে, মানুষের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের কঙ্কাল যতগুলো পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কঙ্কাল এই বিশেষ যুগের।

কিন্তু হিমযুগের স্থায়িত্বের ওপরে মানুষের কোনো হাত ছিল না। একসময়ে হিমযুগ শেষ হয়েছিল আর স্তেপ্ ও তুন্দ্রা অঞ্চল ঢেকে গিয়েছিল ঘন বনজঙ্গলে।

আর এই নতুন অবস্থায় এসে দেখা যায়, হিমযুগের সেই সমৃদ্ধ জীবনযাত্রা আর নেই। গুহা থেকে বেরিয়ে মানুষ খাদ্যের সন্ধানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। নদী, সমুদ্র বা জলার ধারে ধারে আস্তানা পাততে হয়েছে তাকে। শিকার বলতে হরিণ, শুয়োর, খরগোশ আর মাছ। হিমযুগের তুলনায় চরম একটা দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাতে হচ্ছে তাকে।

অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা, ইউরোপের নেয়ানডার্থাল মানুষ পৃথিবী থেকে মোটামুটি লোপ পেয়েছে। অথচ এই নেয়ানডার্থাল মানুষরাই হিমযুগে পাথরের হাতিয়ার দিয়ে ম্যামথ শিকার করত।

পুরাতন প্রস্তরযুগ শেষ হয় চাষবাস ও পশুপালন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে। আজকের দিনের চোখ দিয়ে দেখলে চাষবাস ও পশুপালনকে খুব বড়ো একটা কৃতিত্ব বলে মনে না হতে পারে—কিন্তু সে-যুগে এই দুটি বিদ্যাকে আয়ত্ত করেই মানুষ প্রথম একটা বড়ো রকমের বিপ্লব ঘটিয়েছিল। এই বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই মানুষের ইতিবৃত্তে বন্য যুগের শেষ। যে-সব দল এই বিপ্লবের বাইরে থেকে গিয়েছিল তাদের এখনো পৃথিবীর নানা আনাচে-কানাচে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, বিশেষ করে আমেরিকায় ও অস্ট্রেলিয়ায়। কিন্তু তারা এত হাজার বছর পরেও সেই বন্যই থেকে গিয়েছে। এই বিপ্লবটি না ঘটলে মানুষ হয়ে পড়ত একটি দুর্লভ জীব, সারা পৃথিবীতে কিছুতেই এতখানি আধিপত্য বিস্তার করতে পারত না।

মানুষের এই প্রথম বিপ্লবের পটভূমি ছিল মিশর, মেসোপটেমিয়া ও ভারতবর্ষ।

প্রথম বিপ্লব

পুরাতন প্রস্তরযুগ থেকে নূতন প্রস্তরযুগে মানুষকে যেতে হয়েছে একটি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। বিপ্লব বলতে মানুষের জীবনধারণের উপায়ে বড়ো রকমের একটা ওলোট-পালোট, বেঁচে থাকার সংগ্রামে বড়ো রকমের একটা জয়।

পুরাতন প্রস্তরযুগে মানুষের জীবনযাত্রার ভিত্তি ছিল শিকার ও সংগ্রহ। কিন্তু এই অবস্থায় শেষ পর্যন্ত এমন জায়গায় পৌঁছতে হয় যাকে বলা চলে সংকট। খাওয়ার মতো ফলমূল বা শিকার করার মতো জন্তুজানোয়ার কোনো সময়েই অফুরন্ত হতে পারে না। বরং এই ভয় সব সময়েই থাকে যে ফলমূল সংগ্রহ ও জন্তুজানোয়ার শিকার যদি খুব বেশি মাত্রায় হতে থাকে তাহলে কিছুকালের মধ্যে প্রকৃতির রাজ্যে ফলমূল ও জন্তুজানোয়ারের যোগান ফুরিয়ে যেতে পারে। পুরাতন প্রস্তরযুগের এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে কোনো সময়েই মানুষের সংখ্যা খুব বেশি বাড়তে পারে নি। তার মানে, পুরাতন প্রস্তরযুগে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার ব্যাপারে মানুষের বড়ো রকমের জিত হবার মতো বাস্তব অবস্থাই ছিল না।

এই বাস্তব অবস্থাটি তৈরি হয়েছিল একটি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে।

এই বিপ্লবের প্রধান লক্ষণ দুটি: কৃষি ও পশুপালন। অর্থাৎ খাদ্য-সংস্থানের নতুন দুটি উপায়। এর ফলে মানুষ এসে দাঁড়িয়েছিল একটি নতুন পরিবেশের মধ্যে, যে-পরিবেশ তার নিজেরই হাতে

গড়া। পুরনো পরিবেশে প্রকৃতির ভাণ্ডারটিকে বড়ো কৃপণ বলে মনে হত। নতুন পরিবেশে এসে দেখা গেল সেটি অফুরন্ত। এই অফুরন্ত ভাণ্ডারের চাবিকাঠিটি পাওয়া গিয়েছিল বিপ্লবের ভেতর দিয়ে।

অথচ মানুষের এই প্রথম বিপ্লবটি শুরু হয়েছিল অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবে, কোনো বড়ো রকমের জানানি না দিয়ে। আর যাদের হাতে এই বিপ্লবটি রূপায়িত হয়েছিল তারা নিজেরাও জানত না কী বিপুল এক সম্ভাবনার বীজ অঙ্কুরিত হতে চলেছে।

বিপ্লবের অঙ্কুর

মানুষের প্রথম বিপ্লবটি শুরু হয়েছিল মিশরে, মেসোপটেমিয়ায় ও পাঞ্জাবে। এবারে এই অঞ্চলের দিকে আমাদের সমস্ত মনোযোগ দিতে হবে। পুরাতন প্রস্তরযুগের শেষ পর্যায়টি সম্পর্কে আলোচনা করার সময়ে আমরা চোখ রেখেছিলাম ইউরোপের নেয়ানডার্থাল মানুষের ওপরে। কিন্তু আমরা জানি, নেয়ানডার্থাল মানুষরা পরবর্তী কালে লোপ পেয়েছে। অন্তত আধুনিক মানুষের মধ্যে নেয়ানডার্থাল মানুষের বংশধারা টিকে নেই। বিজ্ঞানীদের ধারণা, আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষরা বাস করত মিশর থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলটির কোনো একটি অংশে।

প্রত্নবিদরা এ-অঞ্চল থেকে এমন প্রচুর নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন যা থেকে বোঝা যায়, শিকার ও সংগ্রহের যুগে এ-অঞ্চলে যারা থাকত তারা সংখ্যার দিক থেকে ইউরোপের তুলনায় কিছুমাত্র কমতি ছিল না। তারাও প্রায় একই পদ্ধতিতে পাথরের হাতিয়ার তৈরি করত ও জন্তুজানোয়ার শিকার করত। তবে একই ধরনের জন্তু-জানোয়ার নয়—ম্যামথ, গণ্ডার ও বল্‌গাহরিণের জায়গায় হাতি, হিপোপটেমাস, বুনো ষাঁড়, বুনো ভেড়া, বুনো গাধা ইত্যাদি।

গাছগাছড়াও ছিল অন্য ধরনের। নানা রকমের ফলের গাছ তো ছিলই, তার ওপরে তৃণভূমিতে জন্মাত বুনো গম ও বুনো বার্লি।

তারপরের ছবিটা কল্পনা করে নিতে হবে। মেয়েরা ফলমূল সংগ্রহ করতে বেরিয়ে বুনো গম বা বুনো বার্লির দানাও চুবড়ি বোঝাই করে নিয়ে আসত। সেই বোঝাই চুবড়ি থেকে বুনো গম বা বুনো বার্লির কয়েকটা দানা আস্তানার আশেপাশের নরম জমিতে পড়ে যাওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু তারপরের ঘটনা যা ঘটেছিল তা শুধু বিচিত্র নয়—সে-যুগের মানুষের কাছে অলৌকিক। ম্যাজিকের মতো মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল ফসলের অঙ্কুর। বা, বলতে পারা যায়, বিপ্লবেরও অঙ্কুর।

ওদিকে পশুকে পোষ মানানোর ব্যাপারেও আগে থেকেই তার খানিকটা হাতেখড়ি হয়েছিল। সে-ঘটনাও গোড়া থেকেই শোনা দরকার।

আজ্ঞাবহ তামিলদার

পুরাতন প্রস্তরযুগের শেষদিকে (বা, সঠিকভাবে বলতে মধ্য প্রস্তরযুগে বা মেসোলিথিক যুগে) মানুষের আস্তানার নিদর্শনের মধ্যে কুকুরের হাড়গোড় পাওয়া গিয়েছে। ধরে নেওয়া চলে যে এইসময় থেকেই কুকুর মানুষের নিত্যসঙ্গী। বা, বলা যেতে পারে আজ্ঞাবহ তামিলদার। শিকারীকে কুকুর যতোখানি সাহায্য করতে পারে এমন আর অন্য কোনো জীব নয়।

পুরো ছবিটা কল্পনা করা চলে। অনেকদিন থেকেই আস্তানার আশেপাশে শেয়াল বা নেকড়ের মতো দেখতে কয়েকটা জীব ঘোরাঘুরি করত। এরাই হচ্ছে আজকালকার কুকুরের পূর্বপুরুষ। দেখা গেল, জীবগুলো এত বেশি হ্যাওটা যে দু'একটা উচ্ছিষ্ট হাড়ের টুকরো পেলেই কৃতার্থ হয়ে যায়।

তারপর শিকারে বেরিয়ে এই জীবগুলোর ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেল। চোখে দেখতে হয় না, কানে শুনতে হয় না, শুধু গন্ধ শুঁকেই নির্ভুলভাবে শিকারের দিগ্‌নির্দেশ করতে পারে। শিকার তীরবিদ্ধ হলে ছুটে গিয়ে মুখে করে তুলে নিয়ে আসে। বিপদের সামান্যতম আভাসেও (যা মানুষের পক্ষে কিছুতেই টের পাওয়া সম্ভব নয়) এরা সচকিত হয় এবং প্রভুকে সতর্ক করে।

এমন আজ্ঞাবহ তামিলদারকে পেয়ে মানুষের ক্ষমতা যেন আরো অনেকখানি বেড়ে গেল।

কুকুরই হচ্ছে মানুষের প্রথম পোষা জীব।

জীবন্ত ভাঁড়ার

উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার দিকে চোখ ফিরিয়ে আনা যাক। এখানকার জঙ্গলে জন্তুজানোয়ার বলতে হাতি, হিপোপটেমাস, বুনো ষাঁড়, বুনো ভেড়া ও এমনি সব জীব। সব রকম জীবই যে সব জায়গায় আছে তা নয়, মোটামুটি এই ধরনের। জীব হিসেবে এরা খুব হিংস্র নয়, কাজেই শিকারীদের হাতে মাঝে মাঝে এরা জীবন্ত ধরা পড়ে যেত। শিকারীরা সেগুলোকে জীবন্ত অবস্থাতেই আস্তানায় নিয়ে এসে বেঁধে রাখত। পোষ মানাবার জন্যে নয়, পরে কোনো সময়ে খাদ্য হিসেবে সদ্ব্যবহার করার জন্যে। অর্থাৎ, শিকারীদের জীবন্ত ভাঁড়ার। দেখা গেল, শুধু জীবন্ত নয়, বাড়ন্তও বটে, দিনে দিনে তাদের পুষ্টি হচ্ছে। শিকারীরা অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাগল। যেদিন শিকার জুটত না সেদিন এই হাতের কাছের শিকারকে বধ করেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হত।

কিন্তু চোখের ওপরে কতগুলো জন্তুজানোয়ার বাঁধা থাকলে তাদের হাবভাব ও চালচলন লক্ষ করতেই হয়। আর তখন অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে গোরু-ছাগল-ভেড়াকে বধ করার চেয়ে জীইয়ে রাখা

বেশি লাভজনক। জীইয়ে রাখলে দিনের পর দিন দুধ পাওয়া যেতে পারে, বছরের পর বছর বাচ্চা। আর শেষ পর্যন্ত যদি খেতেই হয় তো দুধ দেওয়া ও বাচ্চা বিয়োবার ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবার পরে খাওয়াই ভালো। মাংসের পরিমাণও তাতে বাড়ে।

এই অভিজ্ঞতা থেকেই পশুপালনের গোড়াপত্তন।

কৃষিকাজের নিদর্শন

মানুষের প্রথম বিপ্লবের সূত্রপাত এই দুটি কাজের মধ্যে দিয়েই—কৃষি ও পশুপালন। কোনটি আগে, কোনটি পরে, তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারও মতে কৃষি আগে পশুপালন পরে, কারও মতে দুটোই একসঙ্গে, কারও মতে পশুপালন আগে কৃষি পরে। এই আগে-পরের ব্যাপারটার এখনো কোনো নিষ্পত্তি হয় নি। এবং বোধ হয় হওয়া সম্ভবও নয়। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে চাষ করার হাতিয়ার পাওয়া সম্ভব কিন্তু পশুপালন করার জন্যে এমন কোনো হাতিয়ার দরকার হয় না যা টিকে থাকে। কাজেই হাতিয়ার পরখ করে এ-প্রশ্নের জবাব দেবার উপায় নেই।

কৃষিকাজের প্রথম নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে প্যালেস্টাইনের ওয়াদি-এল-নাটুফ গুহা থেকে। এই গুহাবাসীদের নাম দেওয়া হয়েছে নাটুফীয়। প্রত্নবিদরা এই গুহা খুঁড়ে যেমন চকমকি পাথরের হাতিয়ার পেয়েছেন তেমনি পেয়েছেন হরিণের পাঁজরের হাড়ে চকমকি পাথরের দাঁত বসানো কাস্তে। দাঁতগুলোকে পরখ করে বোঝা গিয়েছে যে এগুলো ব্যবহার করা হত ঘাস বা খড় কাটার জন্যে। কিন্তু ঠিক কী ধরনের ঘাস কাটা হত—বুনো ঘাস না চাষ-করা ঘাস—তার কোনো হদিশ পাওয়া যায় নি।

এখানে একটা কথা বলার আছে। অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সব দেশেই ঘাস কাটার জন্যে যে হাতিয়ারটির ব্যবহার,

তা হচ্ছে কাস্তে। আর এই কাস্তের চেহারা চিরকাল একই রকম থেকে গিয়েছে। ভেড়ার চোয়ালের হাড়ের (দাঁত সমেত) মতো। এমনকি কোথাও কোথাও এমন কাস্তেও পাওয়া গিয়েছে যাতে সত্যিকারের ভেড়ার দাঁত বসানো। এই ব্যাপারটি দেখে কোনো কোনো বিজ্ঞানী সিদ্ধান্ত করেছেন যে কৃষিকাজের আগে পশুপালন শুরু হয়েছিল, কারণ ভেড়াকে সামনে থেকে লক্ষ করার পরেই এ-ধরনের কাস্তে তৈরি করার ধারণা সম্ভব। আবার অন্যপক্ষের যুক্তিটাও কম জোরালো নয়। তাঁরা বলেছেন, পশুপালন করতে হলে পশুর খাদ্যের যোগান থাকা চাই। গৃহপালিত পশুর খাদ্য হচ্ছে ঘাস বা খড়—কৃষি না-জানা মানুষের পক্ষে ঘাস বা খড়ের যোগান দেওয়া সম্ভব নয়।

নাটুফীয়দের আলোচনায় ফিরে আসি। এরা বনজঙ্গলে শিকার করত আর নদীতে মাছ ধরত। মাছ ধরার জন্যে ব্যবহার করত হাড়ের তৈরি বঁড়শি আর হার্পুন। যতদূর জানা গিয়েছে নাটুফীয়দের আগে আর কেউ বঁড়শি ব্যবহার করে নি।

এ ছাড়াও নাটুফীয়দের গুহা থেকে পাওয়া গিয়েছে কতকগুলো অতি-খুদে হাতিয়ার—যাদের বলা হয় মাইক্রোলিথ। দেখেই বোঝা যায় এই হাতিয়ারগুলোকে স্পষ্ট একটি জ্যামিতিক আকার দেওয়া হয়েছে এবং বিশেষ কায়দায় ঠুকে ঠুকে ধারালো করা হয়েছে। এমন কি কোনো কোনো হাতিয়ার দু'দিক থেকে ধার করা।

এখানে একটা বিষয়ে সাবধান করার আছে। ধ্বনিগত মিলের জন্যে মনে হতে পারে, মাইক্রোলিথ মেসোলিথিক যুগের হাতিয়ার। তা কিন্তু নয়। হিমযুগের ইউরোপেও মাইক্রোলিথ ব্যবহার করা হত, আবার নূতন প্রস্তরযুগ শুরু হবার অনেক পরেও মাইক্রোলিথের ব্যবহার বন্ধ হয় নি। পুরাতন প্রস্তরযুগের একটি মারাত্মক অস্ত্রই ছিল মাইক্রোলিথ লাগানো বর্শা। কাজেই শুধু মাইক্রোলিথ থেকে বয়সের মাপ সম্পর্কে কোনো ধারণা করা সম্ভব নয়। যেমন, ভারত-বর্ষের বিন্ধ্য পর্বত থেকে মাইক্রোলিথ পাওয়া গিয়েছে; এ থেকে

সিদ্ধান্ত করা চলে না যে এই হাতিয়ারগুলো পুরাতন প্রস্তরযুগের বা নূতন প্রস্তরযুগের বা দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থার।

নাটুফীয়দের বয়সের হিসেব পাওয়া গিয়েছে ভূ-বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে। মাটির কোন স্তরের হাতিয়ার এবং কতখানি গভীর স্তরের —তা দেখেই তাঁরা বলে দিতে পারেন হাতিয়ারগুলো কত প্রাচীন। এই হিসেব মোটামুটি নির্ভুল। অর্থাৎ, আমরা ধরে নিতে পারি যে নাটুফীয়দের গুহা থেকে পাওয়া কাস্তেই বয়সের দিক থেকে সবচেয়ে পুরনো। ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ সালেরও আগেকার সময়ের।

কিন্তু যদি ধরেও নেওয়া যায় যে নাটুফীয়রা অল্পবিস্তর চাষের কাজ জানত তাহলেও সেটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হওয়ার চেয়ে বেশি নয়। কারণ, আমরা যে-বিপ্লবের কথা বলেছি, যে-বিপ্লব মানুষের জীবনধারণের উপায়ের মধ্যে বড়ো রকমের ওলোট-পালোট এনেছিল—তার কোনো নিদর্শন নাটুফীয়দের মধ্যে নেই। প্রত্নবিদদের মতে মানুষের এই বিপ্লবের পূর্ণাঙ্গ চেহারা প্রথম ফুটে উঠেছিল পৃথিবীর তিনটি অঞ্চলে—নীলনদের দেশ মিশরে, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর দেশ মেসোপটেমিয়ায় (এখন যে-দেশের নাম ইরাক) এবং সিন্ধুনদের দেশ পাঞ্জাবে। আমরাও বিপ্লবকে অনুধাবন করার জন্যে এই তিনটি অঞ্চলের দিকেই তাকাব। কিন্তু তার আগে কিছুটা আলোচনা করা যাক কেন এই তিনটি বিশেষ অঞ্চলেই বিপ্লব হয়েছিল আর সেই বিপ্লবের লক্ষণই বা কী কী।

আঞ্চলিক বিশেষত্ব

যে তিনটি দেশকে বিপ্লবের জন্মভূমি বলেছি তাদের আঞ্চলিক বিশেষত্ব কী?

মানচিত্রের দিকে তাকালে বোঝা যাবে, এই তিনটি দেশের

অবস্থান পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সমাক্ষরেখার মধ্যে। আবহাওয়ার দিক থেকে এই অঞ্চলটি আজকের দিনে সবচেয়ে শুকনো আর সবচেয়ে গরম। বৃষ্টি খুবই কম আর গ্রীষ্মের তাপ প্রচণ্ড। ফলে গোটা অঞ্চলটি মরুভূমির দেশ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনটি মস্ত মস্ত নদী রয়েছে এই অঞ্চলে। তাছাড়া মরুভূমিও সমতল ও একটানা নয়। মধ্যে রয়েছে হুটো সমুদ্র (লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগর) ও অনেকগুলো পর্বতমালা। অর্থাৎ, মরুভূমিপ্রধান দেশ হলেও ভূ-প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে। আবার বৈচিত্র্য এমন নয় যে এক অংশ থেকে আরেক অংশ একেবারে বিচ্ছিন্ন; বরং ঠিক উল্‌টো। এত বেশি যোগাযোগ থাকা সম্ভব যে গোটা অঞ্চলটিকে আফ্রোশিয়া বললেও ভুল হয় না।

বৃষ্টিপাত এত কম যে নদীর উপত্যকা অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও মানুষের পক্ষে বাস করা সম্ভব নয়।

কিন্তু আমরা যে-সময়ের কথা আলোচনা করছি তখনকার অবস্থা ছিল অন্য রকম। উত্তর ইউরোপ তখনো বরফে ঢাকা। আল্পস ও পীরেনীজ পর্বতের চুড়োয় হিমবাহ জমে আছে, আর আট্‌লান্টিকের ঘূর্ণিবাত্যা প্রচুর বর্ষণ ঘটাচ্ছে সাহারায়, লেবাননে, মেসোপটেমিয়ায় আরবে, পারস্যে ও ভারতবর্ষে। শুধু প্রচুরই নয়, সারা বছর ধরে বর্ষণ। ভূতত্ত্ববিদরা গোটা অঞ্চলটিতে অতীতকালের প্রচুর বর্ষণের নানা সাক্ষ্য খুঁজে পেয়েছেন। মরুভূমির মধ্যে অনেক শুকিয়ে যাওয়া খালের রেখা আজো একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। এ অবস্থায় আশা করা চলে যে গোটা অঞ্চলটিতে একদিকে যেমন ছিল শ্যামল তৃণভূমি, অন্যদিকে ঘন বনজঙ্গল। জন্তুজানোয়ারও ছিল অন্যরকম। উষ্ণমণ্ডলীয় জন্তুজানোয়ার—যেমন, হাতি, হিপোপটেমাস, বুনো ষাঁড়, বুনো ভেড়া, বুনো ছাগল, বুনো গাধা, সিংহ, ভালুক এবং এ-ধরনের আরো সব জীব। এখন যেখানে সাহারা মরুভূমি সেখানেও যে সে-সময়ে এ-ধরনের জন্তুজানোয়াররাই থাকত তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে পাথরে খোদাই করা সে-যুগের ছবি থেকে।

এবং এই অঞ্চলের তৃণভূমিতে বুনো অবস্থায় জন্মাত এমের বা ডিন্‌কেল জাতীয় তৃণ। এরাই হচ্ছে আমাদের গম ও বার্লির আদি চেহারা। আর জমি ছিল এত উর্বরা যে এই এমের ও ডিন্‌কেলের বীজ ছড়িয়ে দিলে প্রায় বিনা মেহনতেই ফসল পাওয়া সম্ভব ছিল। কাজেই এই বিশেষ অঞ্চলেই যে ব্যাপকভাবে চাষের কাজ শুরু হয়েছিল তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

আবার যে-ধরনের জন্তুজানোয়ার এ-অঞ্চলে বাস করত তাদের আমরা আজকালকার দিনেও দেখতে পাই, একই অঞ্চলে না হোক নানা অঞ্চলে। যে-সব পশুকে মানুষ পোষ মানিয়েছে তাদের আদি বাসভূমি ছিল এই অঞ্চলটি। কাজেই পশুপালন শুরু হবার মতো বাস্তব অবস্থা এই অঞ্চলেই তৈরি হয়েছিল।

এমের ও ডিন্‌কেল

এমন কিছু গাছগাছড়া আছে যা থেকে মানুষের সারা বছরের খাদ্যের যোগান পাওয়া সম্ভব। যেমন, ধান, গম, বার্লি, জনার, ভুট্টা, মিষ্টি আলু ইত্যাদি। আজকের দিনেও এসব গাছগাছড়া থেকেই আমরা সারা বছরের খাদ্য তুলি। তবে গম ও বার্লির চাষ সেই গোড়া থেকেই একটা বড়ো রকমের ভূমিকা নিয়েছে। এমনকি একথাও বলা যেতে পারে যে মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে যে-সভ্যতা গড়ে তুলেছে তার ভিত্তি হচ্ছে গম ও বার্লির চাষ।

খাদ্য হিসেবেও এই দুটি অত্যন্ত পুষ্টিকর। অন্যান্য শস্যের তুলনায় এদের ফলন পরিমাণের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি। চাষের হাঙ্গামা কম। সারা বছর মজুদ করে রাখতে কোনো অসুবিধে নেই। অবশ্য বীজ বুনতে ও আগাছা পরিষ্কার করতে কিছুটা মেহনত দরকার, ফসল কাটার সময়েও অনেকগুলো হাত একসঙ্গে হওয়া দরকার—কিন্তু এসব ঝামেলা সারা বছরের নয়। বীজ বোনার

আগে ও পরে কয়েকটা মাস এমন যায় যখন কিছুই করার নেই। কাজেই এ-ধরনের চাষের ওপরে নির্ভর করতে পারলে সারা বছরে অবসর অনেক বেশি। আর এই অবসরের সময়ে আরো নানা ধরনের কাজ করা চলে।

মিশরে, মেসোপটেমিয়ায় ও ভারতবর্ষে যে যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটেছিল তার সূচনায় ছিল এই গম ও বার্লির চাষ।

গম ও বার্লি—দুটো ফসলেরই আদি রূপ ছিল কয়েক জাতের বন্য তৃণ। অবশ্য সেই আদি রূপটি আর নেই। চাষ করার জন্যে বীজ বাছাই করা হয়েছিল আর চাষের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন জাতের বীজের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটেছিল—ফলে শেষ পর্যন্ত যে ফসল পাওয়া গিয়েছে তার দানাগুলো যেমন বড়ো, তেমনি তা খাদ্য হিসেবেও অনেক বেশি পুষ্টিকর। গমের আদি চেহারায় দু-ধরনের বন্য তৃণের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ডিন্‌কেল ও এমের। পাহাড় অঞ্চলে এরা জন্মায়। ডিন্‌কেল পাওয়া গিয়েছে ক্রিমিয়ায়, এশিয়া মাইনরে ও ককেসাসে। এমের পারস্যে, মেসোপটেমিয়ায়, সিরিয়ায় ও প্যালেস্টাইনে।

আগে বলেছি, এখনকার জলবায়ুর সঙ্গে সে-যুগের জল-বায়ুর কোনো মিল নেই। আর কোন অঞ্চলে কী কী গাছগাছড়া জন্মাবে তা পুরোপুরি নির্ভর করে আঞ্চলিক জলবায়ুর ওপরে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, এমের জাতের গমের চাষ প্রথম শুরু হয়েছিল উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায়।

বুনো বার্লিও দু'জাতের। এরাও পাহাড় অঞ্চলে জন্মায়। এদের পাওয়া গিয়েছে উত্তর আফ্রিকায়, প্যালেস্টাইনে, এশিয়া মাইনরে, ট্রান্সককেসিয়ায়, পারস্যে, আফগানিস্তানে ও তুর্কিস্তানে। এখানেও সেই একই কথা। এখনকার জলবায়ুতে কোন অঞ্চলে কী কী জংলা ঘাস জন্মাচ্ছে তা থেকে সাত হাজার বছর আগেকার সময় সম্বন্ধে কোনো ধারণা করা চলে না।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, বার্লির চাষ প্রথম শুরু হয়েছিল আবিসিনিয়ায় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়।

এখানে বলে রাখা দরকার যে কোন ফসলের চাষ কোন অঞ্চলে প্রথম শুরু হয়েছিল—একটি বিশেষ অঞ্চলে, না, একসঙ্গে অনেকগুলো অঞ্চলে—তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে এই মতভেদ নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে। অন্তত আমাদের আলোচনার পক্ষে গম ও বার্লির চাষ প্রথম কোথায় শুরু হয়েছিল তাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। যেমন নাটুফীয়দের গুহা থেকে কাস্তে পাওয়াটাকে আমরা নিতান্তই একটি ঘটনার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই নি। কিন্তু গম ও বার্লির চাষ যে-বিপ্লবটির সূত্রপাত করেছিল তার সবচেয়ে প্রাচীন সাক্ষ্য কোন কোন অঞ্চল থেকে পাওয়া গিয়েছে—এ-সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই। আমাদের কাছে এইটেই সবচেয়ে বড়ো খবর।

সফল বিপ্লবের লক্ষণ

আগে এক জায়গায় বলেছি, বেঁচে থাকার সংগ্রামে মানুষের বড়ো রকমের জিত হবার লক্ষণ এই যে সে-সময়ে মানুষের সংখ্যা যেন আচমকা লাফ দিয়ে বেড়ে যায়। মানুষের প্রথম বিপ্লব সফল হবার পরেও এই লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। তার মানে এই নয় যে সত্যি সত্যিই জানা গিয়েছে সে-সময়ে কোন দেশে কতজন মানুষ বাস করত আর আগেকার তুলনায় মানুষের সংখ্যা কতটা বেড়েছিল। প্রত্নবিদরা নানা পরোক্ষ নিদর্শন থেকে সফল বিপ্লবের এই লক্ষণটি টের পেয়েছেন।

অবশ্য সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলেও ব্যাপারটাকে খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। চাষের কাজ শুরু হবার পরেই মানুষ প্রায় একটা অফুরন্ত খাদ্যভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল। মানুষের সংখ্যা যতো বেশিই হোক না কেন, খাদ্যের অকুলান হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। সমাধানটা ছিল খুবই সহজ—যতো বেশি মানুষ ততো বেশি জমিতে চাষ। শিকার ও সংগ্রহের ওপরে যখন নির্ভর

করতে হত তখন কোন এলাকায় কতজন মানুষের খাদ্যসংস্থান হতে পারে তার একটা নির্দিষ্ট সীমা ছিল—সেই সীমা কিছুতেই ছাড়িয়ে যাওয়া যেত না। চাষের কাজ শুরু হবার পরেই মানুষ এক অসীম সম্ভাবনার জগতে মুক্তি পেয়েছিল।

চাষের কাজের আরেকটা স্থবিধে এই যে বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও একাজে সাহায্য করতে পারে। এতদিন পর্যন্ত বাচ্চারা একটা বোঝার মতো হয়ে থাকত। জোয়ান বয়স না হওয়া পর্যন্ত তাদের দিয়ে বিশেষ কোনো কাজ হত না, শিকার তো নয়ই। চাষের কাজ শুরু হতে দেখা গেল, বাচ্চাদের দিয়ে অনেকগুলো কাজ করিয়ে নেওয়া চলে—যেমন, আগাছা পরিষ্কার করা, পাখি তাড়ানো, জন্তু-জানোয়ারকে ক্ষেতে ঢুকতে না দেওয়া, ইত্যাদি। আর যদি গোরু-ছাগল-ভেড়া থাকে তো তাদের দেখাশোনা করার ভার পুরোপুরি বাচ্চাদের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া চলে।

এমনি যখন অবস্থা তখন মানুষের সংখ্যা তো বাড়বেই।

প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকেও এই কথাটি বেরিয়ে আসে। যেমন ধরা যাক, ফায়ুম অঞ্চল থেকে পুরাতন প্রস্তরযুগের অজস্র হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এ থেকেই কি ধরে নেওয়া চলে যে এসব হাতিয়ার যারা ব্যবহার করেছিল তাদের সংখ্যাও ছিল অজস্র? যদি আমরা মনে রাখি যে হাতিয়ারগুলো এভাবে জড়ো হতে বেশ কয়েক হাজার বছর সময় লেগেছিল তাহলে কিন্তু বরং উল্‌টো সিদ্ধান্তই হয়। হাতিয়ারধারীদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

কিন্তু নীলনদের উপত্যকা থেকে প্রত্নবিদরা এমন নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন যা থেকে বোঝা যায় যে একসময়ে সেখানে অনেকগুলো সমৃদ্ধ চাষী-গ্রাম ছিল। গ্রামগুলোর পত্তন প্রায় একই সময়ে আর খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সাল পর্যন্ত গ্রামগুলোর বাড়বৃদ্ধি হয়েছিল। এ থেকে নিশ্চয়ই এ-সিদ্ধান্ত করা চলে যে পুরাতন প্রস্তরযুগের তুলনায় এ-যুগে মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

নীলনদের উপত্যকা থেকে অনেকগুলো গ্রাম ও বসতির চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে—এ থেকে সঙ্গে সঙ্গে যদি এই সিদ্ধান্তটিও করা হয় যে চাষের কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যাযাবর জীবনেরও শেষ তাহলে কিন্তু ভুল করা হবে। চাষী হওয়া মানেই একজায়গার স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া নয়। অন্তত গোড়ার দিকে তো নয়ই। গোড়ার দিকে যেভাবে চাষ করা হত তাকে বলা হয় বাগিচা-চাষ। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, একটুকরো জমিকে পরিষ্কার করে নিয়ে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে নেওয়া হত। কোদাল বলতে আজকালকার কোদাল নয়; একখণ্ড কাঠের সঙ্গে একটা ছুঁচলো পাথরের ফলক দড়ি দিয়ে বাঁধা। আবার এই অস্ত্রটিও যে চাষ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বানাতে পারা গিয়েছিল তা নয়। গোড়ার দিকে একটা লাঠি
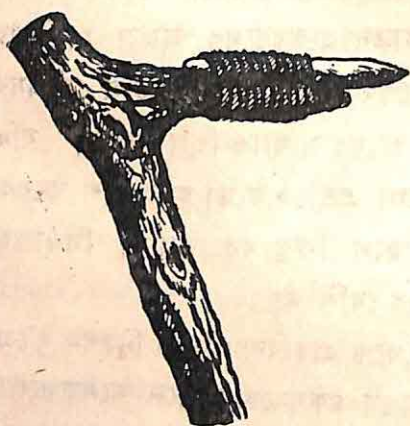
কোদাল

গাঁতি (হরিণের শিঙের)

বা শিঙ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মাটিকে একটু আল্‌গা করে নেওয়া হত মাত্র। জমি তৈরি করা বলতে এর বেশি কিছু নয়। তারপরেই বীজ ছড়িয়ে দেওয়া। চাষ বলতে এই। বীজ থেকে আপনা থেকে অঙ্কুর

গজাত, অঙ্কুর থেকে ফসল। পরের বছর আবার ঠিক সেই একই জমিতে একইভাবে বীজ ফেলা হত। একটা বছর জমিকে ফেলে রাখা বা জমিতে সার দেওয়া—এসবের প্রশ্নই ছিল না। এই হচ্ছে বাগিচা-চাষ (garden-culture)। আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যে কোথাও কোথাও এখনো বাগিচা-চাষের চল আছে। ফল যা হবার তাই হত। কয়েক বছর পরে জমির ফলন-ক্ষমতা শেষ হয়ে যেত, তখন জমিতে যতোই বীজ ছড়ানো হোক না কেন ফসল আর বিশেষ পাওয়া যেত না। তখন সেই জমিকে বাতিল করে দিয়ে শুরু হত পাশের জমিতে একই ধরনের বাগিচা-চাষ। আরো কয়েক বছর পরে পাশের জমিকেও বাতিল করতে হত। এইভাবে আশেপাশের সমস্ত জমি যখন বাতিলের পর্যায়ে পড়ত তখন আস্তানা পাততে হত নতুন কোনো অঞ্চলে, যেখানকার জমিতে আগে কখনো চাষ হয় নি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, চাষীকেও সময়বিশেষে যাযাবর হতে হয়। এমনকি আজকের দিনেও আফ্রিকায় ও অস্ট্রেলিয়ায় এ-ধরনের যাযাবর চাষী আছে।

পলিমাটির দেশে

আবার কোথাও কোথাও বাস্তব অবস্থা এমনও হতে পারে যে বাগিচা-চাষ করা সত্ত্বেও জমিকে বাতিল করতে হয় না।

এশিয়ায় ও আফ্রিকায় এমন সব অঞ্চল আছে যেখানে প্রায়ই পাহাড় থেকে ঢল নামে, এমন সব নদী-উপত্যকা আছে যা প্রতি বছর নদীর কূল-ছাপানো বন্যায় ডুবে যায়। এসব অঞ্চলে অনায়াসেই বাগিচা-ধরনের চাষ হতে পারে। বৃষ্টির জলের জন্যে অপেক্ষা করে থাকতে হয় না, ঢল বা বন্যার জলই মাটিকে নরম করে তোলে।

শুধু তাই নয়, অন্য একটা মস্ত ব্যাপারও ঘটে। বন্যার জল পুরনো জমির ওপর নতুন পলিমাটির পুরু একটি আস্তর ছড়িয়ে দেয়।

আগের বছরের ফলনের সময়ে পুরনো জমির যে সারাংশ খরচ হয়ে গিয়েছিল তা আবার পুরোপুরি পাওয়া যায় এই নতুন পলিমাটির আস্তরের মধ্যে। এভাবে প্রতি বছরেই নতুন পলিমাটি এসে জমে আর পুরনো জমির খরচ-হয়ে-যাওয়া সারাংশের ঘাটতি পুরিয়ে যায়। ফলে একই জমিতে বছরের পর বছর চাষ করা চলে।

নীলনদের উপত্যকাটি এমনি একটি অঞ্চল। প্রতি বছর শরৎ-কালে হুবহু ঠিক একই সময়ে নীলনদে বন্যা আসে। এই বন্যার জল থেকে যে পলিমাটি পড়ে তা প্রতি বছর নতুন করে উর্বরা করে তোলে জমিকে। চাষের জন্যে যেটুকু করা দরকার তা হচ্ছে জল সরে যাবার পরে নরম পলিমাটির ওপরে বীজ ছড়িয়ে দেওয়া। নীলনদের উপত্যকায় এভাবেই চাষের কাজ শুরু হয়েছিল।

একদল মানুষকে কল্পনা করা যাক, শিকার ও সংগ্রহ যাদের খাদ্য-সংস্থানের উপায়। তাদের সংগ্রহের মধ্যে বুনো গম ও বুনো বার্লিও নিশ্চয়ই থাকত। সেই সংগ্রহ করে আনা বুনো গম বা বুনো বার্লির একমুঠো দানা নরম পলিমাটির ওপরে ছড়িয়ে দিলে আপনা থেকেই অঙ্কুর গজাত। এজন্যে আলাদা কোনো মেহনত করতে হত না। বুনো গম বা বুনো বার্লির ফসলে রূপান্তরিত হওয়ার এই হচ্ছে ইতিহাস।

আগে বলেছি, সে-সময়ে উত্তর-আফ্রিকায় ও পশ্চিম এশিয়ায় এখনকার চেয়ে বেশি পরিমাণে বৃষ্টি হত। কাজেই পলিমাটি না হলেও ফসল ফলানো অসম্ভব ছিল না। বৃষ্টিভেজা মাটিতেও বীজ ছড়িয়ে দিলে অঙ্কুর ওঠে। এ-অবস্থায় ফসল ফলানোর ব্যাপারটা শুধু নীলনদের উপত্যকাতেই আবদ্ধ ছিল না, নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্তত বাগিচা-ধরনের চাষ যে প্রায় একই সময়ে পশ্চিম এশিয়ার নানা অঞ্চলে শুরু হয়েছিল এমন বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

অবশ্য নীলনদের উপত্যকাতেও ফসল ফলানোর ব্যাপারটা যতো সহজভাবে বর্ণনা করা হল ততো সহজভাবে করা যায় নি। প্রতি

বছরে বন্যা হয় এমন একটি অঞ্চলে জলাভূমি থাকাটাই স্বাভাবিক। নীলনদের উপত্যকাতেও তা ছিল। আর ছিল নলখাগড়ার জঙ্গল ও জন্তুজানোয়ারের উৎপাত। ফসল ফলাবার আগে জলাভূমি ও জঙ্গল পরিষ্কার করে নিতে হয়েছিল। জন্তুজানোয়ারকে তাড়াতে হয়েছিল।

পশুপালন

নূতন প্রস্তরযুগের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছি। কৃষি ও পশু-পালন। উত্তর-আফ্রিকায় ও পশ্চিম এশিয়ায় কৃষিনির্ভর গ্রামের সবচেয়ে পুরনো যে-সব নিদর্শন প্রত্নবিদরা পেয়েছেন সেখানে দেখা গিয়েছে যে কৃষির সঙ্গে সঙ্গে পশুপালনের চল ছিল। পালিত পশুর মধ্যে প্রধান—ছাগল ও ভেড়া। তাছাড়া অন্যান্য শিঙওলা পশু। শিঙ নেই এমন পশুদের মধ্যে শুয়োর, উট, এবং একটু পরের দিকে মুরগি। পশুপালন যেখানেই শুরু হয়ে থাকুক সেখানকার জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে বুনো ছাগল বা বুনো ভেড়া নিশ্চয়ই ছিল। বুনো ছাগল ও বুনো ভেড়া পাওয়া যেতে পারত শুকনো পাহাড় অঞ্চলে, সম্ভবত পীরেনীজ থেকে হিমালয় পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে। বুনো ভেড়ার মধ্যে আবার তিনটে জাত—মুফ্লন, য়ুরিয়াল ও আর্গল। এক-একটা জাতের এক-এক অঞ্চলে বাস। আফ্রিকায় কোনো জাতের বুনো ভেড়া পাওয়া যায় না। মিশরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে আছে য়ুরিয়াল জাতীয় ভেড়া। কিন্তু য়ুরিয়াল জাতীয় ভেড়ার আদি বাসের জায়গা হচ্ছে তুর্কীস্তান, আফগানিস্তান ও পাঞ্জাব। কাজেই পুরাবিদদের ধারণা, কৃষি ও পশুপালন একই সঙ্গে যে-সব অঞ্চলে শুরু হয়েছিল, মিশর তার সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন নাও হতে পারে। অবশ্য, গোরু-মহিষ জাতীয় যে-সব পশুকে আমরা গোয়ালে পুরেছি তাদের পূর্বপুরুষরা সব অঞ্চলেই ছিল।
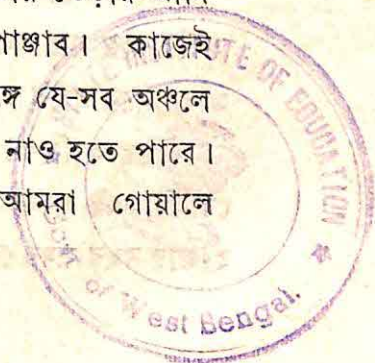
পশুপালন ঠিক কোন অবস্থার মধ্যে শুরু হয়েছিল—সে-বিষয়ে আলোচনা তোলা যেতে পারে।

মিশর, মেসোপটেমিয়া ও পাঞ্জাবের আঞ্চলিক বিশেষত্বের কথা বলতে গিয়ে আবহাওয়ার কথা বলেছি। এখনকার আবহাওয়ার সঙ্গে সেই আবহাওয়ার কোনো মিল নেই। তবে সেই আবহাওয়ার মধ্যেও পরিবর্তনের একটা লক্ষণ আস্তে আস্তে ফুটে উঠছিল। আমরা জানি, ইউরোপের হিমযুগ তখন শেষ হয়েছে। স্তেপ্ ও তুন্দ্রা অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করেছে, আল্পস ও পীরেনীজের চুড়োয় হিমবাহ হাল্‌কা হচ্ছে। এ অবস্থায় স্বাভাবিক কারণেই আট্‌-লান্টিকের ঘূর্ণিবাত্যা দিক-পরিবর্তন করতে শুরু করে। ফলে উত্তর আফ্রিকায় ও পশ্চিম এশিয়ায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমতে থাকে।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি, যে-অঞ্চলটিতে আবহাওয়ার এই পরিবর্তন ঘটছিল সেই অঞ্চলের মানুষই সবার আগে খাদ্য-সংগ্রহের যুগ থেকে বেরিয়ে এসে খাদ্য-উৎপাদনের যুগে পা দিয়েছিল। অর্থাৎ, এই বিশেষ অঞ্চলটিতেই পাওয়া যেত বুনো গম, বুনো বার্লি আর পোষ মানাতে পারার মতো জন্তু-জানোয়ার।

কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যদি আস্তে আস্তে কমতে থাকে তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? গোড়ার দিকে মাঝে মাঝে খরা হবে, তারপরে বিশেষ বিশেষ এলাকায় সেই খরার অবস্থাই যেন জেঁকে বসবে। অর্থাৎ ঘাস ও জঙ্গল মুছে গিয়ে জেগে উঠবে মরুভূমি।

এই অবস্থা বেশ কিছুদিন চলার পরে শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল। অর্থাৎ, মস্ত মস্ত এলাকা আস্তে আস্তে হয়ে উঠেছিল মরুভূমি। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে এক-একটি মরূদ্যান।

উত্তর-আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়াকে হালে আমরা যে-চেহারায় দেখছি, এই হচ্ছে তার শুরু। পুরো চেহারাটি ফুটে উঠতে কয়েক হাজার বছর সময় লেগেছে।

এবারে জীবজগতের দিকে তাকানো যাক। বৃষ্টিপাত যতোই কমে, মস্ত মস্ত এলাকা যতোই মরুভূমি হয়ে ওঠে ততোই তৃণভোজী পশুরা এসে জড়ো হয় এমন সব অঞ্চলে যেখানে নদী ও ঝরণা আছে, যেখানে ঘাস ও জল পাওয়া যায়। অর্থাৎ এমন সব অঞ্চলে যাকে বলা হয় মরূদ্যান।

কিন্তু মরূদ্যানে শুধু তৃণভোজী পশুরাই আসে না, আসে সিংহ বা নেকড়ের মতো হিংস্র পশুরাও, আসে শিকারী মানুষও। জলের সন্ধানে সকলকে একই জায়গায় আসতে হচ্ছে। এই অবস্থায় তৃণভোজী পশুদের আশ্রয় ও ভরসা দিতে পারে একমাত্র মানুষ। মানুষটি যদিও শিকারী কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাষীও। মাঠ থেকে ফসল কেটে নেবার পরে সেই মাঠে তৃণভোজী পশুদের চরতে দিতে তার আপত্তি হবার কথা নয়। এমনকি পশুর খাদ্য হিসেবে কিছু খড়ের সংস্থানও তার আছে। আর ইচ্ছে করলে দু'এক মুষ্টি ফসলও কি সে আর দিতে পারে না!

এভাবেই শুরু। বুনো ভেড়া আর বুনো ষাঁড় ফসল-কেটে-নেওয়া মাঠে চরতে লাগল। এরা এত দুর্বল যে দৌড়ে পালাতে অক্ষম। এত রোগা যে এদের শিকার করতে হাত ওঠে না। ফলে এদের হাবভাব চালচলনকে লক্ষ করতে হয়। সিংহ আর নেকড়ের হাত থেকে এদের বাঁচাতে হয়, আর শেষ পর্যন্ত ভাঁড়ার থেকে বাড়তি ফসলের কিছুটা ভাগও দিতে হয়। এভাবে চলতে চলতে বুনো ভেড়া ও বুনো ষাঁড় শেষ পর্যন্ত আর বুনো থাকে না—মানুষের পোষা হয়ে ওঠে।

অবশ্য আগে বলেছি, এই শুরুরও একটি শুরু আছে—শিকারীরা অনেক সময়ে জন্তুজানোয়ারের বাচ্চা জীবন্ত অবস্থায় ধরে নিয়ে এসে তৈরি করত একটি জীবন্ত ভাঁড়ার। এমনি একটি জীবন্ত ভাঁড়ার তৈরি করতে পারার সুবিধে যে কতখানি তা তার জানা ছিল। কাজেই যখন সে দেখল যে একদল তৃণভোজী পশু তার নাগালের মধ্যে রয়েছে এবং তার মাঠে চরছে তখন তার খুশি হবারই কথা।

নিজের স্বার্থেই সে তখন এমন ব্যবস্থা করল যাতে এই পশুর দলও তার জীবন্ত ভাঁড়ারের সঞ্চয় হয়ে ওঠে।

এই হচ্ছে প্রথম ধাপ।

গোড়ার দিকে মানুষ তার আশ্রিত পশুদের শুধু শিকার হিসেবেই দেখত। হাতের মুঠোর শিকার। কিন্তু ক্রমে এ-ব্যাপারেও তার একটা বাছবিচার আসে। শিকার যদি করতেই হয় তো সবচেয়ে ত্যাঁদোড় আর সবচেয়ে বিগড়ে-যাওয়াগুলোকেই আগে শিকার করা দরকার। বাচ্চাদের আর নিরীহদের গোড়ার দিকে রেহাই দেওয়া যেতে পারে। এভাবে বাছবিচার করার মধ্যেই পশুপালন শুরু করার দ্বিতীয় ধাপ।

ইতিমধ্যে পশুদের হাবভাব চালচলন খুঁটিয়ে লক্ষ করার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। পশুদের বাঁচিয়ে রাখতে হলে কী পরিমাণ খাদ্য ও জল দরকার, কি-ভাবে বাঁচিয়ে রাখলে বছরে-বছরে বাচ্চা পাওয়া যেতে পারে—এসব খবর মানুষের আর জানতে বাকি থাকে না। এই জ্ঞান থেকেই পশুপালন করার তৃতীয় ধাপ। বছর ঘুরে আবার যখন বীজ বোনার সময় আসে তখন আর সে এই পশুর দলকে সরাসরি মাঠ থেকে খেদিয়ে দেয় না, নিজেই পথ দেখিয়ে চরে বেড়াবার মতো জায়গায় নিয়ে যায়, হিংস্র পশুদের কবল থেকে তাদের বাঁচাবার বন্দোবস্ত করে।

এই তিনটি ধাপ পেরিয়ে আসার পর দেখা যায়, এই পশুর দল শুধু যে পোষ মেনেছে তাই নয়, পুরোপুরি মানুষের ওপরেই নির্ভর করছে।

মনে রাখতে হবে, মানুষ যখন এভাবে পশুপালন করার দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছিল তখন পুরো সময়টা ধরেই আবহাওয়ার সেই বিশেষ অবস্থাটা বজায় থেকেছে। অর্থাৎ সেই মরুভূমি ও মরূদ্যানের অবস্থা, যে-অবস্থায় মানুষের বসতির আশেপাশে পশুকেও ভিড় করতে হয়। অনুমান করা চলে, বুনো ভেড়া আর বুনো ষাঁড় ছাড়া অন্যান্য কয়েক জাতের পশুকেও মানুষ নিশ্চয়ই পোষ মানাতে চেষ্টা

করেছিল। সবাইকে নিশ্চয়ই পারে নি। যাদের পেরেছিল মোটামুটি তাদেরই উত্তরপুরুষদের আজও আমরা গৃহপালিত পশু হিসেবে দেখছি।

গোড়ার দিকে পশুপালন করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, হাতের নাগালের মধ্যে শিকারের বন্দোবস্ত রাখা। কিন্তু ক্রমে মানুষ বুঝতে পারল যে এ-ব্যাপারে সে আরো নানাদিক থেকে লাভবান হতে পারে। এই অভিজ্ঞতা তার নিশ্চয়ই হয়েছিল যে একদল পশু যে-মাঠে চরে বেড়ায় সে-মাঠের মাটি উর্বরা হয়। এই অভিজ্ঞতা থেকেই সার হিসেবে গোবরের আবিষ্কার। পশুদের বাচ্চারা কি-ভাবে মায়ের দুধ খায় তাও মানুষ নিশ্চয়ই অনেক দিন ধরে লক্ষ করেছিল। এ থেকেই পশুকে দোহন করার প্রক্রিয়াটির আবিষ্কার এবং তখন থেকেই দুধ মানুষের অন্যতম প্রধান খাদ্য। ফলে, মাংস খাবার জন্যে পশুকে বধ করার ব্যাপারে আরো বেশি বাছবিচার আসে। মানুষ বুঝতে পারে যে কোনো কোনো পশুকে বধ করার চেয়ে বাঁচিয়ে রাখলেই তার লাভ বেশি। এ-ধারণা আরো বেশি বদ্ধমূল হয় যখন পশুর গায়ের লোম থেকে কাপড় বোনার কায়দাটা সে আবিষ্কার করে।

মানুষের প্রথম বিপ্লবের পরে পশুপালনের ব্যাপারে মানুষ এ-পর্যন্তই এগিয়েছিল। পশুর কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে তাকে দিয়ে লাঙল বা গাড়ি টানাবার কায়দাটা মানুষ আবিষ্কার করেছিল দ্বিতীয় বিপ্লবের পরে। সে-আলোচনায় আমরা পরে আসব।

যাযাবর রাখাল

বাগিচা-চাষ ও পশুপালন—এই দুটি বিষয়ের ওপরে আলাদা আলাদাভাবে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু নূতন প্রস্তরযুগের জীবনযাত্রার ধরনকে ঠিকমতো বুঝতে হলে এমন একদল মানুষকে

কল্পনা করতে হবে যারা বাগিচা-চাষ ও পশুপালন একই সঙ্গে শুরু করেছিল।

পালিত পশুর সংখ্যা যদি খুব বেশি না হয় তাহলে পশুপালন সম্পর্কে এতক্ষণ যা বলা হয়েছে তার চেয়ে বেশি কিছু বলার নেই। জনকয়েক যুবকের ওপরে পশুদের ভার ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকা চলে। ফসল কেটে নেবার পরে পশুরা ক্ষেতেই চরতে পারে, অন্য সময়ে কাছাকাছি কোনো ঘাসের জমিতে।

কিন্তু পশুদের সংখ্যা যদি একটা বিশেষ মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন আর এই ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। তখন হয়তো পশুদের খাদ্যের জন্যেই আলাদাভাবে চাষ করে ঘাস জন্মাতে হয়। কিংবা হয়তো পশুদের নিয়ে যেতে হয় দূরের কোনো চারণ-ভূমিতে। অনুমান করা চলে, দূরের কোনো জায়গায় যেতে হলে একদল মানুষকেও পশুদের সঙ্গী হতে হয়, কারণ দুধ দোয়ানো বা হিংস্র জন্তুজানোয়ারের কবল থেকে পশুদের বাঁচানো বা এমনি ধরনের নানা কাজ আছে যা একজন-দু'জনের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তারা রওনা হয় বেশ কিছুদিনের জন্যে রসদ ও অন্যান্য উপকরণ নিয়ে।

এই অবস্থা চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থায় পৌঁছনো সম্ভব যখন একদল মানুষ শুধু পশুদের খবরদারি করে আর দেশে দেশে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ায়। কৃষিকাজের সঙ্গে তাদের বিশেষ কোনো সম্পর্ক থাকে না। যেমন আরবদেশের বেদুইনরা। যেমন মধ্য-এশিয়ার মঙ্গোলীয় আদিবাসীরা।

এই যাযাবর রাখালবৃত্তি অতীতের ঠিক কোন সময় থেকে শুরু হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা চলে না। আগে বলেছি, এরা এমন কিছু স্থায়ী নিদর্শন রেখে যায় নি যা হাজার হাজার বছর পরে প্রত্নবিদদের পক্ষে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। যেমন, এরা পাত্র ব্যবহার করত পোড়ামাটির নয়, চামড়ার বা চুবড়ির। এরা থাকত শক্ত খুঁটি পুঁতে তৈরি ইট বা পাথরের ঘরে নয়, তাঁবুতে। কাজেই এদের জীবন-যাত্রার কোনো নিদর্শন এত হাজার পরে আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

এ-অবস্থায় কৃষি আগে, না পশুপালন আগে—এ তর্কের মীমাংসা সহজে হবার নয়। যাঁরা বলেন, কৃষি ও পশুপালন আলাদা আলাদা মানুষের দল আলাদা আলাদাভাবে শুরু করেছিল—তাঁদের অস্বীকার করার মতো পাল্‌টা যুক্তি আমাদের হাতে নেই। তবে তা যদি হয়েও থাকে তবে বাঁচার তাগিদেই আলাদা আলাদা দলের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছিল এবং তারপরে কাজদুটো আর আলাদা থাকতে পারে নি। অর্থাৎ, শুধু কৃষি বা শুধু পশুপালন আর নয়—হয়ে ওঠে কৃষি ও পশুপালন। দুয়ে মিলে মিশ্র চাষ—একটি চাষ ফসলের, অপরটি জীবন্ত মাংসপিণ্ডের।

তবে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে কৃষিকাজ মানুষকে যতোখানি আত্মনির্ভর করেছে পশুপালনও ততোখানি। খাদ্য-উৎপাদনের যুগে মানুষের জোর যতোখানি কৃষির জন্যে, ঠিক ততো-খানি পশুপালনের জন্যে। অর্থাৎ, পুরো জোরটা মিশ্র চাষের জন্যে।

একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি নয়, একটির সঙ্গে অপরটি।

উদ্বৃত্ত ও সঞ্চয়

পুরাতন প্রস্তরযুগে জীবনধারণের উপায় ছিল শিকার ও সংগ্রহ। নূতন প্রস্তরযুগে কৃষি ও পশুপালন। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে পুরনো উপায়টা আচমকা একদিনে শেষ হয়ে যায় নি। বাগিচা-চাষ ও অল্পবিস্তর পশুপালন শুরু হবার পরেও কিছুদিন পর্যন্ত শিকার ও সংগ্রহের সাহায্যেই খাদ্যের ব্যবস্থা করা হত। কুড়িয়ে-আনা ফলমূল ও শিকার-করে-আনা জন্তুজানোয়ারের মাংসের সঙ্গে আনুষঙ্গিক হিসেবে খাওয়া হত কিছু শস্য ও দুধ। আমরা জানি, কৃষিকাজ শুরু হয়েছিল মেয়েদের হাতে, হয়তো নিতান্তই ঘটনাচক্রে। এ-আবিষ্কারের গুরুত্ব যতোদিন বোঝা যায় নি ততোদিন আসল নির্ভর থেকে গিয়েছিল শিকার—যা পুরোপুরি পুরুষদের কাজ। কাজেই

এত বেশি পার্থক্য খুঁজে পেয়েছেন যে এক-একটি গোষ্ঠীর নিদর্শনকে এক-একটি স্বতন্ত্র কালচার হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়েছে। একটিমাত্র নামের মোড়কে সবকটি নিদর্শনকে কিছুতেই উপস্থিত করা চলে না। দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বুঝতে সুবিধে হবে।

নাটুফীয়দের* কথা বলেছি। নাটুফীয় নামটা এসেছে প্যালেস্টাইনের ওয়াদি-এল-নাটুফ গুহায় পাওয়া নিদর্শন থেকে। এসব নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে মাইক্রোলিথ ও কাস্তে। এ থেকে বোঝা যায়, যদিও নাটুফীয়রা তখনো পর্যন্ত প্রধানত শিকারের ওপরেই নির্ভর করত, কিন্তু তারা খাদ্য-সংগ্রহের যুগ থেকে খাদ্য-উৎপাদনের যুগে পা বাড়িয়েছিল। তারা বিশেষ ধরনের বঁড়শি ব্যবহার করত, বিশেষ জায়গায় মৃতদের কবর দিত, এবং খুব সম্ভবত কিছুকাল বাদে বাদে গুহার ভেতরে এসে আস্তানা নিত। অর্থাৎ তাদের কর্মকাণ্ডের গোটা ব্যাপারটার মধ্যেই এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল যার হুবহু প্রতিচ্ছবি অন্য কাথাও পাওয়া সম্ভব নয়, যদিও খাদ্য-সংগ্রহের যুগ থেকে খাদ্য-উৎপাদনের যুগে পা বাড়াচ্ছে এমন গোষ্ঠীর নিদর্শনের অভাব নেই।

যেমন ধরা যাক, মিশরের তাসা কালচার ও ফায়ুম কালচার। তাসা কালচারের নিদর্শনের মধ্যে গোরুজাতীয় পশু ও ভেড়ার হাড় পাওয়া গিয়েছে কিন্তু শুয়োরের হাড় পাওয়া যায় নি। কিন্তু ফায়ুম কালচারের নিদর্শনের মধ্যে শুয়োরের হাড় অজস্র। আবার তাসীয়রা যে-ধরনের বঁড়শি ব্যবহার করত তা নাটুফীয়দের চেয়ে উন্নত ধরনের। এমনি নানা খুঁটিনাটি ব্যাপারে আরো অনেক পার্থক্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

কথাটা ভালো করে বোঝা দরকার। আমরা জানি নূতন প্রস্তর-যুগের লক্ষণ দুটি—কৃষি ও পশুপালন। কিন্তু এই লক্ষণগত মিলের বাইরে প্রত্যেকটি গোষ্ঠী নিজস্ব ধরনে বিশিষ্ট। হাতিয়ারের বিভিন্নতা, চাষের রকমফের, পশুপালনের ধরন-ধারন—সমস্ত দিকেই এক

* নাটুফীয়রা অবশ্য নূতন প্রস্তরযুগের গোষ্ঠী নয়, মধ্য প্রস্তরযুগের (মেসোলিথিক)। তবুও দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরতে কোনো বাধা নেই।

গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর কিছু না কিছু অমিল। এমনকি রিচুয়ালের দিক থেকেও। প্রত্নবিদরা কালচার শব্দটির সঙ্গে ভৌগোলিক নামটিকে বিশেষণ হিসেবে জুড়ে দিয়ে আলাদা আলাদা গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের গোটা ব্যাপারটিকে চিহ্নিত করেছেন। যেমন তাসীয় কালচার বা ফায়ুম কালচার। নূতন প্রস্তরযুগে উত্তর আফ্রিকায় ও পশ্চিম এশিয়ায় এমনি অনেকগুলো কালচারের অস্তিত্ব ছিল।

আমাদের আলোচনায় ফিরে আসি। আমরা নূতন প্রস্তরযুগটিকে বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম সে-যুগের কতকগুলো সাধারণ লক্ষণের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। প্রধান দুটি লক্ষণের কথা আমরা আলোচনা করেছি। কৃষি ও পশুপালন। কিন্তু সে-যুগের আরো তিনটি সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে কাঠের কাজ, পোড়ামাটির পাত্র তৈরি ও কাপড় বোনা। মনে রাখতে হবে যে এগুলো নিতান্তই সাধারণ লক্ষণ। ছুতোরগিরি, কুমোরগিরি ও তাঁতিগিরির মধ্যে বৃত্তিগত মিল যতোটুকু তার বেশি কিছু নয়। বাস্তব নিদর্শনে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে অনেক তফাত।

ছুতোর, কুমোর ও তাঁতী

আগে বলেছি, মানুষের প্রথম বিপ্লবের প্রাক্‌কালে উত্তর আফ্রিকায় ও পশ্চিম এশিয়ায় এখনকার চেয়ে অনেক বেশি বৃষ্টি হত। ফলে এখন যে-সব অঞ্চলে গাছপালা নেই সেখানেও গাছপালার অভাব ছিল না। কোথাও কোথাও ছিল ঘন জঙ্গল। অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে মানুষকে এমন কিছু হাতিয়ার তৈরি করতে হয়েছিল যা দিয়ে কাঠ কাটা-চেরা চলে। এই হাতিয়ারটি হচ্ছে পালিশ-করা পাথরের কুড়ুল। সরু-দানার পাথরের একটা ফালি বা নুড়ি ঘষে ঘষে ধারালো করা হত, তারপর সেটিকে বেঁধে নেওয়া হত একখণ্ড কাঠের সঙ্গে বা শিঙের সঙ্গে। এভাবে তৈরি করার ফলে হাতিয়ারটি হত

খুবই মজবুত এবং সহজে এর ধার ভোঁতা হত না। এটি দিয়ে যেমন কাঠ কাটা-চেরা চলত, তেমনি চলত মাটি কোপানো। প্রত্নবিদদের মতে, মানুষের ছুতোরগিরির শুরুতে রয়েছে এই হাতিয়ারটি। পরবর্তীকালে মানুষ কাঠ দিয়ে লাঙল, চাকা, নৌকো (জোড়া তক্তার) ও ঘরবাড়ি বানিয়েছিল। পালিশ-করা পাথরের কুড়ুল থেকেই এসব তৎপরতার সূত্রপাত।
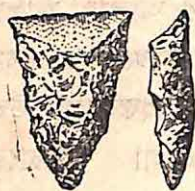
পালিশ-করা কুড়ুল

অনেক প্রত্নবিদ মনে করেন, নূতন প্রস্তরযুগটির সূত্রপাতও এই পালিশ-করা পাথরের কুড়ুল থেকেই। কেননা পুরাতন প্রস্তরযুগের শেষদিকেও কুড়ুল-জাতীয় কোনো হাতিয়ারের সন্ধান পাওয়া যায় নি। আমরা যে হাতকুড়ুলের কথা বলেছি তার সঙ্গে এই হাতল-লাগানো কুড়ুলের কোনো সম্পর্ক নেই, একটির পরিণতি অপরটি নয়।

আমরা জানি, নূতন প্রস্তরযুগের হাতিয়ারের আসল বৈশিষ্ট্য হাতিয়ার ঘষেমেজে ধারালো করা। হাতিয়ারকে ধারালো করার এই বিশেষ প্রক্রিয়াটির আবিষ্কারের পেছনে মানুষের যে অভিজ্ঞতাটি কাজ করেছে তা খুব সম্ভবত এই : পাথরের ওপর পাথর ঘষে মানুষ গম বা বার্লির দানা পিষত ; তখন সে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিল যে ঘষা খেয়ে খেয়ে পাথর ক্ষয়ে যাচ্ছে। কিংবা, বাগিচার মাটি আলগা করার জন্যে হয়তো সে একফালি পাথরকে একখণ্ড কাঠ বা শিঙের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে কোদাল-জাতীয় একটি অস্ত্র বানিয়েছিল এবং বালু-জমিতে অনবরত ব্যবহার করার ফলে অস্ত্রের ফলাটি হয়ে উঠেছিল ধারালো। এমনি ধরনের কোনো অভিজ্ঞতা থেকেই পাথরের হাতিয়ারকে ধারালো করার প্রক্রিয়াটি মানুষ আবিষ্কার করেছে। লক্ষ করার বিষয় এই যে, অভিজ্ঞতার ধরনটাই এমন যে কৃষির সঙ্গে তার কোনো না কোনো সূত্রে যোগ থাকা সম্ভব।

তবে কোনো কোনো প্রত্নবিদের ধারণা, পালিশ-করা পাথরের

কুড়ুলটি পুরোপুরি নূতন প্রস্তরযুগের হাতিয়ার নয়। এমন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও আছে যে শিকার ও সংগ্রহের যুগের কোনো কোনো গোষ্ঠী কুড়ুল-জাতীয় অস্ত্র (হাড় ও শিঙের তৈরি) ব্যবহার করেছিল। আবার, নাটুফীয়দের গুহা থেকে যদিও কাস্তে পাওয়া গিয়েছে কিন্তু কুড়ুল-জাতীয় অস্ত্র পাওয়া যায় নি। যাই হোক, এতসব তর্কের মধ্যে না গিয়েও আমরা এটুকু মেনে নিতে পারি যে পালিশ-করা পাথরের কুড়ুলটি কোনো সুনিশ্চিত সাক্ষ্য নয়। শুধু এই হাতিয়ারটি দেখেই বলা চলে না কৃষিকাজ শুরু হয়েছিল কি হয় নি।

পোড়ামাটির পাত্র সম্পর্কেও একই কথা। খাদ্য-উৎপাদন শুরু হবার পরেই পোড়ামাটির পাত্র তৈরি হয়েছিল—এমন কথা জোর দিয়ে বলা চলে না। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখে এটুকু বলা চলে যে কৃষিজীবী মানুষ মাত্রেই পোড়ামাটির পাত্র ব্যবহার করেছে। নাটুফীয়দের গুহা থেকে পোড়ামাটির পাত্র পাওয়া যায় নি।

পুরাতন প্রস্তরযুগে মানুষ ব্যবহার করত কাঠের বা চুবড়ির পাত্র। চুবড়ির পাত্রে তরল পদার্থ রাখা চলে না, কাজেই চুবড়ির পাত্রে মাটি লেপে ছিদ্র বন্ধ করতে হত। আবার, পাত্র কাঠেরই হোক বা চুবড়িরই হোক, আগুনের ছোঁয়া লাগলেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এমনি একটি মাটি-লেপা পাত্রই হয়তো অসাবধানে আগুনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। সেক্ষেত্রে গোটা পাত্রটিই পুড়ে ছাই হয়ে যাবার কথা। কিন্তু দেখা গেল তা হয় নি। কাঠ বা চুবড়ির অংশটুকু পুড়ে যাবার পরেও মাটির প্রলেপটি হুবহু তেমনি একটি পাত্রের আকারে পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠেছে। সম্ভবত এমনি ধরনের কোনো অভিজ্ঞতা থেকেই পোড়ামাটির পাত্র তৈরি করার প্রক্রিয়াটির আবিষ্কার।

এটি যে মানুষের কত বড়ো আবিষ্কার তা বুঝতে হলে রাসায়নিকের চোখ দিয়ে পোড়ামাটির পাত্রটিকে দেখা দরকার। কুমোর যে কাদামাটি দিয়ে পাত্র তৈরি করে তার রাসায়নিক নাম 'হাইড্রেটেড সিলিকেট অব অ্যালুমিনিয়াম'। এই পদার্থটিকে অন্তত ছ'শো
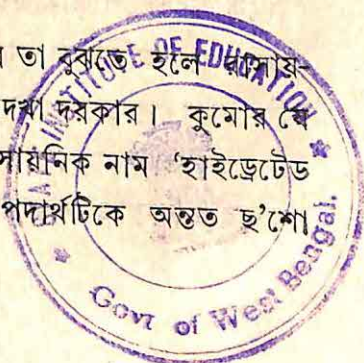
ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে উত্তপ্ত করতে হয়, সে-অবস্থায় পদার্থটির ভেতর থেকে কয়েকটি জলের অণু বেরিয়ে আসে এবং তৈরি হয় নতুন একটি পদার্থ। এই নতুন পদার্থটি আগেকার কাদামাটির মতো নরম তুলতুলে নয়—পাথরের মতো জমাট নিরেট ও কঠিন, যা নিতান্তই আছাড় না মারলে ভাঙে না।

কুমোরের কাদামাটি তৈরি করার ব্যাপারটিও খুব সহজ নয়। যে-কোনো মাটি হলেই চলে না, বিশেষ ধরনের মাটি চাই। মাটির মধ্যেকার বড়ো বড়ো দানাগুলো বিশেষ প্রক্রিয়ায় ধুয়ে বার করে দিতে হয়। আবার মাটি যাতে খুব বেশি চটচটে না হয়ে যায় সেজন্যে মাটির সঙ্গে বালি বা পাথরগুঁড়ো বা কুঁচোখড় মেশানো দরকার। মাটি মাখার সময়ে খুব বেশি জল মেশালে একেবারেই কাদা হয়ে যাবার সম্ভাবনা, কম জল মেশালে পাত্রে ফাটল ধরতে পারে। কাদামাটির তৈরি পাত্রটিকে সঙ্গে সঙ্গে আগুনে দিতে নেই, রোদে বা অল্প আঁচে শুকিয়ে নিতে হয়। তারপর পোড়ানো। এত কাণ্ডের পরে একটি পোড়ামাটির পাত্র।

আরো ব্যাপার আছে। পোড়ামাটির পাত্রটির রঙ কি হবে? লালচে না পাঁশুটে? কালো না সবুজ? সবই নির্ভর করে প্রথমত কাদামাটির পাত্রটিকে উত্তপ্ত করার ধরনের ওপরে, দ্বিতীয়ত কাদা-মাটির সঙ্গে মেশাল-দেওয়া ভেজাল পদার্থের ওপরে।

অবশ্য সে-যুগের মানুষকে পোড়ামাটির পাত্র তৈরি করার জন্যে এতসব তত্ত্ব জানতে হয় নি। তবুও স্বীকার করতে হবে, অজ্ঞাতসারে হলেও মানুষ পোড়ামাটির পাত্র তৈরি করার মধ্যে দিয়ে পদার্থের মধ্যে এই প্রথম রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছিল। গোড়ার দিকে অবশ্য পোড়ামাটির রঙের ওপরে তার কোনো হাত ছিল না। কিন্তু পরে অভিজ্ঞতা থেকে সে জানতে পেরেছিল কোন কাদামাটিকে কি-ভাবে পোড়ালে শেষ পর্যন্ত কী রঙ ধরবে।

শুধু তাই নয়, পোড়ামাটির পাত্রের ওপরে নানা রঙের অলংকরণ করার প্রক্রিয়াও শেষ পর্যন্ত সে আবিষ্কার করে। এই প্রক্রিয়াটি

খুবই জটিল। কাদামাটির পাত্রের ওপরে কাদামাটি দিয়েই অলংকরণ করা হত কিন্তু পোড়াবার পরে কাদামাটির রঙ হত এক, অলংকরণের রঙ আলাদা। তার মানে, আগে থেকে ধারণা থাকার দরকার ছিল পোড়াবার পরে কোন কাদামাটি কী রঙ ধরবে।

পোড়ামাটির পাত্র (সাধারণ ও অলংকরণযুক্ত) প্রথম তৈরি হয়েছিল পশ্চিম এশিয়ায়। ইউরোপে লৌহযুগের আগে অলংকরণযুক্ত পোড়ামাটির পাত্র তৈরি করা সম্ভব হয় নি, কারণ পোড়ামাটির গায়ে রঙ ফুটিয়ে তুলতে হলে যে-ধরনের ঝকঝকে আগুন দরকার ইউরোপের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে তা পাওয়া যায় না। এজন্যে লৌহযুগের বিশেষ ধরনের চুল্লী তৈরি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পোড়ামাটির পাত্র তৈরি হওয়ার ব্যাপারটা গোড়ার দিকে যতোই আনাড়ীর মতো শুরু হয়ে থাকুক, তার মধ্যেও বিস্তর জটিলতা ছিল। যেমন-তেমনভাবে একতাল মাটি পোড়ালেই পোড়ামাটির পাত্র তৈরি হত না। একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে চলতে হয়েছিল এবং তার মধ্যে দিয়ে মানুষকে অনেকগুলো আবিষ্কার করতে হয়েছিল।

যেমন ধরা যাক, পোড়ামাটির পাত্রের গড়নের ব্যাপারটি। এমনিতে মনে হতে পারে, কাদামাটিকে খুশিমতো গড়ন দেওয়া এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা তা নয়। কাদামাটি দিয়ে গামলা বা বাটি তৈরি করাটা হয়তো সহজ। কিন্তু কলসী বা কলসীর মতো মোটা পেট ও সরু মুখওলা একটি পাত্র? মনে রাখতে হবে, কুমোরের চাকা আবিষ্কার হয়েছে আরো অনেক পরে। তখনো পর্যন্ত যা কিছু গড়ন-পিটন সবই হাত দিয়ে। কলসী-ধরনের পাত্র তৈরি করার জন্যে সে-যুগের মানুষকে অনেকখানি মেহনত করতে হত। প্রথমে তৈরি হত গামলার আকারে কলসীর তলার অংশটি। তারপরে সেই গামলার ওপরে ঠিকঠিক মাপের চাকতি পর পর বসিয়ে দেওয়া হত। জোড়

মেলানোটাও কম হাঙ্গামার ব্যাপার ছিল না। এক-একটি চাকতি বসাবার আগে তলার অংশটিকে এমনভাবে শুকিয়ে নিতে হত যাতে তার মধ্যে খানিকটা কাঠিন্য আসে—আবার একেবারে খটখটে শুকনো করে নেবার উপায় ছিল না, কারণ তাহলে জোড় মেলাতে অসুবিধে। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে পরে এক-একটা চাকতি বসিয়ে তৈরি হত পুরো পাত্রটি। কয়েকটা দিন লেগে যেত একটি পাত্র তৈরি করতে।

সে-যুগের মানুষের এই কৃতিত্ব তার চিন্তাকেও ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। একতাল মাটি থেকে যখন একটি পাত্র তৈরি হত তখন সেই পাত্রটি হয়ে উঠত মানুষের নিজস্ব একটা সৃষ্টি। যা ছিল নরম আর তুলতুলে তার মধ্যে সে কাঠিন্য এনেছে। যা ছিল একদলা পিণ্ড তার মধ্যে সে গড়ন এনেছে। যা ছিল বিবর্ণ তার মধ্যে সে রঙ ফুটিয়েছে। এ কৃতিত্বের তুলনা কোথায়!

অবশ্য এখানে বলা দরকার যে পোড়ামাটির পাত্রকে নিজস্ব একটা সৃষ্টি হিসেবে ভাবতে সময় লেগেছিল। মানুষের কোনো ভাবনাই হাওয়ায় তৈরি হয় না। বাস্তব একটা ভিত্তি চাই। আর কৃষির সূত্রপাত যেমন মেয়েদের হাতে, পোড়ামাটির পাত্রও তাই। মেয়েরা আনকোরা নতুন কোনো জিনিসকে সহজে মেনে নিতে চায় না। কাজেই মাটির পাত্র তৈরি করার সময়েও তারা চেষ্টা করত যাতে সেই পাত্রের মধ্যে পুরনো দিনের পাত্রের আদলটা বজায় থাকে। পুরনো দিনে পাত্র হিসেবে ব্যবহার হত চুবড়ি বা লাউ-জাতীয় ফলের খোল বা মানুষের মাথার খুলি বা চামড়ার ব্লাডার। পোড়ামাটির পাত্রকে এমন একটা গড়ন দেওয়া হত এবং তার গায়ে এমনভাবে দাগ কাটা হত যেন সেটির চেহারা পুরনো দিনের পাত্র থেকে একেবারে আলাদা কিছু না হয়ে পড়ে। যেমন, কতকগুলো পোড়ামাটির পাত্রের গায়ে এমনভাবে দাগ কাটা হত যেন বাখারি বুনে বুনে তা তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ পাত্রটিকে পুরোপুরি একটা চুবড়ির চেহারা দেবার চেষ্টা।

তবে এই সংস্কার কাটিয়ে উঠতেও মানুষের খুব বেশি সময় লাগে নি।

সে-যুগের মেয়েদের অপর একটি কৃতিত্ব কাপড়-বোনা। মিশর ও পশ্চিম এশিয়ায় নূতন প্রস্তরযুগের গ্রামজীবনের যে-সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে বয়নশিল্পের সাক্ষ্য আছে। এতদিন পর্যন্ত মানুষ ব্যবহার করত চামড়া বা পাতার তৈরি পোশাক। এই প্রথম সুতোর তৈরি পোশাকের চল হল। আরো একটু পরের দিকে পশমের তৈরি পোশাক। সুতো বুনে কাপড় তৈরি করতে হলেও অনেকগুলো আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে আসা চাই। প্রথমে দরকার আঁশওলা এমন কোনো একটা পদার্থ যা থেকে সুতো বার করা চলে। ফায়ুম অঞ্চলে এই উদ্দেশ্যে শন ব্যবহার করা হত এবং শনের চাষও হত। পশ্চিম এশিয়াতেও তাই, তবে পশ্চিম এশিয়ার শন একটু আলাদা জাতের। শন ছাড়া আরো যে-সব লম্বা আঁশওলা পদার্থ পাওয়া যেতে পারত তা দিয়েও নিশ্চয়ই কাপড় বোনার চেষ্টা হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালে সিন্ধু উপত্যকায় তুলোর চাষ হত। প্রায় একই সময়ে মেসোপটেমিয়ায় ব্যবহার করা হত পশম। অনুমান করা চলে, পশমওলা ভেড়ার সন্ধান পাবার আগে সাধারণ ভেড়া ও ছাগলের লোম দিয়েই এক ধরনের কাপড় বোনা হত, কারণ কাপড় বোনার কায়দাটা জানা থাকলে সাধারণ ভেড়া ও ছাগলের লোম দিয়েও কাপড় বুনতে কোনো অসুবিধে নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে কাপড় বুনতে হলে অনেকগুলো বিষয়ে জ্ঞান থাকা চাই। যেমন, শন, পশম, তুলো, পশমওলা ভেড়া, শন ও তুলোর চাষ, এবং আরো অনেক কিছু।

তারপরে দরকার কাপড়-বোনার যন্ত্র বা তাঁত। যন্ত্র বলাই ঠিক কেননা পুরাতন প্রস্তরযুগের পক্ষে যেমন-তেমন একটি তাঁতও জটিল যন্ত্রের সামিল। অবশ্য সাধারণ একটা ফ্রেমের সাহায্যে চুবড়ি বোনার পদ্ধতিতেও কাপড় বোনা সম্ভব। কিছুকাল আগেও এই চুবড়ি বোনার পদ্ধতিতেই কানাডার একদল আদিবাসী কুকুরের

লোমের কম্বল তৈরি করত। কিন্তু নূতন প্রস্তরযুগে সত্যিকারের তাঁত ছিল। অবশ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে কাঠের তৈরি তাঁতের কাঠামোটি পাওয়া সম্ভব নয়, সুতোও নয়। যা পাওয়া সম্ভব তা হচ্ছে পাথরের বা পোড়ামাটির তৈরি একধরনের চাকতি যেগুলোকে ভার হিসেবে টেকোর একধার থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হত।
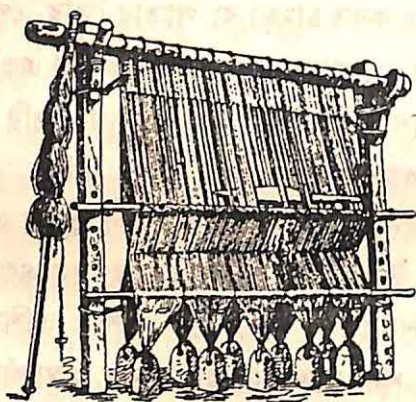
তাঁত

একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে যে নূতন প্রস্তরযুগে মানুষের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হচ্ছে তাঁত। এই আবিষ্কার মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে যে কতখানি সমৃদ্ধ করেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

তাঁতের আবিষ্কারকদের নাম আমরা জানি না। কিন্তু মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে এই নামহীনদেরই সবচেয়ে বড়ো দান।

নূতন প্রস্তরযুগের যে সব তৎপরতার কথা এতক্ষণ বলা হল তার প্রত্যেকটির জন্যেই রীতিমতো কারিগরী দক্ষতা থাকা দরকার। রীতিমতো ট্রেনিং ও হাতেনাতে কাজ করার অভিজ্ঞতা। অথচ প্রত্যেকটি তৎপরতাই শুরু হয়েছিল মেয়েদের হাতে। এবং যে-ধরনের কাজকর্মকে আমরা কুটির-উদ্যোগ বলি—এগুলোও তাই। নূতন প্রস্তরযুগে কাজ ভাগাভাগির ব্যাপারে বড়ো জোর মেয়ে-পুরুষের তফাত থাকতে পারত—বৃত্তিগত ভাগাভাগি থাকাটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার ছিল। আজকালকার আদিবাসীদের মধ্যেও দেখা

যায়, কাজ-ভাগাভাগির ব্যাপারে খুব মোটা একটা দাগ—পুরুষদের কাজ আর মেয়েদের কাজ। কাজেই অনুমান করা চলে, বাগিচা-চাষ শুরু হবার সময়ে নূতন প্রস্তরযুগেও মেয়েরা চাষ করত, পোড়ামাটির পাত্র তৈরি করত, সুতো কাটত আর কাপড় বুনত। পুরুষদের কাজ ছিল পশুপালন, শিকার, মাছ-ধরা, চাষের জন্যে জমি পরিষ্কার করা আর ছুতোরগিরি। নিজেদের হাতিয়ার তারা নিজেরাই তৈরি করে নিত। অবশ্য এই মোটা দাগের ভাগাভাগির মধ্যেও কিছুটা এদিক-ওদিক যে হত না তা নয়।

গাথা, বচন ও গীতি

বাগিচা-চাষ থেকে কাপড়-বোনা পর্যন্ত নূতন প্রস্তরযুগের প্রত্যেকটি তৎপরতার পেছনে রয়েছে মানুষের অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতা-লব্ধ সিদ্ধান্ত। যদি বিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে বলা যেতে পারে যে হাতেনাতে শেখা বিজ্ঞান। পুঁথির যুগ তখনো শুরু হয় নি। কাজেই মানুষকে যা-কিছু শিখতে হচ্ছে তা হয় সরাসরি নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, নয়তো অপরের মুখে শুনে। পুঁথিপড়া বিদ্যা বলে কিছু ছিল না। এক্ষেত্রে একপুরুষের মানুষ পরের পুরুষের মানুষের কাছে কি-ভাবে তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের খবর জানিয়ে যাবে? নিশ্চয়ই মুখের কথায়। এই মুখের কথাই রূপ নিয়েছে গাথা, বচন ও গীতির। একপুরুষের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান কতকগুলো গাথা, বচন ও গীতির মাধ্যমে পরের পুরুষের কাছে হাজির হত।

যেমন ধরা যাক চাষের কাজ। চাষ করতে হলে কতকগুলো খবর অতি অবশ্যই জানা দরকার। কোন জমি থেকে ভালো ফসল পাওয়া যেতে পারে, কখন বীজ বুনতে হবে, কোনটি ফসলের শীষ আর কোনটি আগাছার শীষ—এমনি আরো নানা খবর। যেমন ধরা যাক পোড়ামাটির পাত্র তৈরির কাজ। এক্ষেত্রে জানা দরকার, কি ধরনের

মাটি বাছাই করতে হবে, কি-ভাবে মাটি পরিষ্কার করতে হবে, কি পরিমাণ জল ও বালি মেশাতে হবে—এমনি নানা খবর। গাথা, বচন ও গীতির মাধ্যমে এসব খবর জানাবার ব্যবস্থা।

এমনিভাবে সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মুখে মুখে লোক-শিক্ষার আয়োজন। এমনকি আজকালকার দিনেও এর প্রয়োজন একেবারে ফুরিয়ে যায় নি।

নূতন প্রস্তরযুগের হাতিয়ার

নূতন প্রস্তরযুগের হাতিয়ার সম্পর্কে বিশেষভাবে বলার কথাটা অনেকবার বলেছি। পাথরের হাতিয়ারকে ঘষেমেজে ধারালো করে নেওয়া। যেমন হাতল-লাগানো কুড়ুল ও কোদাল। যেমন কাস্তে। এ ছাড়াও আরো নানা ধরনের হাতিয়ার।

তিন ধরনের হাতিয়ারের কথা আগে বলেছি। পরত পাথরের হাতিয়ার, মূল পাথরের হাতিয়ার ও নুড়ি পাথরের হাতিয়ার। কিন্তু কোনো কোনো প্রত্নবিদের মতে, নূতন প্রস্তরযুগে হাতিয়ার তৈরির প্রক্রিয়ায় আরো একটা নতুন ধরন এসেছিল, যার নাম দেওয়া হয়েছে ব্লেড বা ফলা পাথরের হাতিয়ার। পরত ও ফলার মধ্যে তফাত খুব বেশি নেই। আস্ত পাথরের গায়ে এক বিশেষ পদ্ধতিতে ঘা দিলে খসে আসে পরত, অন্য এক বিশেষ পদ্ধতিতে ফলা। অর্থাৎ, ফলাও আসলে এক ধরনের পরত-ই—তবে লম্বাটে ধরনের পাতলা পরত।

নূতন প্রস্তরযুগের গোষ্ঠী জীবন

নূতন প্রস্তরযুগের তৎপরতাকে আমরা বলেছি কুটির-উদ্যোগ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এই উদ্যোগটি ছিল ব্যক্তিগত বা পরিবারগত। কথাটার অর্থ পরিষ্কার হওয়া দরকার। মনে করা যাক, একজন গিন্নী পোড়ামাটির পাত্র তৈরি করছে। এ কাজটি কি

সে একেবারেই একা-একা করবে ? না, অন্য গিন্নীদের সঙ্গে মিলেমিশে, একজনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আরেকজনের অভিজ্ঞতা যাচাই করে নিয়ে, প্রত্যেকের কাজে প্রত্যেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ? হালের আদিবাসীদের দিকে তাকানো যাক। আফ্রিকার গ্রামে দেখা যায়, পোড়ামাটির পাত্র তৈরি করার সময়ে গ্রামের গিন্নীরা একসঙ্গে জড়ো হয়, গল্পগুজব করে, যার যা কিছু জানানোর কথা ও জানবার কথা আছে তা বলে ও শোনে, এবং একজনের কাজে আরেকজন হাত লাগায়। অর্থাৎ পোড়ামাটির পাত্র তৈরি করাটা বিশেষ একজনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নয়, পাঁচজনের অনুষ্ঠান। নূতন প্রস্তরযুগেও এই ধারাটি বজায় ছিল।

এ ছাড়া উপায় ছিল না। বাঁচার তাগিদেই সকলকে মিলেমিশে চলতে হত। কতকগুলো কাজের ধরনই ছিল এমন যে পাঁচজনকে একজোট করে তুলত। যেমন জঙ্গল পরিষ্কার করা, নালা কেটে জলাভূমির জল নিকেশ করা, হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা, এবং এমনি ধরনের আরো নানা কাজ। মিশরে নূতন প্রস্তরযুগের গ্রামের যে-সব নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা দেখে বোঝা যায়, আস্তানাগুলো যেমন-তেমনভাবে তোলা হয় নি, তাদের অবস্থানের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি পদ্ধতি আছে।

এ থেকে অনুমান করা চলে, নূতন প্রস্তরযুগে যে-কোন ধরনেরই হোক একটা কিছু সামাজিক সংগঠন ছিল, যা গোষ্ঠী-জীবনের শৃঙ্খলা ও সংহতি বজায় রাখত। এই সামাজিক সংগঠনের সঠিক রূপটি সম্পর্কে সরাসরি জানার কোনো উপায় নেই। তবে পরোক্ষ সূত্র থেকে খানিকটা ধারণা করা চলে।

আগে বলেছি, নূতন প্রস্তরযুগে বেঁচে থাকার তাগিদেই পাঁচজনকে একজায়গায় জড়ো হতে হত। অর্থাৎ, তাদের জীবনযাত্রার ধরনই ছিল গোষ্ঠীবদ্ধতা। পাঁচজনকে একসঙ্গে চলতে হলেই কতকগুলো রীতিনীতি ও নিয়মকানুন মেনে চলতে হয় এবং একসঙ্গে চলার নিয়মেই কতকগুলো ধ্যানধারণা ও মতাদর্শ গড়ে ওঠে। কী ধরনের

ধ্যানধারণা ? কী ধরনের মতাদর্শ ? তা বুঝতে হলে নূতন প্রস্তরযুগের বাস্তব অবস্থাটা মনে রাখা দরকার। যদিও মানুষ তখন নিজের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও উপকরণ নিজেই উৎপাদন করে নিতে পারছে— কিন্তু তাতে তার জীবনযাত্রা খুব যে একটা নিশ্চিত ভিত্তিভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে তা নয়। একটা সংকট যেন সব সময়েই তাকে গ্রাস করতে উদ্যত। যতোই সে ফসল ফলাবার চেষ্টা করুক, সামান্য একটা প্রাকৃতিক দুর্বিপাক তার সমস্ত চেষ্টাকে নিষ্ফলা করে দিতে পারে। খরা, ঝড়, শিলাবৃষ্টি, উদ্ভিদের রোগ বা এমনি হাজারটা কারণে শুরু হতে পারে ভয়ংকর এক দুর্ভিক্ষ। তখনো পর্যন্ত লেনদেনের ব্যবস্থা তৈরি হয় নি। কাজেই বাড়তি অঞ্চল থেকে ফসল আমদানি করে দুর্ভিক্ষের অঞ্চলের চাহিদা মেটানো হবে—সে-সম্ভাবনাও নেই। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ তখনো পর্যন্ত নিতান্তই এক অসহায় জীব। সবসময়ে তার ভয়—এই বুঝি এক অভিশপ্ত ফুৎকারে তার মাঠের সমস্ত ফসল, তার গোয়ালের সমস্ত পশু আর আশেপাশের জঙ্গলের সমস্ত শিকার নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবে। আবার সেই ফুৎকারটি যদি অভিশাপের না হয়ে আশীর্বাদের হয়—তাহলেই ঠিক সময়ে বৃষ্টি হবে, রোদ উঠবে, মাঠ ভরে যাবে ফসলে, পশুদের মধ্যে মড়ক থাকবে না। কাজেই তার সমস্ত জীবনটা নির্ভর করছে এক অদৃশ্য শক্তির আশীর্বাদের ওপরে। এই আশীর্বাদ পাবার জন্যে তাকে নানাভাবে চেষ্টা করতে হবে—ভজনা, উপাসনা, মিনতি, অনুরোধ, শাসানি—কোনোটাই বাদ দেবে না, যখন যাতে কার্যসিদ্ধি।

এই ছিল নূতন প্রস্তরযুগের বাস্তব অবস্থা। এখন যদি বলি, সে-যুগের মানুষের ধ্যানধারণা ও মতাদর্শের ভিত্তি ছিল অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার—তাহলে বোধ হয় কথাটা মেনে নেওয়া চলে। এই অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার নূতন প্রস্তরযুগেও স্বাভাবিক নিয়মেই কতকগুলো ম্যাজিক ও রিচুয়ালের মধ্যে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিল। এই ম্যাজিক ও রিচুয়ালের সম্মতির ওপরেই গড়ে উঠেছিল সে-যুগের সামাজিক সংগঠন।

নূতন প্রস্তরযুগের মানুষের জীবনধারণের উপায়গুলো সম্পর্কে ধারণা করার জন্যে বার বার আমরা হাল-আমলের আদিবাসীদের দিকে তাকিয়েছি। কিন্তু সে-যুগের মানুষের ধ্যানধারণা, মতাদর্শ ও সামাজিক সংগঠন—এসবের হুবহু প্রতিচ্ছবি যদি হাল-আমলের আদিবাসীদের মধ্যে খুঁজতে চেষ্টা করা হয় তাহলে ভুল করা হবে। ছ'হাজার বছর পরে আজকের দিনেও পৃথিবীর আনাচে-কানাচে এমন একদল মানুষকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব যাদের জীবনধারণের উপায় নূতন প্রস্তরযুগের। কিন্তু তাদের মতাদর্শের জগতেও গত ছ'হাজার বছরের এতগুলো বিপ্লবের কোনো ঢেউ আছড়ে পড়ে নি—তা বোধ হয় ঠিক নয়। কাজেই নূতন প্রস্তরযুগের মানুষের মতাদর্শের জগৎটিকে জানতে হলে সে-যুগের নিদর্শনের ওপরেই চোখ রাখা ভালো।

আগে বলেছি, সারাসরি নিদর্শন কিছু নেই। নানা পরোক্ষ সূত্র থেকে কিছুটা অনুমান ও কল্পনা করতে হবে।

শিকার ও সংগ্রহের যুগের টোটেম-বিশ্বাস যে পরের যুগেও টিকেছিল তার একটা পরোক্ষ সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে নীলনদের উপ-ত্যকায়। লিখিত ইতিহাস থেকে জানা গিয়েছে যে জন্তুজানোয়ারের নামে মিশরের গ্রামগুলোর নাম হত। এটা টোটেম-বিশ্বাসের লক্ষণ। এমনকি প্রাগৈতিহাসিক কালের পোড়ামাটির পাত্রেও জন্তুজানোয়ারের ছবি। এখানেও সেই একই বিশ্বাস। কাজেই মোটামুটি ধরে নেওয়া চলে যে নূতন প্রস্তরযুগের সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি ছিল টোটেম-বিশ্বাস।

নূতন প্রস্তরযুগের সমাজে সর্দার বা মোড়ল-স্থানীয় কেউ ছিল না এমন অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে। সে-যুগের প্রত্যেকটি কবরের সাজসজ্জা একই ধরনের। কোনো কবরেই এমন কোনো বাড়তি আয়োজন বা সাজসজ্জা নেই যা দেখে মনে হতে পারে, এটি গরীব মানুষের নয়, বড়ো মানুষের কবর। যে ক'টি আস্তানার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যেও 'প্রাসাদ' বলে চালানো যেতে পারে এমন একটিও আস্তানা নেই।

ম্যাজিক ও রিচুয়াল সম্পর্কেও কিছুটা অনুমান করা চলে। পুরাতন প্রস্তরযুগে মৃতকে কবর দেবার সময় যে-ধরনের রিচুয়াল পালন করা হত, নূতন প্রস্তরযুগে তা আরো গভীর তাৎপর্য লাভ করেছিল। এ-যুগেও কবর তৈরি করা হত আস্তানার কাছাকাছি কোনো জায়গায়। কবরের মধ্যে সাজিয়ে রাখা হত পাত্র, হাতিয়ার, অস্ত্র, খাদ্য ও পানীয়। প্রাগৈতিহাসিক মিশরে কবরখানার পাত্রের গায়ে আঁকা হত কোনো জন্তু বা কোনো জিনিসের ছবি। সম্ভবত পুরাতন প্রস্তরযুগে যে উদ্দেশ্য নিয়ে গুহাচিত্র আঁকা হত, এখানেও সেই একই উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক কালে এসে দেখা যায়, কবরের দেওয়ালের গায়ে এ-ধরনের চিত্র এঁকে রাখা হয়েছে।

মৃতদেহকে এতখানি আয়োজন ও যত্নের মধ্যে কবর দেওয়ার ভেতরে সে-যুগের মানুষের মৃত্যু সম্পর্কে বিশেষ একটা চিন্তা ফুটে উঠেছে। চিন্তাটা পুরাতন প্রস্তরযুগের। তারা বিশ্বাস করত পূর্ব-পুরুষের মৃতদেহে আবার একদিন জীবন ফিরে আসবে। পূর্বপুরুষের আত্মা দেহ ছেড়ে বাইরে এসেছে বটে কিন্তু আবার সেই দেহের মধ্যে ফিরে যাওয়া আত্মার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার নয়।

কিন্তু নূতন প্রস্তরযুগে এসে দেখা গেল, যে-মাটির নিচে পূর্বপুরুষের দেহকে কবর দেওয়া হয়েছে সেই মাটি ফুঁড়েই প্রতি বছর ম্যাজিকের মতো ফসলের শীষ বেরিয়ে আসছে। তাহলে এই যে ফসল ফলছে তা পূর্বপুরুষের আত্মার আশীর্বাদের ফলেই।

নূতন প্রস্তরযুগে মাঠের ফসলের ওপরেই মানুষের সমস্ত দৃষ্টি ও মনোযোগ। কাজেই, অনুমান করা চলে, ফসল ফলাবার জন্যে অনেকগুলো রিচুয়াল ও ম্যাজিক সে পালন করে চলত।

কল্পনা করা হত, মাটি যেন মা আর ফসল হচ্ছে সন্তান। মায়ের প্রতীক হিসেবে একটি নারীমূর্তি গড়া হত আর বিশেষ ধরনের রিচুয়াল পালন করা হত। পোড়ামাটির তৈরি এ-ধরনের নারীমূর্তি নূতন প্রস্তরযুগের উত্তর আফ্রিকায় ও পশ্চিম এশিয়ায় অজস্র পাওয়া গিয়েছে।

আরেক ধরনের রিচুয়ালের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যার নাম দেওয়া চলে 'ফসল-রাজার বিয়ে'। রানীর সঙ্গে ফসল-রাজার বিয়ে, এই ছিল মূল কথা। বিশ্বাস করা হত যে ফসল-রাজার বিয়ে হলে উপযুক্ত সময়ে মাটি আবার ফসলা হবে। কিন্তু শুধু বিয়ে হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, বীজকে যেমন মাটিতে পুঁততে হয় ফসল-রাজারও সেই গতি হওয়া দরকার। অর্থাৎ ফসল-রাজাকে খুন করে মাটিতে কবর দেওয়া হত। বীজ মাটিতে পোঁতার পরে নতুন ফসল হবে—তেমনি পুরনো ফসল-রাজাকে কবর দেবার পরে একজন তরুণকে করা হত নতুন ফসল-রাজা। পরের বছর এই নতুন রাজাকেও আবার যেতে হত কবরে।

লক্ষ করার বিষয় এই যে এই ফসল-রাজা যদি পাল্‌টা কোনো ম্যাজিকের দোহাই পেড়ে কোনোক্রমে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেতে পারে তাহলে তার পক্ষে পার্থিব জগতের রাজা হয়ে বসাটাও অসম্ভব ব্যাপার নয়।

এমনি ধরনের আরো নানা রিচুয়াল ও ম্যাজিক*। উদ্দেশ্য একই। ঠিক সময়ে বর্ষা নামুক। ঠিক সময়ে রোদ উঠুক। ঠিক সময়ে মাটি ফসলা হোক। দূর হোক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্বিপাক, মড়ক ও মহামারী। যে-সব অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে পৃথিবীর যাবৎ ঘটনা ঘটছে তারা যেন সন্তুষ্ট থাকে। সন্তুষ্ট থাকে যেন পূর্বপুরুষের আত্মা।

সময়ের হিসেব

কৃষির সঙ্গে ঋতুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বছরের এক বিশেষ ঋতুতে বীজ বুনতে হয়। বিশেষ ঋতুতে ফসল পাকে। কাজেই কৃষিকাজ

---

* এ-সম্পর্কে যাঁরা বিস্তৃতভাবে জানতে চান তাঁরা J. G. Frazer-এর লেখা The Golden Bough বইটি পড়তে পারেন।

করতে হলে ঋতু-পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। সময়কে নির্ভুল মাপে ভাগ করা দরকার।

ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক আছে, এটুকু সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায়। শিকার ও সংগ্রহের যুগের শিকারীরা সূর্য নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় নি—তারা লক্ষ করত চাঁদের কলা। কতদিন পরে পরে অমাবস্যা আসে, কতদিন পরে পরে পূর্ণিমা—এ-খবরটাই তাদের কাছে বিশেষ জরুরি ছিল। কাজেই তারা সময়কে ভাগ করেছিল অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দাগ টেনে টেনে। কিন্তু কৃষিজীবী মানুষকে সময় ভাগ করার জন্যে সূর্যের দিকেই তাকাতে হয়, সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের দিকে। কিন্তু এ ব্যাপারেও মুশকিল আছে। সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলে সমান মাপের নয়।

সুমেরু-বৃত্তের যতো কাছাকাছি অঞ্চল, সূর্যের অয়ন-যাত্রা (অর্থাৎ, এক অয়ন থেকে অন্য অয়নে যাওয়া) ততো স্পষ্ট। কাজেই এ-অঞ্চলে সূর্যের অয়ন-যাত্রা থেকেই সারা বছরের একটি হিসেব পাওয়া যেতে পারে। ঋতু-পরিবর্তনের একটা হদিশ। চাষের কাজ শুরু করার জন্যে সারা বছর ধরে সূর্যের ওপরে লক্ষ রাখতে রাখতে শেষ পর্যন্ত মনে হতে থাকে, ফসল ফলাবার পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করছে সূর্যের ওপরে। এ-ধরনের চিন্তা থেকেই সূর্যের দেবত্ব লাভ।

কিন্তু বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে সূর্যের অয়ন-যাত্রা তেমন স্পষ্ট নয়। কিন্তু সেখানে অন্য একটি সুবিধে আছে। নির্মেঘ রাত্রির আকাশে সারা বছর ধরে তারা জ্বলজ্বল করে। এই তারা দেখেই সময়ের একটা হিসেব পাওয়া সম্ভব। সূর্যের অয়ন-যাত্রার হিসেবের চেয়ে এই হিসেবটি অনেক বেশি সুবিধের। সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই জানা যায় যে এক-এক দল তারার বছরের এক-একটা বিশেষ সময়ে আকাশের এক-একটা বিশেষ জায়গায় অবস্থান। কাজেই কোন তারাটি আকাশের কোন জায়গায় আছে তা দেখেই ঠিক করা চলে কখন বীজ বোনার সময়, কখন ফসল পাকার সময়,

ইত্যাদি। এ-ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত মনে হতে থাকে যে আকাশের তারাগুলোই যেন জগৎসংসারের সমস্ত ব্যাপার ঘটাচ্ছে। যেমন, নীলনদের বন্যা আসার সময়ে লুব্ধক তারাটি থাকত ভোরের আকাশে ঠিক দিগন্তরেখায়। এ থেকে শেষ পর্যন্ত ধারণা হল, লুব্ধক হচ্ছে নীলনদের বন্যার দেবতা। এইভাবেই আকাশের সূর্য ও তারার সঙ্গে মানুষ ও পৃথিবীর ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। নূতন প্রস্তরযুগের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের মধ্যে যে-সমস্ত ধারণার জন্ম তাই শেষ পর্যন্ত একটা শাস্ত্রের চেহারা নিয়ে আজো টিকে আছে। এই শাস্ত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাস্ট্রোলজি বা ফলিতজ্যোতিষ শাস্ত্র বা আকাশের তারা দেখে মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার বিদ্যা।

নীলনদের বন্যার কথা আগেও বলেছি। নীলনদের বন্যার জল সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নীলনদের উপত্যকায় চাষের কাজ শুরু হত। কাজেই এ-অঞ্চলে নীলনদের বন্যাটাই ছিল চাষের কাজ শুরু করার একটা সংকেত। বছরের একটা হিসেব এই সংকেত থেকেও পাওয়া সম্ভব ছিল।

নীলনদের বন্যা সম্পর্কে বিশেষভাবে জানার কথাটা হচ্ছে এই যে প্রতি বছরে নির্ভুলভাবে ঠিক একই দিনে এই বন্যা আসে। পঞ্চাশ বছরের হিসেব মিলিয়ে দেখা গিয়েছে যে ঠিক ৩৬৫ দিন পরে পরে নীলনদে বন্যা হয়েছে। সুতরাং এই খবরটি যদি একবার জানা হয়ে যায় তবে অনায়াসেই ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে, আর কতদিন পরে চাষের কাজ শুরু করার দিনটি আসবে। এমনও হতে পারে, যে-মানুষটি নীলনদের বন্যা সম্পর্কে প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছিল তাকে তখনকার দিনের চাষীরা দেবতাজ্ঞানে রাজার আসনে বসিয়েছিল।

নূতন প্রস্তরযুগের সীমাবদ্ধতা

নূতন প্রস্তরযুগের সীমাবদ্ধতা ছিল দুটি।

আগে বলেছি, নূতন প্রস্তরযুগে মানুষের সংখ্যা যেন লাফ দিয়ে বেড়ে গিয়েছিল। বেঁচে থাকার সংগ্রামে বড়ো রকমের জিত হবার লক্ষণ এটি। কিন্তু নূতন প্রস্তরযুগের কাঠামোয় এ-অবস্থা দীর্ঘকাল ধরে চলতে পারে না। যতো বেশি মানুষ ততো বেশি জমিতে চাষ —এই সহজ সমাধানেরও একটা শেষ আছে। তখন শুরু হয় জমি নিয়ে লড়াই। একদল মানুষকে উৎখাত বা পদানত করে অপর একদল মানুষের জমি দখলের চেষ্টা। প্রত্নবিদরা এ-ধরনের লড়াইয়ের বহু নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন। লড়াই বাধত বিশেষ করে খাদ্য-সংগ্রহের যুগের মানুষের সঙ্গে খাদ্য-উৎপাদনের যুগের মানুষের।

কাজেই অবস্থা যখন এমন চরমে ওঠে যে একই জমির জন্যে আলাদা আলাদা দলের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি চলছে তখন আর মানুষের সংখ্যা বাড়তে পারে না। কারণ জমির পরিমাণ যদি নির্দিষ্ট থাকে তবে সেই জমির ওপরে নির্ভর করে যতোজন মানুষ জীবনধারণ করতে পারে তাদের সংখ্যাটাও নির্দিষ্ট হয়ে যায়। বাড়তি মানুষের ঠাঁই নেই। লড়াই ও খুনোখুনির মধ্যে তাদের প্রাণ দিতে হয় শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ, মানুষের সংখ্যা তখন আর বাড়ে না, বরং কমতে থাকে। এটি হচ্ছে বেঁচে থাকার সংগ্রামে পরাজয়ের লক্ষণ।

নূতন প্রস্তরযুগে প্রত্যেকটি গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। অর্থাৎ, জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্য ও উপকরণ গ্রামের মানুষরা নিজেরাই উৎপাদন করত। এ-ব্যবস্থার সুবিধে যেমন আছে, অসুবিধেও তেমনি। কোনো কারণে একবছর অজন্মা হলেই দুর্ভিক্ষ। লেনদেনের ব্যবস্থা নেই বলে কোনো বাড়তি উৎপাদনের অঞ্চল থেকে খাদ্য আমদানি করার সম্ভাবনা নেই। এ-অবস্থায় একটি কি দুটি অজন্মার বছর গোটা গ্রামকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। তার মানে, বেঁচে থাকার সংগ্রামে বড়ো রকমের পরাজয়।

নূতন প্রস্তরযুগের এই দুটি সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে মানুষকে দ্বিতীয় আরেকটি বিপ্লব করতে হয়েছিল, যার নাম নগর-বিপ্লব।

নগর-বিপ্লবের পটভূমি

মানুষের ঠিকানার উদ্দেশে রওনা হয়ে সময়ের দিক থেকে আমরা একশো-ভাগের নিরানব্বুই-ভাগ পার হয়ে এসেছি। বাকি আছে শেষদিকের মাত্র হাজার পাঁচেক বছর। কিন্তু এই পাঁচ হাজার বছরের ঠিকানাই সবচেয়ে জটিল, সবচেয়ে বিচিত্র। সত্যি কথা বলতে কি, মানুষকে মানুষ হিসেবে জানতে হলে এই পাঁচ হাজার বছরের দিকেই বিশেষ করে তাকাতে হবে। তবে সুখের বিষয়, এই পাঁচ হাজার বছরের অধিকাংশ সময়েরই লিখিত ইতিহাস আছে—প্রত্ন-তাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে সেই ইতিহাসকে খুঁজে বার করতে হয় না। কাজেই প্রত্নবিদের ছক্-কাটা রাস্তায় মানুষের ঠিকানার উদ্দেশে আমাদের যাত্রাও লিখিত ইতিহাসের সিংহদ্বারে এসে শেষ হবে।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে ইতিহাস খুঁজে বার করার একটা অসুবিধে এই যে আমরা শুধু কতকগুলো বড়ো বড়ো ঘটনা টের পাই। কিন্তু ঘটনার রূপায়ণের পর্বটি অজ্ঞাতেই থেকে যায়। কয়েক লক্ষ বছরের পুরাতন প্রস্তরযুগকে আমরা উপস্থিত করেছি কয়েকটি ঘটনার সাক্ষ্য হিসাবে। তার বেশি কিছু নয়। যেমন, সে-যুগের সবচেয়ে আশ্চর্য আবিষ্কার তীরধনুক সম্পর্কে আমরা শুধু এটুকু জেনে সন্তুষ্ট থেকেছি যে এটি একটি ঘটনা। কিন্তু এই আবিষ্কারের বিবরণ আমরা পাই নি। মানুষের প্রথম বিপ্লবটিকেও আমরা জেনেছি কৃষি, পশুপালন, পোড়ামাটির পাত্র তৈরি, তাঁত-বোনা বা এমনি ধরনের কতকগুলো

ঘটনার সাক্ষ্য হিসেবে। প্রত্যেকটি ঘটনার পেছনেই রূপায়ণের এক-একটি পর্ব নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু লিখিত ইতিহাস না থাকার ফলে তার যথাযথ বিবরণ পাওয়া সম্ভব নয়।

মানুষের প্রথম বিপ্লব ও দ্বিতীয় বিপ্লবের মাঝখানে পুরো দুটি হাজার বছর কেটেছিল (অবশ্য কয়েক লক্ষ বছরের পুরাতন প্রস্তর-যুগের তুলনায় এই দুটি হাজার বছর কিছুই নয়—প্রায় একটি পলক-পাতের মতো)। এ-সময়ে মানুষ কী উপায়ে খাদ্যসংস্থান করত তা আমরা আলোচনা করেছি। কি-ভাবে থাকত তারও খানিকটা আভাস পেয়েছি। সব মিলিয়ে মোটামুটি ধরে নেওয়া চলে, পরবর্তী-কালে মানুষ যে এক-একটি অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা হতে পেরেছিল তার সূত্রপাত এ-সময়ে। চাষীদের গ্রাম বলতে আমরা যা বুঝি তার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে এই প্রথম বিপ্লবটি হবার পরেই। অবশ্য খুবই ছোট গ্রাম, কাঠা সাতেক জমিই হয়তো এক-একটি গ্রামের পুরো চৌহদ্দি—তবুও তাকে গ্রামই বলতে হবে। এবং পুরোপুরি চাষীদের গ্রাম। সেখানে প্রত্যেকটি মানুষকেই কোনো না কোনো ভাবে খাদ্য-উৎপাদনে অংশ নিতে হত। বসে খাবার উপায় কারও ছিল না। তখনো পর্যন্ত এমন অবস্থা তৈরি হয় নি যে বিশেষ কোনো বিদ্যার এত বেশি গুরুত্ব যে সেই বিদ্যার অধিকারীদের পক্ষে সরাসরি খাদ্য-উৎপাদক না হয়েও খাদ্য-সংস্থান করা সম্ভব। অর্থাৎ, তখনো পর্যন্ত নগরের পত্তন হয় নি।

এ-কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল মানুষের দ্বিতীয় বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। এই বিপ্লবকেও উপস্থিত করতে হবে কয়েকটি ঘটনার সাক্ষ্য হিসেবে।

বিপ্লবের এলাকা

গোড়াতেই বিপ্লবের এলাকাটিকে ভালোভাবে চিহ্নিত করা দরকার। পশ্চিমে সাহারা ও ভূমধ্যসাগর। পুবে থর মরুভূমি ও

হিমালয়। উত্তরে ইউরেশীয় পর্বতমালা—বল্‌কান, ককেশাস, এলবুর্জ ও হিন্দুকুশ। আর দক্ষিণদিকে মোটামুটিভাবে বলা যায় ট্রপিক অব ক্যানসার বা কর্কটক্রান্তি রেখা।

এই এলাকার ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু ছিল বিপ্লবের সহায়ক। বিশেষ করে এই এলাকাতেই এমন কতকগুলো উপাদান স্বাভাবিক অবস্থায় বর্তমান ছিল যার ফলে কয়েকটি বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটতে পেরেছিল, যে ঘটনাগুলো দ্বিতীয় বিপ্লবের সাক্ষ্য।

গোটা এলাকাটি জুড়ে রয়েছে মানুষের বাসের অযোগ্য মরুভূমি ও পর্বতমালা। কিন্তু এরই মধ্যে এমন সব অঞ্চলও যেখানে গ্রাম গড়ে উঠতে পারে, যাযাবর রাখালদের পক্ষে পশুর দল নিয়ে ঘুরে বেড়াতেও কোনো অসুবিধে নেই। জঙ্গলের এলাকার চেয়ে এ-ধরনের এলাকাতেই নানা দলের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ হবার সম্ভাবনা বেশি।

এই এলাকার পশ্চিমদিকের ফালিটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ফারটাইল ক্রেসেন্ট' বা 'উর্বরা বাঁকাচাঁদ'। এই বাঁকাচাঁদের পশ্চিম চুড়ো হচ্ছে মিশর। নীলনদের দেশ মিশর—মরুভূমির মধ্যে শ্যামল একটি আশ্বাস। প্রতি বছরে নির্ভুল দিনটিতে এই নদে বন্যা আসে আর দুই তীর প্লাবিত হয়ে নরম পলিমাটি জমে। এবং এই নদের জলপথে ভূমধ্যসাগর থেকে বহুদূর পর্যন্ত একটি যোগাযোগের ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। বাঁকাচাঁদের পুবদিকের চুড়ো টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকা। নীলনদের উপত্যকার মতো এই অঞ্চলেও এই দুটি নদীর দাক্ষিণ্যে চাষের জমি উর্বরা হয়ে উঠত। বাঁকাচাঁদের দুই চুড়োর মাঝখানের বাঁকানো অবয়বটি হচ্ছে (পশ্চিম থেকে পুবে) প্যালেস্টাইনের সমভূমি, সিরিয়ার উপকূল এবং লেবাননের পুবদিকের বিস্তৃত ভূখণ্ড। গোটা অঞ্চলটি চাষের পক্ষে উপযুক্ত। তাছাড়া ছিল পশুদের চারণভূমি। এই সমস্ত কারণে বিশেষ করে এই অঞ্চলটিই হয়ে উঠেছিল মানুষের দ্বিতীয় বিপ্লবের অন্যতম জন্মভূমি।

লক্ষণগত মিল

নূতন প্রস্তরযুগে গ্রামের পত্তন হয়েছিল, একথা বলেছি। খুবই ছোট ছোট গ্রাম। কিন্তু তার বাইরেও ছিল অজস্র যাযাবর গোষ্ঠী। এদের মধ্যে অনেকের তখনো পর্যন্ত জীবনধারণের উপায় ছিল জন্তু-জানোয়ার ও মাছ শিকার। অনেকের পশুপালন। কিন্তু নূতন প্রস্তর-যুগে এসে প্রত্নবিদদের নজর এদের ওপরে ততোটা নয়, যতোটা গ্রামগুলোর দিকে। কারণ এই গ্রামগুলোই বড়ো হতে হতে নগর হয়ে উঠেছিল।

যে-সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে এসব গ্রামের খবর জানা গিয়েছে তা দেখে বোঝা যায়, প্রত্যেকটি গ্রামে নিজস্ব একটি কালচার গড়ে উঠেছিল। বিষয়টি নিয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছি। আমরা জানি, একটি গোষ্ঠীর কালচারের সঙ্গে অপর একটি গোষ্ঠীর কালচারের হুবহু মিল কখনোই হতে পারে না। না অতীতে, না বর্তমানে। হাতিয়ার তৈরির মধ্যে, শিল্পের মধ্যে, জীবনধারণের পদ্ধতির মধ্যে কিছু না কিছু অমিল থাকবেই। আবার সমস্ত অমিল সত্ত্বেও লক্ষণগত কতকগুলো মিল থাকে, যেগুলো শেষ পর্যন্ত বিশেষ একটা যুগের বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। নগর-বিপ্লবের পটভূমি বুঝতে হলে নূতন প্রস্তরযুগের গ্রাম-জীবনের এই লক্ষণগত মিলগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার।

স্থায়ী বসতি

একটি লক্ষণ হচ্ছে স্থায়ী বসতির পত্তন। স্থায়ী বসতি বলতে গোড়ার দিকে গ্রাম, পরে নগর। লক্ষণ দেখে মনে হয়, স্থায়ী বসতি পত্তনের জন্যে সে-যুগের মানুষ এক-একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরে যেতে চায় নি। এর কারণ অনুমান করা শক্ত নয়।

আমরা জানি, আলোচ্য এলাকাটি ক্রমেই হয়ে উঠেছিল মরুভূমির

দেশ। বৃষ্টিপাত কমে আসছিল আর অজন্মার বছরগুলো বেশি বেশি মাত্রায় প্রকট হয়ে উঠছিল। ফলে ছোট হয়ে আসছিল মরূদ্যানের সীমানাও। ওদিকে প্রথম বিপ্লবের পরে মানুষের সংখ্যা খুবই বেড়ে গিয়েছে। এ-অবস্থায় স্বাভাবিক কারণেই মানুষের কাছে সবচেয়ে বড়ো সম্পদ হয়ে উঠেছিল মরূদ্যানের জমি। নূতন প্রস্তরযুগ শুরু হবার পর থেকে মানুষ এসব অঞ্চল থেকে কখনো নড়ে নি। নড়বার মতো জায়গাও খুব বেশি ছিল না। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখে বোঝা যায়, মোটামুটি একই অঞ্চলে প্রথমে গড়ে উঠেছিল গ্রাম, তারপরে নগর।

এ-প্রসঙ্গে অন্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা সেরে নেওয়া যেতে পারে। বিষয়টি হচ্ছে ঢিবি—ইংরেজিতে যাকে বলা হয় টেল্ (tell)। পশ্চিম এশিয়ার যে-সব অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে সেখানকার বিশেষত্ব এই যে পলিমাটি হওয়া সত্ত্বেও জমি সমতল নয়। জায়গায় জায়গায় পাহাড়ের মতো ঢিবি—ষাট ফুট থেকে একশো ফুট পর্যন্ত উঁচু। ঢিবিগুলো প্রাকৃতিক কারণে তৈরি হয় নি—এগুলো হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের গ্রাম ও নগরের ধ্বংসাবশেষ। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যেকার পলিমাটির জমিতে এ-ধরনের ঢিবির সংখ্যা কম নয়। ঢিবিগুলো কি-ভাবে তৈরি হয়েছে? হালের ইরাকের দিকে তাকিয়ে দেখলেও ঢিবি তৈরির প্রক্রিয়াটা বোঝা যাবে। ইরাকে এখনো পর্যন্ত ঘরবাড়ি তৈরির জন্যে যে ইট ব্যবহার করা হয় তা পোড়ানো নয়, রোদে শুকিয়ে নেওয়া। এ-ধরনের ইটের আয়ু খুব বেশি দিনের নয়, বড়ো জোর একশো বছর—তার মধ্যেই জলে আর বৃষ্টিতে ভিত আলগা হতে হতে শেষ পর্যন্ত পুরো কাঠামোটাই ধসে পড়ে। জমির মালিক নতুন বাড়ি তৈরি করার সময়ে পুরনো বাড়ির ধ্বংসস্তূপকে সরাবার কোনো প্রয়োজন বোধ করে না—ধ্বংসস্তূপকে সমতল করে নিলেই চলে। তফাতটা শুধু এই হয় যে পুরনো বাড়ির চেয়ে তার এই নতুন বাড়ির ভিত আরো ফুট দুয়েক উঁচু হয়ে ওঠে। এভাবে

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধসে-পড়া আর গড়ে-তোলার প্রক্রিয়াটা চলতে থাকে আর শেষ পর্যন্ত তৈরি হয় উঁচু একটি ঢিবি। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও এভাবেই ঢিবি তৈরি হয়েছিল। একটু ভাবলেই বোঝা যাবে, ঢিবির সবচেয়ে নিচের স্তরে সবচেয়ে পুরনো যুগের নিদর্শন। কল্পনা করা চলে, সময়ের একটি প্রবাহ যেন ঢিবির সবচেয়ে নিচের স্তর থেকে সবচেয়ে ওপরের স্তরে উঠে এসেছে। এবং ঢিবির কোনো একটি বিশেষ স্তরকে যদি আমরা নির্দিষ্ট সাল-তারিখ দিয়ে চিহ্নিত করতে পারি তবে তা থেকে অন্যান্য স্তরগুলোকেও চিহ্নিত করা সম্ভব। ধরা যাক ঢিবির কোনো একটি বিশেষ স্তর থেকে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা বলে দিতে পারি, সেই নিদর্শনটি তার ওপরদিকের সমস্ত স্তরের নিদর্শন থেকে কতটা প্রাচীন আর নিচের দিকের সমস্ত স্তরের নিদর্শন থেকে কতটা আধুনিক। আবার যে-কোনো একটি স্তরের সাল-তারিখ যদি জানা থাকে তাহলে সেই বিশেষ নিদর্শনটি যে বিশেষ স্তর থেকে পাওয়া গিয়েছে তার সাল-তারিখটিও হিসেব করে বার করে নেওয়া চলে। যাতে কোনো ভুল ধারণার অবকাশ না থাকে সেজন্যে কথাটা আবার বলছি: ঢিবির ওপরের স্তরটি সময়ের দিক থেকে সবচেয়ে আধুনিক আর নিচের স্তরটি সময়ের দিক থেকে সবচেয়ে প্রাচীন।

আমাদের আলোচনায় ফিরে আসি। স্থায়ী বসতি গড়ে ওঠার একটি কারণ আমরা জেনেছি। কিন্তু কারণ শুধু এই একটিই নয়। অন্য কারণও আছে। প্রত্যেকটি অঞ্চলকে চাষবাসের উপযোগী করে তোলার জন্যে অনেকখানি মেহনত খরচ করতে হয়েছিল। একজনের নয়, অনেকের। আলাদা আলাদাভাবে নয়, একজোট হয়ে। যেমন ধরা যাক নীলনদের উপত্যকা অঞ্চল। এই অঞ্চলে গোড়ার দিকে দু-এক টুকরো জমি নিশ্চয়ই ছিল যেখানে বিনা মেহনতে চাষ করা চলত। কিন্তু পরে এই চাষের জমি বাড়াবার জন্যে অনেক জলাভূমির জল নিকেশ ও অনেক নলখাগড়ার জঙ্গল পরিষ্কার করতে হয়েছিল। এসব কাজ একজন-দু'জনের নয়, অনেকের। এমনকি এজন্যে অনেক

সময়ে কাছাকাছি অনেকগুলো গ্রামের মানুষের একজোট না হলে চলত না। এতখানি মেহনতের পরে যে জমি হাসিল হত তা মানুষের কাছে হয়ে উঠেছিল পবিত্র। নিতান্ত প্রাণের দায় উপস্থিত না হলে সে-জমি কিছুতেই ছেড়ে যেত না।

মেসোপটেমিয়ার যে-অঞ্চলের নাম ছিল সুমের সে-অঞ্চলটিকে চাষবাসের উপযোগী করে তোলার জন্যে এমনি মেহনত করতে হয়েছিল। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যেকার এই অঞ্চলটি গোড়ার দিকে ছিল একটি বিস্তীর্ণ জলাভূমি। এই জলাভূমির মধ্যে কোথাও ছিল নলখাগড়ার জঙ্গল আর খেজুর গাছের জটলা, কোথাও বালি জমে জমে মরুভূমির মতো ধু-ধু খানিকটা ডাঙা-জমি। কতখানি মেহনত করার পরে এই অঞ্চলটিকে চাষবাসের উপযোগী করে তোলা সম্ভব তা শুধু কল্পনা করা চলে।

প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়া শহরটি গড়ে ওঠার পেছনেও এমনি একটি মেহনতের কাহিনী।

এমনিভাবে পশ্চিম এশিয়ার চাষযোগ্য ও বাসযোগ্য প্রত্যেকটি অঞ্চলে মানুষের মেহনতের সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগেছিল। এমনিভাবে মানুষ বাঁধা পড়েছিল জমির সঙ্গে।

অবশ্য জমির সঙ্গে বাঁধা পড়ার অন্য একটি কারণও ছিল। তা হচ্ছে ফলের গাছ। খেজুর, ডুমুর, জলপাই—এ-ধরনের নানারকম ফল চাষীদের ভোজ্যতালিকায় এসে গিয়েছিল। এসব ফল খুবই পুষ্টিকর, অনেকদিন রেখে দেওয়া চলে এবং একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে অসুবিধে নেই। গোড়ার দিকে মানুষ বনজঙ্গল থেকে এসব ফল সংগ্রহ করত। পরে নিজেদের জমিতেই ফলের গাছের চাষ করতে শুরু করেছিল। আমরা সকলেই জানি, ফলসমেত গাছগুলোকে এক জমি থেকে অন্য জমিতে চালান করা যায় না। কাজেই গাছের ফল ভোগ করতে হলে যেখানে গাছ জন্মানো হয়েছে তারই কাছাকাছি অঞ্চলে থাকা চাই। জমির সঙ্গে মানুষের বাঁধা পড়ার এটিও একটি বড়ো কারণ। ফলের গাছ

আর ফলের গাছের মালিকের একই অবস্থা—মাটিতে শেকড় গেড়ে বসতে হয়।

কুটির ও দালান

তাহলে দেখা যাচ্ছে, চাষের সঙ্গে সঙ্গে বাসের কথাও ভাবতে হয়। পুরাতন প্রস্তরযুগে এমন সময়ও ছিল যখন মানুষ আস্তানার কথা ভাবত না। প্রয়োজন বোধে কোনো একটা গুহায় কিছুদিন কাটিয়ে যেত। তারপর একসময়ে মানুষ আস্তানা তৈরি করত মাটিতে গর্ত খুঁড়ে। এ আস্তানাকেও এক ধরনের গুহাই বলা চলে—স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম। পুরাতন প্রস্তরযুগের শেষদিকে (বা মেসোলিথিক যুগে) মানুষ কাঠের গুঁড়ি সাজিয়ে কুটির তৈরি করতে শিখেছিল। এমনকি অনেক সময়ে জলাভূমির ওপরে মাচা তুলে কুটির তৈরি করত।

নূতন প্রস্তরযুগে যখন স্থায়ী বসতি গড়ে তোলার মতো অবস্থা তৈরি হল তখন থেকেই নিজের আস্তানার দিকে মানুষ বেশি-বেশি নজর দিতে পেরেছে। গোড়ার দিকে ছিল মাটিলেপা নল-খাগড়ার বেড়া, তারপরে শুধু মাটি—শেষকালে মাটির তৈরি ইট। কাদার সঙ্গে খড় মিশিয়ে কাঠের ছাঁচে ফেলে ইট তৈরি হত—পোড়ানো নয়, রোদে শুকিয়ে নেওয়া। কিন্তু এই ইট তৈরি করতে পারার পর থেকেই মানুষ কুটিরের স্তর থেকে সরাসরি উঠে এল দালানের স্তরে। আস্তানা তৈরির ব্যাপারে মানুষের কল্পনা মুক্তি পেল যেন। এতদিন পর্যন্ত কাঠের গুঁড়ি বা নলখাগড়া দিয়ে কুটির ছাড়া অন্য কিছু তৈরি করা চলত না, এবারে ইট গেঁথে গেঁথে মস্ত মস্ত ইমারত তুলতেও আর কোনো বাধা রইল না। খুশিমতো গড়ন দেওয়ার ব্যাপারেও নয়। এই আবিষ্কারটির মধ্যেই স্থাপত্যবিদ্যার সূত্রপাত।

তবে পোড়ামাটির পাত্র তৈরি করতে শিখে মানুষ যেমন গোড়ার

দিকে পুরনো যুগের পাত্রের আদলটা বজায় রাখতে চেষ্টা করত—ইটের তৈরি দালানের ব্যাপারেও তাই হয়েছিল। গোড়ার দিকে ইটের তৈরি দালানের গড়নটিও এমন করা হত যেন তার মধ্যে কুটিরের আদল থাকে। এবং তা করতে গিয়ে সে-যুগের সুমের ও আসিরিয়ার মানুষরা আশ্চর্য একটি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। তা হচ্ছে আর্চ বা অর্ধবৃত্তাকার খিলান তৈরি করা। আগেকার কালে এরা কুটির তৈরি করত সুড়ঙ্গের (টানেল) মতো করে। অর্থাৎ, অর্ধবৃত্তাকার একটি আচ্ছাদন। কিন্তু ইট গেঁথে গেঁথে অর্ধবৃত্তাকার আচ্ছাদন তৈরি করতে হলে ইট সাজাবার বিশেষ একটি কায়দা জানা চাই। ঠেলা ও চাপ সম্পর্কে কোনো তত্ত্বগত জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও সুমের ও আসিরিয়ার মানুষ এই কায়দাটি আবিষ্কার করতে পেরেছিল।

আবিষ্কার শুধু এই একটি নয়, আরো। যেমন, কোনো একটি ইটের পাঁজায় মোট কত ইট আছে তা গণনা করার পদ্ধতি। প্রত্যেকটি ইটকে আলাদা আলাদা গোনার দরকার নেই, মোট ইটের সংখ্যা হচ্ছে তিনটি সংখ্যার গুণফল। এই সংখ্যা তিনটি হচ্ছে লম্বার দিকে আর চওড়ার দিকে আর খাড়াইয়ের দিকে এক-এক সারির ইটের সংখ্যা। আমরা জানি, সিন্দুকের আকারের কোনো বস্তুর ঘনফল বার করার পদ্ধতিও এই। তার মানে, আমরা যদি বলি যে ইটের পাঁজার ইট গণনা করার পদ্ধতি আবিষ্কার করে নূতন প্রস্তর-যুগের মানুষ ফলিত গণিতের সূত্রপাত করেছিল—তাহলে ভুল বলা হয় না।

প্রত্নবিদদের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের অনেক আগেই সিরিয়ায় বা মেসোপটেমিয়ায় রোদে শুকিয়ে নেওয়া মাটির ইটের প্রচলন হয়েছিল।

আর সবচেয়ে বড়ো কথা, একক চেষ্টায় একটি কুটির হয়তো তৈরি করা সম্ভব কিন্তু দালান কিছুতেই নয়। তার মানে, দালান হচ্ছে যৌথ কর্মের নিদর্শন—অনেক মানুষের একজোট হওয়ার সাক্ষ্য।

লেনদেন হবার মতো বাস্তব অবস্থা তৈরি হতে হলে চাষীদের হাতে উদ্বৃত্ত শস্য থাকা চাই। আমাদের আলোচনা যতদূর এগিয়েছে তা থেকে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে এমনি একটি অবস্থা নদী-উপত্যকা ও মরূদ্যানগুলোতে তৈরি হয়েছিল।

আমরা আগে আলোচনা করেছি, চাষের জমি বাড়াতে হলে একদল মানুষকে জোট বেঁধে জমি হাসিল করতে হয়। এই মানুষ-গুলো সরাসরি খাদ্য উৎপাদক নয় অথচ এদের জন্যেও খাদ্যের যোগান থাকা দরকার। ইটের ইমারত তুলতে হলেও একই অবস্থা। অর্থাৎ ধরে নিতে হয় যে কৃষিকাজ শুরু হবার কিছুকালের মধ্যেই চাষীদের হাতে বাড়তি শস্য মজুদ হয়েছিল। আর তারই ফলে এই প্রথম এমন একদল মানুষের দেখা পাওয়া যেতে লাগল যারা সরাসরি খাদ্য-উৎপাদক নয়।

এই সঙ্গে অন্য একদল মানুষের কথাও ভাবা দরকার, যারা তখনো পর্যন্ত জন্তুজানোয়ার ও মাছ শিকার করত, বা যারা ছিল যাযাবর রাখাল। অনুমান করা চলে, এদের সঙ্গে গ্রামের চাষীদের একটা লেনদেনের সম্পর্ক গড়ে ওঠা অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। চাষীদের হাতে উদ্বৃত্ত শস্য আছে, এটুকু যদি আমরা ধরে নিই তাহলে চাষীদের সঙ্গে যাযাবরদের লেনদেন হতে কোনো বাধা নেই। তাতে দু'দলেরই সুবিধে, দু'দলই তাতে উপকৃত হয়। লেনদেনের ফলে চাষীরা পায় মাংস, মাছ ও পশুপালকদের তৈরি নানা জিনিস আর যাযাবররা পায় শস্য। এবং এই লেনদেনের সম্পর্কটা গড়ে ওঠার পরে একদল আরেক দলের ওপরে নির্ভর করতে শুরু করে। এ-ধরনের পরস্পর-নির্ভরতা (অর্থাৎ সরাসরি পণ্য-বিনিময়ের মারফত লেনদেন) এমনকি আজকের দিনেও একেবারে লোপ পায় নি।

এই লেনদেনের সম্পর্কটি ঠিক কোন সময় থেকে গড়ে উঠেছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে লিখিত ইতিহাস শুরু হবার

অনেক আগে থেকে নিশ্চয়ই। মিশরদেশে প্রাগৈতিহাসিক কালের যে-সমস্ত কবর পাওয়া গিয়েছে তা থেকে জানা যায় যে একেবারে গোড়ার দিকে মিশরের চাষীরা চাষও করত, আবার শিকারও করত। তাদের শিকারের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছে তাদের কবরের মধ্যে। কিন্তু গোড়ার অবস্থা পার হয়ে যাবার পরে সেই একই গ্রামের কবরে শিকারের অস্ত্রশস্ত্রের চিহ্নমাত্র নেই। একটি ব্যাখ্যা এই যে চাষীদের সঙ্গে শিকারীদের লেনদেনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং পরবর্তীকালে চাষীরা আর নিজেদের হাতে শিকার করার প্রয়োজন বোধ করত না।

লেনদেনের একটা সম্পর্ক যে সত্যিই গড়ে উঠেছিল তার সপক্ষে আরো জোরালো সাক্ষ্য আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে এক-এক অঞ্চল থেকে এমন সব জিনিস পাওয়া গিয়েছে যা নিঃসন্দেহে অন্য কোনো অঞ্চল থেকে নিয়ে আসা। এ ঘটনা কোন অবস্থায় সম্ভব? একটি লেনদেনের সম্পর্ক যদি থাকে। যেমন, নূতন প্রস্তরযুগের মিশরের গ্রামে লোহিত ও ভূমধ্যসাগরীয় জীবের খোলা পাওয়া গিয়েছে। আরো কিছুকাল পরে পাওয়া গিয়েছে ম্যালাকাইট (সবুজরঙের আকরিক তামা), রজন, ল্যাপিস ল্যাজিউলাই (সোনালী আভাযুক্ত নীল পাথর) ও অব্‌সিডিয়ান (কাচের মতো দেখতে একধরনের পদার্থ—স্বাভাবিক অবস্থাতেই পাওয়া যায়)। আরো কিছুকাল পরে পদ্মরাগমণি ও নীলকান্তমণি। যতো সময় পার হয়েছে ততোই এ-জিনিসগুলো বেশি বেশি পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে। যে-সব জিনিসের নাম বলা হল তার সবগুলোই অন্য অঞ্চল থেকে নিয়ে আসা। কোনোটাই খাস মিশরের নয়।

আরো দৃষ্টান্ত আছে। সুমের, সিরিয়া, আসিরিয়া ও আরো নানা অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন একই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে নূতন প্রস্তরযুগের গোড়ার অবস্থা পার হয়ে যাবার পরে মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছিল একটি লেনদেনের ব্যবস্থা—গ্রামের

চাষীদের সঙ্গে যাযাবর শিকারী ও পশুপালকদের একটি যোগাযোগের সম্পর্ক। এ থেকেই বাণিজ্যের শুরু।

বিলাস নয়—ম্যাজিক

মিশরীয়রা ম্যালাকাইট ব্যবহার করত চোখে লাগাবার সুর্মা হিসেবে। এই ব্যাপারটা নিয়ে তাদের ব্যবস্থাপনা কম ছিল না। ম্যালাকাইট রাখা হত সুন্দর কারুকার্য করা চামড়ার থলিয়ার মধ্যে। ম্যালাকাইট গুঁড়ো করার শিল (প্যালেট) হত এমন ছাঁদের যেন তাতে কোনো পশুর চেহারার আদল আসে। ম্যালাকাইটের সবুজ রঙ চোখকে বাঁচাত রোদের ঝলক থেকে আর ম্যালাকাইটের কপার কার্বনেট চোখকে বাঁচাত রোগ থেকে। মিশরীয়দের পক্ষে ভাবা সম্ভব ছিল না যে এ হচ্ছে বস্তুর বিশেষ গুণ। তারা মনে করত, ম্যালাকাইটের আত্মা এই অলৌকিক ব্যাপার ঘটাচ্ছে। কাজেই গোটা অনুষ্ঠানটিই তাদের কাছে হয়ে উঠেছিল একটা ম্যাজিক। এই কারণেই ম্যালাকাইট রাখার থলিয়ার ওপরে জন্তুজানোয়ারের মূর্তির অলংকরণ থাকত এবং এই কারণেই ম্যালাকাইট গুঁড়ো করার শিলটিকে জন্তুজানোয়ারের মূর্তির মতো করে গড়া হত। অর্থাৎ, এই প্রক্রিয়াগুলো তাদের কাছে হয়ে উঠেছিল রিচুয়াল।

শুধু ম্যালাকাইট নয়, অন্য অঞ্চল থেকে নিয়ে আসা সমস্ত জিনিস সম্পর্কেই তাদের এই একই মনোভাব। বিলাস নয়, প্রসাধন নয়—ম্যাজিক। যেমন ধরা যাক, কড়ি। কড়ির বিশেষ গড়নের জন্যে মনে করা হত যে কড়ি ধারণ করলে জমি সুফলা হবে। মনে করা হত, কড়ির মধ্যে একটা অলৌকিক শক্তি আছে। এ থেকে এশিয়া ও আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলে মুদ্রা হিসেবে কড়ির প্রচলন হয়েছিল।

পদ্মরাগমণি, নীলকান্তমণি বা এ-ধরনের পাথর ধারণ করার

পেছনেও ছিল এই ম্যাজিক বা জাদুবিশ্বাস। বিশ্বাস করা হত যে পাথর ধারণ করলে সাফল্য, সম্পদ, দীর্ঘজীবন ও বহু সন্তান লাভ করা সম্ভব হবে। প্রাচীন পুঁথিতেও এ-বিশ্বাসের সমর্থন আছে। তারপরে কয়েক হাজার বছর পার হয়ে যাবার পরে, এমনকি আজকের দিনেও আমরা এই জাদুবিশ্বাসের মূল একেবারে উপড়ে ফেলতে পারি নি।

এমনিভাবে প্রত্যেকটি জিনিসই কোনো না কোনো ম্যাজিকের উপকরণ হয়ে উঠেছিল। এবং এই ম্যাজিকের গুণকে আরো বাড়াবার জন্যে জিনিসগুলোকে একটা নির্দিষ্ট আকার দেওয়া হত। যেমন, ল্যাপিস ল্যাজিউলাই-এর খণ্ডকে আকার দেওয়া হত ষাঁড়ের। বিশ্বাস করা হত যে এই ষাঁড়ের মূর্তিটিকে শরীরে ধারণ করলে ষাঁড়ের মতো বীর্যবত্তা লাভ করা সম্ভব। এমনি নানা ধরনের পাথর থেকে নানা ধরনের মূর্তি।

এ থেকেই পাথর-কাটার শিল্পের সূত্রপাত। এক খণ্ড শক্ত পাথরকে কেটেকুটে নির্দিষ্ট একটা আকার দেওয়া বড়ো সহজ নয়। একখণ্ড পাথর থেকে একটি পুঁতি তৈরি করতে হলে যে কারিগরী দক্ষতা থাকা দরকার তা আয়ত্ত করাও বড়ো সহজ নয়। কিন্তু সেই প্রাগৈতিহাসিক কালেই এই দুরূহ দক্ষতা প্রাচ্যের কয়েকটি দেশে অর্জিত হয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে আরো দুটি আনুষঙ্গিক দক্ষতা। একটি হচ্ছে, পাথরকে পালিশ করা। অপরটি হচ্ছে, পাথরের গায়ে খোদাই করে কোনো একটি চিহ্ন বসানো। সে-যুগে পালিশ করা ও খোদাই করার ব্যাপার দুটিও রিচুয়ালের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল।

সীলমোহর ও ট্যাবু

পাথরের গায়ে চিহ্ন খোদাই করার পরে পাথরটি দিয়ে একটি

অদ্ভুত কাণ্ড ঘটানো চলত। কাদামাটি বা কাদামাটি-ধরনের কোনো জিনিসের ওপরে পাথরটি চেপে ধরলে পাওয়া যেত খোদাই-করা চিহ্নটির একটি প্রতিচ্ছবি। আমাদের কাছে অবশ্য ব্যাপারটার মধ্যে অলৌকিক কিছু নেই। আমরা এই উপায়েই সীলমোহর দিয়ে থাকি। কিন্তু জাদুবিশ্বাসী মানুষের কাছে এ-ঘটনাই হয়ে উঠেছিল একটি জাদুক্রিয়া। তারা মনে করত, পাথরের অলৌকিক শক্তির কিছুটা অংশ এই উপায়ে কাদামাটি বা কাদামাটি-ধরনের জিনিসটির মধ্যে চালান করে দেওয়া গেল। ফলে জিনিসটি আর সাধারণ একটি জিনিস রইল না—তার মধ্যেও সঞ্চারিত হল জাদুগুণ। তখন সেই জিনিসটিকে আর সাধারণ চোখে দেখা চলত না, অনেকগুলো বিধি-নিষেধ ও আচারকানুন মেনে চলতে হত। এবং জাদুবিশ্বাসী মানুষ বিশ্বাস করত যে কোথাও এতটুকু স্খলন হলে জিনিসটির জাদুশক্তি তার জীবনে চরম সর্বনাশ ডেকে আনবে।

পুরাবিদরা এ-ব্যাপারটির নাম দিয়েছেন ট্যাবু। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কতকগুলো জিনিস সম্পর্কে নির্দিষ্ট কতকগুলো বিধিনিষেধ ও আচার-কানুন মেনে চলা। যেমন ধরা যাক, একটি কলসীর মুখ মাটি দিয়ে বন্ধ করে তার ওপরে ট্যাবু দেগে দেওয়া হল। তার মানে, মাটি ভেঙে এই কলসীর মুখটি আর কিছুতেই খোলা চলবে না। যে খুলবে তার জীবনে জাদুক্রিয়ার প্রভাবে চরম সর্বনাশ আসবে।

রত্নের সন্ধানে

জাদুবিশ্বাসী মানুষ বিশ্বাস করত যে উজ্জ্বল আভাবিশিষ্ট কতক-গুলো পাথরের মধ্যে আর সোনার মধ্যে জাদুগুণ আছে। কাজেই সোনা ও পাথর সংগ্রহ করার সুযোগ তারা কখনো হাতছাড়া করত না। দাম হিসেবে দিতে হত শস্য ও ফল। এ-ব্যাপারে তাদের কার্পণ্য ছিল না কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল যে সোনা ও পাথরের

জাতুগুণ তাদের জমিকে সুফলা ও জীবনকে সমৃদ্ধ করবে। এই বিশেষ অবস্থার জন্যেই চাষীদের সঙ্গে যাযাবরদের লেনদেনের সম্পর্কটি আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। যাযাবররা নানা দেশ থেকে সংগ্রহ করে আনত সোনা ও পাথর আর চাষীরা আগ্রহের সঙ্গে শস্য ও ফসলের বিনিময়ে তা সংগ্রহ করত। এ-সমস্ত কারণে, নূতন প্রস্তর-যুগের গোড়ার অবস্থা পার হয়ে যাবার পরে, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলোর সঙ্গে নানা অঞ্চলের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। একটা লেনদেনের ব্যবস্থা পাকাপাকিভাবে কায়েম হয়ে বসেছিল।

ফলে নানা নতুন নতুন অঞ্চলের সঙ্গে মানুষের পরিচয়। কেননা, উজ্জ্বল আভাবিশিষ্ট পাথরের সন্ধানে ঢুঁড়ে বেড়াতে হয়েছিল মানুষকে। খনিজ অঞ্চলের সন্ধান রাখতে হয়েছিল। নানা ধরনের খনিজ পাথর নাড়াচাড়া করতে হয়েছিল। ম্যালাকাইটের কথা আগেই বলেছি। এটি হচ্ছে আকরিক বা খনিজ তামা। রসায়নের ভাষায় কার্বনেট অব কপার। এই ম্যালাকাইট থেকেই সে-যুগের মানুষ তামা আবিষ্কার করেছিল। মানুষের দ্বিতীয় বিপ্লবের বা নগর-বিপ্লবের সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার। কাজেই যদি বলা হয় যে মানুষের জাতুবিশ্বাস পরোক্ষভাবে হলেও মানুষের দ্বিতীয় বিপ্লবের রূপায়ণে সাহায্য করেছে তাহলে ভুল বলা হয় না।

তামার আবিষ্কার

এমনও হতে পারে যে তামা আবিষ্কার হয়েছিল কোনো একটি আকস্মিক ঘটনা বা দুর্ঘটনার ফলে। হয়তো কারও হাত থেকে একখণ্ড ম্যালাকাইট জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। আগুন নিভে যাবার পরে দেখা গেল, ছাইয়ের গাদার মধ্যে কি যেন চকচক করছে। কিংবা হয়তো একদল যাযাবর কোনো খনিজ অঞ্চলে তাঁবু ফেলে আগুন জ্বালিয়েছিল। আগুন নিভে যাবার পরে দেখা গেল,

যে-পাথরটির ওপরে আগুন জ্বালানো হয়েছিল সেটি গলে গিয়েছে আর ছাইয়ের গাদার মধ্যে চকচকে কি একটা জিনিস।

এমনি ধরনের কোনো একটি ঘটনার মধ্যে দিয়েই প্রাগৈতিহাসিক মানুষ বিশুদ্ধ তামার সন্ধান পেয়েছিল।

অবশ্য শুধু সন্ধান পাওয়াটাই কোনো কাজের কথা নয়। আরো ছটি আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে জানতে হয়েছিল যে তামাকে উত্তপ্ত করলে তামা গলে যায় আর তখন সেই গলানো তামা ছাঁচে ঢেলে খুশিমতো গড়ন দেওয়া চলে; আবার ঠাণ্ডা হলেই তামা পাথরের মতো শক্ত ও নিরেট, তখন সেটিকে পাথরের মতোই ঘষেমেজে ধারালো করা চলে। জানতে হয়েছিল যে বিশুদ্ধ তামা পেতে হলে ম্যালাকাইট বা অন্য কোনো আকরিক তামাকে অঙ্গারের সঙ্গে মিশিয়ে উত্তপ্ত করা দরকার।

পাথরের চেয়ে তামা যে অনেক উঁচুদরের জিনিস—এটুকু জানার জন্যেও প্রাগৈতিহাসিক মানুষকে অনেক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। পাথরের হাতিয়ার সহজেই ভেঙে যেতে পারে, সহজেই অকেজো হয়ে যায়। কিন্তু তামার হাতিয়ার অকেজো হয়ে গেলেও বাতিল করতে হয় না। সেটিকে গলিয়ে নিলেই আবার আনকোরা নতুন একটি হাতিয়ার। একখণ্ড পাথর বা একটুকরো হাড় থেকে হাতিয়ার বানাতে হলে মূল পাথরের খণ্ড বা হাড়ের টুকরো থেকে কাটা-ঘষা-ঠোকা-মাজা ধরনের কোনো প্রক্রিয়ায় খানিকটা অংশ বাদ দিতে হয়। অনেক বাদসাদ দেবার পরেই হাতিয়ারের গড়নটি ফুটে ওঠে। অনুমান করা চলে যে শেষ পর্যন্ত হাতিয়ারের গড়নটি কী হবে তা অনেকখানি নির্ভর করে মূল পাথরের খণ্ড বা হাড়ের টুকরোর গড়নের ওপরে। কিন্তু তামার হাতিয়ার তৈরি করার' বেলায় এ-ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীনতা। তামার হাতিয়ারের গড়নটি কী হবে তা নির্ভর করে ছাঁচের ওপরে। আর এই ছাঁচটি কুমোরের কাদামাটি দিয়েও তৈরি করা চলে। কাজেই খুশিমতো গড়নের ছাঁচ তৈরি করতে কোনো বাধা নেই।

অবশ্য এসব অভিজ্ঞতা পুরোপুরি মেনে নেওয়া সেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের পক্ষে বড়ো সহজ ছিল না। যা ছিল পাথরের মতো নিরেট তাই হয়ে উঠছে জলের মতো টলটলে, যা ছিল জলের মতো টলটলে তাই হয়ে উঠছে পাথরের মতো নিরেট ; আবার একখণ্ড আকারহীন আকরিক তামা উত্তপ্ত হবার পরে হয়ে উঠছে তরল পদার্থ, ঢালাই হবার পরে সুনির্দিষ্ট আকারের একটি হাতিয়ার—এসব অভিজ্ঞতা তার এতকালের সমস্ত চিন্তা ও ধারণাকে ওলোটপালোট করে দিয়েছিল। বস্তুজগৎ সম্পর্কে তাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছিল।

কামারশালা

আকরিক তামা থেকে বিশুদ্ধ তামা পেতে হলে একটি প্রক্রিয়া ঠিকমতো প্রয়োগ করা চাই। আর সেজন্যে দরকার আরো অনেকগুলো আবিষ্কার। তামা গলাতে হলে বারো-শো ডিগ্রির কাছাকাছি উত্তাপ দরকার। শুধু শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে এত বেশি উত্তাপ পাওয়া সম্ভব নয়—সেজন্যে বাতাসের ঝাপ্‌টা চাই। কাজেই আগুনের ভেতর দিয়ে বাতাসের ঝাপ্‌টা দেবার জন্যে একটা কিছু উপায় আবিষ্কার করতে হয়েছিল। এই উপায়টির নাম হচ্ছে হাপর। কিন্তু আমরা যে-সময়ের কথা বলছি তখনো হাপর আবিষ্কার হয় নি। যতোদূর জানা গিয়েছে, খ্রীষ্টপূর্ব ১৬০০ সালের আগে সত্যিকারের হাপর ছিল না। যাই হোক, বাতাসের ঝাপ্‌টা দেবার একটা কিছু উপায় নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তারপরেও আরো কতকগুলো জিনিস চাই। যেমন, চুল্লী, ধাতু গলাবার পাত্র ও চিমটে। এই তিনটি জিনিসই আবিষ্কার করতে হয়েছিল। তারপর চাই ঢালাই করার জন্যে ছাঁচ। যে-সব জিনিসের একদিকে সমতল অপরদিকে প্যাটার্ন—তার ছাঁচ তৈরি করা শক্ত ব্যাপার নয়। কাদামাটির ওপরে

প্যাটার্নের দিকটা চেপে ধরলেই একটি ছাপ পড়ে। সেই ছাপের ওপরে গলা তামা ঢেলে দিলে হুবহু প্যাটার্নটি উঠে আসে। কিন্তু যে-সব জিনিসের দু'দিকেই প্যাটার্ন—যেমন ধরা যাক একটি ছোরা —তার ছাঁচটি জোড়া হওয়া দরকার। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালে মেসো-পটেমিয়ায় জোড়া-ছাঁচ তৈরি করার একটা বিশেষ পদ্ধতি ছিল। প্রথমে মোম দিয়ে জিনিসটি তৈরি করে নেওয়া হত। তারপর মোমের ওপরে লাগানো হত কাদামাটির পুরু প্রলেপ। তারপর সেটিকে পোড়ানো হত। কাদামাটি হয়ে উঠত পোড়ামাটি আর মোম গলে বেরিয়ে আসত। তারপর এই পোড়ামাটির ছাঁচে ঢালা হত গলা তামা। শেষকালে পোড়ামাটির আস্তরটিকে ভেঙে জিনিসটিকে বার করা হত।

কাজেই দেখা যাচ্ছে তামার হাতিয়ার তৈরি করার ব্যাপারটি যতো সহজে বর্ণনা করা হয়েছিল ততো সহজ নয়। এজন্যে রীতিমতো একটি কামারশালা বসাতে হয়েছিল।

কামার

তামার হাতিয়ার তৈরির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যতোটুকু বলা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায়, তামা-কারিগরের (আমরা তামা-কারিগরের বদলে কামার শব্দটিই ব্যবহার করব) কাজটি অবসর-সময়ের কাজ হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ কামার হবে আলাদা একজন মানুষ। চাষের কাজ থেকে তাকে পুরোপুরি রেহাই দিতে হবে। হালের আদিবাসীদের দিকে তাকালেও দেখা যায় যে কোথাও চাষী আর কামার একই মানুষ নয়। সর্বত্রই কামারের কাজের বিশেষ মর্যাদা। কিন্তু কামার নিজের হাতে খাদ্য উৎপাদন করে না। ফলে, চাষীর হাতে এমন উদ্বৃত্ত খাদ্য থাকা দরকার যা থেকে কামারকে সারা বছরের খাদ্যের যোগান দেওয়া সম্ভব।

তখনো পর্যন্ত মানুষ লিখতে জানে না। সেক্ষেত্রে চাষী বা কুমোরের মতো কামারকেও তৈরি করতে হয় গাথা, বচন ও গীতি, যার মাধ্যমে সে তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পরের পুরুষকে জানিয়ে যেতে পারে। কামারের কাজটি খুবই জটিল ও দুরূহ। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তাকে তার কাজের প্রত্যেকটি ধাপ জানতে হয়েছে। এ অবস্থায়, অনুমান করা চলে, তার তৈরি গাথা, গীতি ও বচনও হয়েছিল অজস্র। এসব গাথা গীতি ও বচনের মধ্যেই ফলিত বিজ্ঞানের সূত্রপাত। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা নামে বিজ্ঞানের যে দুটি শাখা গড়ে উঠেছে তার মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রায় সবটুকুই আছে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যেটুকু নেই তা হচ্ছে সে-যুগের মানুষের জাদুবিশ্বাস।

এ-অবস্থায় যে-সে কামার হতে পারে না। সেজন্যে বিশেষ একটি বিদ্যা অর্জন করতে হয়। এবং এই বিদ্যার গুরুত্ব এত বেশি যে এই বিদ্যার অধিকারীদের পক্ষে সরাসরি খাদ্য-উৎপাদক হওয়া সম্ভব নয়। নিজেদের কাজ নিয়েই তাদের সারাক্ষণের ব্যস্ততা। এ থেকে একটি সিদ্ধান্ত করা চলে। কোনো একটি গোষ্ঠীতে যদি কামার থাকে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে সেই গোষ্ঠীর মেহনতের মধ্যে ইতরবিশেষ আছে। সকলের একধরনের মেহনত নয়, কারও কারও বিশেষ ধরনের। আমরা এটুকুও ধরে নিতে পারি যে সেই গোষ্ঠীর চাষীরা যে-পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করে তা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। এতটা বেশি যে কিছু লোক সরাসরি খাদ্য-উৎপাদক না হলেও খাদ্যের ঘাটতি হয় না।

কিন্তু এ-ব্যাপারটির মধ্যে আরো বড়ো একটি কথা আছে।

আকর থেকে ধাতু

আকর থেকে ধাতু তৈরি করার প্রক্রিয়াটির মধ্যে এমন কিছু

জটিলতা নেই। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি শুরু হবার পরে জটিলতা দেখা দিয়েছিল অন্য কতকগুলো দিকে।

এতদিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি গোষ্ঠী ছিল স্ব-নির্ভর। অর্থাৎ, জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণের যোগান পাবার ব্যবস্থা নিজেদের মধ্যেই পুরোমাত্রায় ছিল। কিন্তু এবারে সেটিকে আর অটুট রাখা গেল না। জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় একটি উপকরণ হিসেবে তামার মর্যাদালাভের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার পদ্ধতির স্ব-নির্ভরতা লোপ পেল।

তামার আকর যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না। পলিমাটির দেশে তো নয়ই। কাজেই নূতন প্রস্তরযুগের চাষীদের তামা পাবার একমাত্র উপায় একটা কিছু লেনদেনের ব্যবস্থার মধ্যে আসা। জঙ্গল বা পাহাড় অঞ্চল থেকে যারা আকরিক তামা সংগ্রহ করে আনে তাদের কাছ থেকে দাম দিয়ে তা কিনে নেওয়া। কী দাম তারা দিতে পারে? ভাঁড়ারের শস্য ছাড়া আর কী আছে তাদের হাতে? তাই তারা দেয়। কিন্তু সেজন্যে তাদের নিজেদের খাদ্যে ঘাটতি পড়ে না। অর্থাৎ, চাষীরা উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পেরেছিল। শুধু তাই নয়, আকর থেকে ধাতু তৈরি করতে গিয়ে তাদের চিন্তাজগতেও নতুন একটা ধারণার জন্ম হয়েছিল। আকরের একটি চাঙড়ার (যা চোখের দেখায় পাথর ছাড়া কিছু নয়) ভোল পাল্‌টিয়ে বিশুদ্ধ তামা (যার সঙ্গে চেহারার দিক থেকে পাথরের কোনো মিল নেই) হয়ে ওঠাটা সে-যুগের মানুষের কাছে নিশ্চয়ই অবাক হবার মতো ঘটনা মনে হয়েছিল। এ-থেকে তাদের মনে এ-চিন্তা আসা অস্বাভাবিক নয় যে একটি বস্তু আগুনে পুড়ে সম্পূর্ণ নতুন আরেকটি বস্তু হয়ে উঠছে। এটি বস্তুরই একটি ধর্ম। এ-ধরনের ধারণা থেকেই পরবর্তীকালের অ্যালকেমির সূত্রপাত। অ্যালকেমিস্টরা বিশ্বাস করত যে লোহাকেও কতকগুলো বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সোনায় রূপান্তরিত করা যায়।

পাথর থেকে ধাতু তৈরি করা যেতে পারে—এ ধারণার সপক্ষে

হাতেনাতে প্রমাণ পাবার পরে মানুষ নিশ্চয়ই আরো নানা ধরনের পাথর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিল। ফলে তামা ছাড়াও অন্য আরো কয়েকটি ধাতুর সন্ধান পাওয়া অসম্ভব নয়। অবশ্য প্রত্যেকটি চেষ্টাই যে সফল হয়েছিল তা নয়। তবে সবকটিই ব্যর্থ হয়েছিল এমন মনে করারও কোনো কারণ নেই। মিশরদেশের প্রাগৈতিহাসিক কালের কবরে রুপো ও সীসে পাওয়া গিয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০০ সালের আগেই মেসোপটেমিয়ায় এ-দুটি ধাতুর ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। মিশরে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের কিছু আগের কবর থেকে উল্কাপিণ্ডের লোহার টুকরো পাওয়া গিয়েছে। আরো কিছুকাল পরে মেসোপটেমিয়ায় আকর-লোহা থেকে লোহা তৈরি হয়েছিল। তবে এখানে স্পষ্ট করে বলা দরকার যে খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ সালের আগে পৃথিবীর কোনো অংশেই ব্যাপকভাবে লোহার ব্যবহার শুরু হয় নি। ধাতু হিসেবে টিনের প্রথম প্রচলন হয়েছিল সুমের-এ ও সিন্ধু-উপত্যকায় খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের কিছু পরে। অবশ্য টিন প্রধানত ব্যবহার করা হত তামার সঙ্গে মিশিয়ে সংকরধাতু তৈরি করার জন্যে।

খনি-ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে আধুনিক অর্থে আমরা যা বুঝি তা অবশ্য নয়। কিন্তু তবুও সে-যুগের মানুষ মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে আকরিক তামা কেটে তোলার কাজে যতোখানি পরিকল্পনা ও দূরদর্শিতা দেখাতে পেরেছিল তা এ-যুগের মানুষের কাছেও তারিফ করার মতো ব্যাপার বলে মনে হবে।

গোড়ার দিকে অবশ্য মাটির ওপর থেকেই আকরিক তামা সংগ্রহ করা হত। অনুমান করা চলে, সে-সময়ে মাটির ওপরের স্তরেও আকরিক তামার যোগান কম ছিল না। সেই যোগান নিঃশেষ

হবার পরে মানুষ মাটি খুঁড়ে আকরিক তামার সন্ধান করেছিল। এ কাজটি শুনতে যতোটা সহজ মনে হচ্ছে বাস্তবে ততোটা নয়। প্রথমত দরকার পাথরের চাঁইকে ফাটানো, আধুনিক কালে ডিনামাইটের সাহায্যে যা করা হয়। কিন্তু সে-যুগের মানুষও এ-ব্যাপারে কম কৃতিত্বের পরিচয় দেয় নি। প্রথমে পাথরের চাঁইকে আগুনে তাতিয়ে তুলত। তারপরে দিত জলের ছিটে। সঙ্গে সঙ্গে পাথর ফেটে চৌচির। আরও নানান ধরনের কাজ ছিল। খনির ভেতরকার দেওয়ালের গায়ে ঠেকা তোলা, ছাদ যাতে ধসে না পড়ে সেজন্যে পিলার রাখা, পাথর ভেঙেচুরে আকরিক তামার অংশটিকে আলাদা করা, আকরিক তামা খনির ভেতর থেকে খনির বাইরে তুলে আনা, ইত্যাদি। এতসব কাণ্ডকারখানা করার পরে শুরু হত তামা তৈরির আসল প্রক্রিয়াটি। তাদের সম্বল ছিল সামান্য কয়েকটা প্রাথমিক ধরনের হাতিয়ার। এই সামান্য সম্বল নিয়েই তারা খনির গর্ভ থেকে রত্ন তুলে আনত।

শিল্পগত দক্ষতা

খনিজ আকরকে চুল্লীতে গলিয়ে ধাতুকে পৃথক করার প্রক্রিয়াটিকে ইংরেজিতে বলে স্মেল্টিং। এ-ব্যাপারটির মধ্যেও জটিলতা একেবারে নেই তা নয়। ঠিকমতো একটি চুল্লী বা ফারনেস তৈরি করতে হলেও নানা দিকে নজর রাখা দরকার। তাছাড়া, মাটির ওপরের স্তরের আকর একভাবে গলাতে হয়, মাটির ভেতরের স্তরের আকর অন্যভাবে। আবার একই চুল্লীতে সমস্ত রকমের ধাতুর আকর গলানো চলে না। তামার আকরের জন্যে একরকম চুল্লী, সীসের আকরের জন্যে একেবারে অন্যরকম। এমনি নানান সমস্যা।

কাজেই বোঝা যাচ্ছে, যারা খনি খুঁজে বার করত, যারা খনি থেকে আকর তুলে আনত আর যারা আকর গলিয়ে ধাতু তৈরি করত

—তাদের বিদ্যা কামারের বিদ্যার চাইতেও অনেক বেশি জটিল ও দুরূহ। খনিজ আকর দেখে চিনতে পারা কোনটি কোন ধাতুর আকর এবং বুঝতে পারা কোন আকরকে কোন প্রক্রিয়ায় গলাতে হবে—এসব জ্ঞান অনেক মানুষের অনেক অভিজ্ঞতার মোট ফল। এবং একেবারেই বিশেষ ধরনের জ্ঞান। কুমোর বা কামারের কাজে এতখানি বিশেষত্ব নেই। এসব কাজ যাদের করার কথা তাদের পক্ষে খাদ্য-উৎপাদক হওয়া কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। বিশেষ করে যারা খনিতে কাজ করে তাদের কাজের ধরনটাই এমন যে অন্য কোনো দিকে সময় দেওয়া চলে না। মোটামুটিভাবে বলা চলে, খনির ও ধাতু-তৈরির কাজ যারা করত তাদের খাদ্য-সংস্থানের জন্যে পুরোপুরি নির্ভর করতে হত চাষীদের উদ্বৃত্ত শস্যের ওপরে।

পাথরের বদলে ধাতু

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে বলা চলে, খ্রীষ্টপূর্ব ৪০-০ সালের কাছাকাছি সময় থেকেই প্রাচ্যদেশে খনি থেকে আকর তোলা ও ধাতু তৈরির কাজ মোটামুটি ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে সঙ্গে সঙ্গে পাথরের হাতিয়ার বাতিল হয়ে গিয়ে ধাতুর হাতিয়ারের চল হয় নি। যদিও পাথরের চেয়ে ধাতুর হাতিয়ারে অনেক বেশি সুবিধে, কিন্তু বাস্তব অবস্থা ধাতুর হাতিয়ারের চল হবার পক্ষে তখনো পর্যন্ত পুরোপুরি সহায়ক ছিল না। চাষীদের কথাই ধরা যাক। মাটি আলগা করার জন্যে ব্যবহার করা হত কোদাল এবং পাথরের ফলার কোদাল দিয়েই দিব্যি কাজ চালিয়ে যাওয়া যেত। অবশ্য একথা সত্যি যে একই ফলা খুব বেশিদিন চলত না, ঘন ঘন ফলা বদলাতে হত—কিন্তু নতুন একটি ফলা বানিয়ে নেওয়া এমন কিছু ঝামেলার ব্যাপার নয়। একখণ্ড চকমকি পাথরকে ঘষেমেজে নিলেই তো নতুন একটি ফলা। চকমকি পাথর দুষ্প্রাপ্য না হলে

আর সময় হাতে থাকলে নতুন ফলা বানিয়ে নিতে কোনো অসুবিধে নেই।

কিন্তু উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার যে-অঞ্চলের ওপর আমরা নজর রেখেছি সেটি মোটামুটি পলিমাটির অঞ্চল। চকমকি পাথর সেখানে সহজলভ্য নয়। এই বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থার জন্যেই শেষ পর্যন্ত ধাতুর হাতিয়ারের চাহিদা হয়েছিল। এবং এই চাহিদা পূরণ করার জন্যে দরকার হয়েছিল বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই অবস্থাতেই ছুটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হয়। একটি হচ্ছে জোয়াল, অন্যটি পাল। এ-ছুটি আবিষ্কার মানুষকে ছু'ধরনের শক্তির উৎসের সন্ধান দিয়েছিল। একটি পশুর শারীরিক ক্ষমতা, অন্যটি বায়ুর বেগ।

জোয়াল হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যা দিয়ে পশুর শারীরিক ক্ষমতাকে কোনো কিছু টানার জন্যে ব্যবহার করা চলে। আর বাতাসের ঠেলা দেবার ক্ষমতার সাহায্যে নৌকো চালাবার জন্যে পাল। এই ছুটি আবিষ্কারের মধ্যেই পরবর্তীকালের বিপুল একটি সম্ভাবনার বীজ খুঁজে পাওয়া যায়। আজকের দিনে আমরা দেখছি, বিদ্যুৎ ও পরামাণুর ক্ষমতাকে হাতের মুঠোয় এনে মানুষ মহাবিশ্ব জয় করার জন্যে তৈরি হচ্ছে। এই মস্ত ঘটনাটির শুরুতেও নূতন প্রস্তরযুগের মানুষের সেই অতি সামান্য (এ-যুগের দৃষ্টিতে) ছুটি আবিষ্কার। জোয়াল ও পাল। নিজের শরীরের এলাকার বাইরেও যে শক্তির উৎস আছে এবং তা নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা চলে—জোয়াল ও পাল আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে নূতন প্রস্তরযুগের মানুষই তার প্রথম দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পেরেছিল।

জোয়াল

খুব সম্ভবত যে-পশুটি জোয়াল কাঁধে নিয়েছিল সেটি হচ্ছে ষাঁড়

আর যে-জিনিসটি সে টেনেছিল তা লাঙল। তাই যদি হয় তবে এটুকু ধরে নেওয়া চলে, ষাঁড় দিয়ে লাঙল টানাবার কৃতিত্ব মিশ্র চাষীদের (যারা চাষ ও পশুপালন দুই-ই করত)। কিন্তু আরেকটি ব্যাপারও এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে। চাষের জন্যে লাঙলের ব্যবহার। লাঙল শব্দটি আমাদের আলোচনায় এই প্রথম আসছে। কাজেই এ-সম্পর্কে দু'একটা কথা বলে নেওয়া দরকার।

নূতন প্রস্তরযুগের গোড়ার দিকে যে-ধরনের চাষ হত তাকে আমরা বলেছি বাগিচা-চাষ। একটি ছুঁচলো কাঠি বা পাথরের ফলা লাগানো কোদাল দিয়ে মাটি খানিকটা আলগা করে নেওয়া হত মাত্র। আর বাগিচা-চাষ ছিল পুরোপুরি মেয়েদের কাজ। কিন্তু লাঙল আবিষ্কার হবার পরেই চাষের ব্যাপারে একটা বিপ্লব ঘটে গেল। লাঙলের ফলায় জমির নিচের মাটি ওপরে উঠে আসে। সাধারণত দেখা যায় জলবায়ুর দিক থেকে যে-সব অঞ্চল খানিকটা খরা সেখানে জমির সারাংশ থাকে মাটির নিচের স্তরে। কাজেই ফসলের নাগালের মধ্যে জমির সারাংশকে নিয়ে আসতে হলে নিচের মাটি ওপরে আনা দরকার। এ-কাজটি প্রথম করা গিয়েছিল লাঙলের সাহায্যে। তাছাড়া, বাগিচা-চাষের আমলে একজন স্ত্রী-লোক কোদাল দিয়ে সারাদিন যতোখানি জমি চষতে পারত তার চেয়ে অনেক জমি চষতে পারত একজন পুরুষ একটি লাঙল ও দুটি ষাঁড়ের সাহায্যে। ফলে, যা ছিল বাগিচা তা হয়ে উঠল ক্ষেত। এবং চাষের কাজটি মেয়েদের হাত থেকে চলে এল পুরুষদের হাতে। এই অবস্থাকেই সত্যিকারের কৃষি বলা চলে। এই অবস্থা শুরু হবার পরেই একদিকে যেমন মস্ত মস্ত এলাকা জুড়ে চাষ হয়েছিল অন্যদিকে তেমনি ফলনও হয়েছিল প্রচুর। ইস্পাতের ফলা লাগানো ট্র্যাক্টর নয়, পাথরের ফলা লাগানো লাঙল ; ডিজেল ইঞ্জিন নয়, দুটি ষাঁড়—এই সামান্য আয়োজন থেকেই মানুষের জীবনে এমন এক আশ্চর্য সমৃদ্ধির যুগ শুরু হয়েছিল যাকে বলা চলে বিপ্লব।

আমাদের আলোচনায় ফিরে আসি। ষাঁড় যেমন লাঙল টানত

তেমনি গাড়িও টানত। গাড়ি মানে শ্লেজ—একধরনের চাকাবিহীন বাহন। চাকা না থাকার ফলে মাটির উপর দিয়ে ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে টেনে নিয়ে যাওয়া হত। বোঝাই যাচ্ছে যে পাহাড় জমিতে এই চাকা-বিহীন গাড়ি অচল। হালের শিকারজীবী আদিবাসীদের কোনো কোনো দল এখনো পর্যন্ত এক তাঁবু থেকে অন্য তাঁবুতে মালপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্যে এ-ধরনের শ্লেজ ব্যবহার করে। তবে শ্লেজ যে সবসময়ে ষাঁড়ই টানত এমন নাও হতে পারে। ষাঁড়েরও আগে কুকুরকে মানুষ পোষ মানিয়েছিল, কাজেই কুকুরটানা শ্লেজ থাকাটাও বিচিত্র নয়। গাধা-টানাও নয়।

চাকা

চাকাবিহীন শ্লেজকে গাড়ি বলতে হয়তো আপত্তি হতে পারে। কিন্তু এ-অবস্থা খুব বেশিদিন চলে নি। কিছুকালের মধ্যেই আর একটি বৈপ্লবিক আবিষ্কার শ্লেজকে পুরোপুরি গাড়ির মর্যাদা দিয়েছিল। এই আবিষ্কারটি হচ্ছে চাকা। লক্ষ করার বিষয় এই যে খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের মধ্যে মানুষ যতো কিছু আবিষ্কার করেছিল এমনটি (হালের কয়েক-শো বছর বাদ দিলে) আর কখনো হয় নি। প্রত্যেকটি আবিষ্কারই বৈপ্লবিক। প্রত্যেকটি আবিষ্কারই মানুষের জীবনে বড়ো রকমের ওলোটপালোট এনেছিল। এবং সব মিলিয়ে ফুটে উঠেছিল সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের নতুন একটি দিগন্ত। এদিক থেকে গ্যালিলিওর সময় থেকে হালের কয়েক-শো বছরের সঙ্গে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের আগেকার তিন-হাজার বছরের মিল আছে। মানুষের প্রতিভা এই দুটি সময়েই যেন পুরোপুরি মুক্তি পেয়েছে।

চাকা যে কত বড়ো একটা আবিষ্কার তা আজকের এই রকেটের যুগে বাস করে আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি

বলি যে এই আবিষ্কারটির মধ্যেই আধুনিক যন্ত্রযুগের সূত্রপাত তাহলে একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না। এমনকি একথাও বলা চলে যে হালের রেলগাড়ি ও মোটরের আদিতে রয়েছে চাকাওলা একটি শ্লেজ। চাকার ওপরে ভর দিয়েই যেন নূতন প্রস্তরযুগটি ছুট দিয়েছিল ব্রোঞ্জ-যুগের দিকে, ব্রোঞ্জ-যুগ লৌহযুগের দিকে। এত সরল একটি আবিষ্কার এত জটিল সব কাণ্ডকারখানা ঘটিয়েছে ভাবলেও অবাক হতে হয়।

চাকার আবিষ্কারটি কি-ভাবে হয়েছিল তা নিয়ে অনেক কিছু কল্পনা করা চলে। কিন্তু সঠিক তথ্য বিশেষ কিছু জানা যায় নি। চাকা তৈরি হত কাঠ দিয়ে এবং এত হাজার বছর পরে কোনো কাঠের চাকার পক্ষেই টিকে থাকা সম্ভব নয়। কাজেই সে-যুগের তৈরি সত্যিকারের একটি চাকাও চোখে দেখা যায় নি। কিন্তু অন্য একটি নিদর্শন আছে, তা হচ্ছে চাকাওলা গাড়ির ছবি। নানা জায়গা থেকে পাওয়া ছবি বিচার করে প্রত্নবিদরা চাকা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে পেরেছেন।

সুমেরীয় শিল্পে খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ সালেই চাকাওলা গাড়ির সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের মধ্যে মেসোপটেমিয়ায় ও

সুমেরের যুদ্ধরথ

সিরিয়ায় নানা ধরনের চাকাওলা গাড়ির প্রচলন হয়েছিল। কোনোটা যাত্রীবাহী, কোনোটা মালবাহী, কোনোটা যুদ্ধরথ। সিন্ধু উপত্যকার

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ সালের কাছাকাছি সময়ে চাকাওলা গাড়ির প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তুর্কীস্থানেও প্রায় একই সময়ে। ক্রিট ও এশিয়া মাইনরে চাকাওলা গাড়ির প্রচলন হতে আরো শ-পাঁচেক বছর সময় লেগেছিল। আর মিশরীয়দের সম্পর্কে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তারা খ্রীষ্টপূর্ব ১৬৫০ সালের আগে চাকাওলা গাড়ি ব্যবহার করে নি।

একেবারে গোড়ার দিকে যে-ধরনের চাকা তৈরি হত তা কোনো রকমে জোড়াতালি দিয়ে তৈরি করা। গোটা চাকাটি হত একটি নিরেট বস্তু—রিম বা স্পোকের বালাই ছিল না। তিন খণ্ড কাঠ জোড়া লাগিয়ে তৈরি হত চাকাটি, সেটিকে বাঁধা হত চামড়া দিয়ে আর আষ্টেপৃষ্ঠে লাগানো হত তামার পেরেক। চাকাটি ঘুরবার সময় ঘুরত অক্ষদণ্ড বা ধুরা সমেত। অক্ষদণ্ডটিকে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে গাড়ির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হত। সিন্ধু, সার্দিনিয়া ও তুরস্ক অঞ্চলের গ্রামে এখনো পর্যন্ত এ-ভাবেই গোরুর গাড়ির চাকা লাগানো হয়।

কুমোরের চাকা

চাকা আবিষ্কারের পর একদিকে যেমন চাকায় বাঁধা গাড়ি চলতে লাগল অপরদিকে তেমনি ঘুরতে লাগল কুমোরের চাকা। ব্যাপারটিকে একটু ব্যাখ্যা করা দরকার।

একটি চাকাকে যদি মাটির সঙ্গে সমতল অবস্থায় রেখে ঘোরানো যায় আর চাকার কেন্দ্রস্থলে একতাল কাদামাটিও যদি ঘুরন্ত চাকার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে থাকে—তবে কুমোরের পক্ষে পাত্র তৈরি করার ব্যাপারটি খুবই সহজ হয়ে যায়। যেখানে একটি কলসী তৈরি করতে কয়েকদিন লাগার কথা সেখানে একতাল ঘুরন্ত কাদামাটি থেকে শুধু আঙুল চেপে ধরার কায়দায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাত্রটি তৈরি

করা সম্ভব। এবং ঘুরন্ত কাদামাটির তাল থেকে তৈরি করার পাত্রটির গড়নও হবে অনেক বেশি নিটোল।

মাটির পাত্র তৈরি করার জন্যে চাকার ব্যবহার যেদিন থেকে শুরু হয়েছিল সেদিনটিকেই বলা চলে যন্ত্রশিল্পের জন্মদিন। চাকা হচ্ছে মানুষের তৈরি প্রথম যন্ত্র। এতদিন পর্যন্ত মাটির পাত্র তৈরি করাটা ছিল মেয়েদের একটা ঘরোয়া কাজ, শুধু হাতেই তা তৈরি করা হত। কিন্তু মাটির পাত্র তৈরি করার জন্যে চাকার ব্যবহার শুরু হতেই এটি হয়ে উঠল পূর্ণাঙ্গ একটি শিল্প—বিশেষ একদল পুরুষের পুরো সময়ের জীবিকা। খাদ্য-উৎপাদনের কাজে তারা আর সরাসরি যোগ দিত না—উদ্বৃত্ত শস্যে ভাগ বসাত। হালের আদিবাসীদের দিকে তাকালেও একই ব্যাপার চোখে পড়ে। মাটির পাত্র তৈরি করাটা যতোক্ষণ একটা ঘরোয়া কাজ ততোক্ষণ তা মেয়েদের হাতে, যখনি যন্ত্রশিল্প (অর্থাৎ চাকার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে) তখন পুরুষদের হাতে।

গাড়ির চাকা আর কুমোরের চাকা কিন্তু সব জায়গায় একই সময়ে ঘুরতে শুরু করে নি। যেমন, মিশরে গাড়ির চাকার অনেক আগে কুমোরের চাকা। এ-থে.ক এ-সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় ঠিক হবে না যে গাড়ির চাকা ও কুমোরের চাকা একেবারে পৃথক দুটি আবিষ্কার। কিন্তু জোর করে কিছু বলার মতো মালমসলাও আমাদের হাতে নেই।

গাধা থেকে ঘোড়া

পশুর শরীরের ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হলে সব সময়েই যে চাকাওলা গাড়ি চালাতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। একটা গাধার পি.ঠ র ওপরে সরাসরি বোঝা চাপানো যেতে পারে, মানুষের পক্ষে সওয়ার হতেও বাধা নেই। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ সালের কাছাকাছি সময়ে বাবিলন ও এশিয়া মাইনরের মধ্যে গাধার পিঠে মালপত্র

চালান করা হত ও মানুষজন যাতায়াত করত। সহজেই বোঝা যায়, এ-ধরনের যাতায়াতের কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থাকা সম্ভব নয়। তবে একথা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা চলে যে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের অনেক আগেই গাধাকে পোষ মানানো হয়েছিল। মেসোপটেমিয়ায় গাধা দিয়ে লাঙল টানা হত। এ-অবস্থায় ভারবাহী পশু হিসেবেও নিশ্চয়ই গাধার ব্যবহার ছিল।

যে-মানুষ গাধার পিঠে সওয়ার হতে পারে তার পক্ষে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হওয়াও খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। অনেকের ধারণা, ঘোড়াকে মানুষ পোষ মানিয়েছিল দুধ পাবার জন্যে আর বাহন করার জন্যে। সিন্ধু উপত্যকা থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ সালের কাছাকাছি সময়ের একটি নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে যা দেখে ঘোড়ার জিন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছু বলা চলে না। সত্যি কথা বলতে কি, খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ সালের আগে এমন কোনো স্পষ্ট সাক্ষ্য নেই যা দেখে ঘোড়সওয়ার মানুষের কথা ভাবা যেতে পারে। তবে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ সালের অনেক আগে থেকেই গৃহপালিত পশু হিসেবে ঘোড়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের কাছাকাছি সময়ের যে সুমেরীয় যুদ্ধরথের ছবি পাওয়া যাচ্ছে তা দেখে মনে হতে পারে যুদ্ধরথটি টানছে ঘোড়া। কিন্তু এ-বিষয়ে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁদের অধিকাংশেরই ধারণা—ঘোড়া নয়, গাধা। তবে ঘোড়াই হোক আর গাধাই হোক, একটি বিষয় লক্ষ করার মতো। ষাঁড়কে যে-ভাবে গাড়ির সঙ্গে জোতা হয়, ঘোড়াকেও জোতা হয়েছে ঠিক সেই একই ভাবে। কিন্তু ঘোড়ার পক্ষে এ-ধরনের জোয়াল খুবই অস্বস্তিকর। ঘোড়াকে পুরোদমে ছোটাতে হলে জিন চাই। অনেক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই মানুষ এই আবিষ্কারটি করেছিল। একথা বললে ভুল বলা হয় না যে ঘোড়াকে জিন পরাতে পারার পর থেকেই মানুষ সত্যিকারের ঘোড়সওয়ার হয়েছে। এই জিনটির নির্ভুল সাক্ষাৎ পাবার জন্যে খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা দরকার।

কোনো কোনো প্রত্নবিদের ধারণা, খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ সালের আগে—এমনকি নগর-বিপ্লবেরও আগে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করত। গোরুর গাড়িতে বা গাধার পিঠে চেপে যাতায়াত করা যায় বটে কিন্তু তা খুবই সময়সাপেক্ষ। কিন্তু নগর-বিপ্লবের প্রাক্কালে এক অঞ্চলের আবিষ্কার ও চিন্তা-ধারণা যতো তাড়াতাড়ি অন্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল তাতে মনে হয় অনেক দূর দূর অঞ্চলের মধ্যে নিয়মিত ও দ্রুত যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল। কাজেই অনুমান করা চলে, কোনো কোনো অঞ্চলের মানুষ ঘোড়সওয়ার হতে শিখেছিল। অবশ্য উটের পিঠে চেপেও যাতায়াত করা যেতে পরে। উটকে বলা হয় মরু-অঞ্চলের জাহাজ। উট সহায় থাকলে দুস্তর মরুভূমিও পার হওয়া যায়।

নৌকোর পাল

শুকনো জমির ওপর দিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জলপথে পাড়ি দেবার ব্যবস্থাও পাকা হচ্ছিল। আগে বলেছি, মেসোলিথিক যুগেই খোঁদল-করা কাঠের গুঁড়িকে ডোঙা হিসেবে ব্যবহার করা হত। কিছুকাল পরে প্যাপিরাসের (একধরনের নলখাগড়া) আঁটি বেঁধে তৈরি হত ভেলা। ছোটখাটো নয়, মস্ত—জনপঞ্চাশেক দাঁড়ীর জায়গা হত সেখানে। তারপরে খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ সালের কাছাকাছি সময়ে এসে পালতোলা নৌকোর সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। এই তথ্যটি পাওয়া গিয়েছে মিশরীয় মাটির পাত্রে আঁকা ছবি থেকে। তবে খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ সাল সম্পর্কে হয়তো কিছুটা সন্দেহ থাকতে পারে। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালে এসে নিশ্চিতভাবে বলা চলে, ভূমধ্যসাগর ও আরবসাগরের ওপর দিয়ে পালতোলা নৌকোর রীতিমতো যাতায়াত শুরু হয়েছে। তার

মানে, তার আগেই মানুষ তক্তা জোড়া লাগিয়ে নৌকো বানাতে শিখেছিল। আকাশের তারা দেখে শিখেছিল সমুদ্রের দিক ঠিক করতে। আর শিখেছিল জলপথে যাতায়াতের নিয়মকানুন, যাতে যাত্রা নির্বিঘ্ন হয়।

এভাবেই শুরু। তারপর থেকেই জলপথে ও স্থলপথে শুরু হয়েছিল মানুষের দিগ্বিজয়।

দিগ্বিজয়

নগর-বিপ্লব শুরু হবার প্রাক্কালে মানুষের কতকগুলো আবিষ্কারের কথা এতক্ষণ ধরে বলা হল। কিন্তু আমাদের বলার ধরন থেকে মনে হতে পারে, নীল থেকে সিন্ধু পর্যন্ত গোটা অঞ্চলটিতে কোথাও কোনো রকম অশান্তি ছিল না, একটানা উন্নতির কতকগুলো লক্ষণ ঠিক যেন পরের পর ফুটে উঠছিল।

আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। অবশ্য কালচার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কথাটা আগেও বলেছি। আমরা জানি প্রত্যেকটি অঞ্চলে নিজস্ব একটি কালচার গড়ে উঠেছিল, যার হুবহু প্রতিচ্ছবি অন্য কোনো অঞ্চলে পাওয়া সম্ভব ছিল না। নানা অঞ্চলের মধ্যে মিল বলতে শুধু ছিল একটা লক্ষণগত মিল। সেটা এই যে সবাই একই যুগের মানুষ।

কিন্তু এত কথা বলার পরেও কিছু কথা থেকে যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে কালচারের সাক্ষ্য খুঁজতে গিয়ে প্রত্নবিদরা লক্ষ করেছেন যে, কোথাও কোথাও আচমকা যেন একটা বিপর্যয় এসেছে। একটা বড়ো রকমের ছেদ। প্রচলিত রাস্তা থেকে বেরিয়ে একেবারে নতুন আরেকটি রাস্তায় যাত্রা। যেমন, কোথাও হয়তো বিশেষ একধরনের পোড়ামাটির পাত্র তৈরি হত। আচমকা দেখা গেল প্রচলিত ধরনটি বেমালুম লোপ পেয়েছে এবং তৈরি হচ্ছে একেবারেই অন্য ধরনের

পোড়ামাটির পাত্র। এমনি ঘরবাড়ির ব্যাপারে, ছবি আঁকার ব্যাপারে, মৃতের কবর দেওয়ার ব্যাপারে। ইরান, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া ও মিশর থেকে যে-সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে এ-ধরনের বিপর্যয়ের ছাপ খুবই স্পষ্ট।

প্রত্নবিদদের ধারণা, এই বিপর্যয়গুলো হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে বড়ো রকমের অদল-বদল হবার চিহ্ন। যদি এক জায়গার মানুষ অন্য জায়গায় চলে যায়, যদি এক জায়গার মানুষ অন্য জায়গার মানুষের দলে ভিড়ে পড়ে, যদি এক জায়গায় মানুষ যুদ্ধে হেরে গিয়ে অন্য জায়গার মানুষের পদানত হয়—তাহলে এ-ধরনের বিপর্যয় ঘটতে পারে। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দরকার, নইলে নগর-বিপ্লবের পটভূমি ঠিকভাবে বোঝা যাবে না।

নদী-উপত্যকা অঞ্চলে যারা স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিল তারা সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব ধরনের এক-একটি কালচারও গড়ে তুলেছিল। আমাদের এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা বুঝেছি যে সে-যুগে নদী-উপত্যকা অঞ্চলের মানুষরাই ছিল সবচেয়ে ফেভরড্ বা আনুকূল্য-প্রাপ্ত গোষ্ঠী। প্রকৃতি তাদের ওপর এত সদয় ছিল যে মাঠের ফসল থেকে সারা বছরের খাদ্যের চাহিদা পুরিয়েও তারা কিছুটা সঞ্চয় করতে পারত। এ অবস্থায় স্বাভাবিক কারণেই তাদের মধ্যে একটা রক্ষণশীলতা এসে যেত। কারণ, থাকা ও খাওয়া সম্পর্কে যদি নিশ্চয়তা থাকে তবে যে-কোনো মানুষই ভাবতে শুরু করে যে সে যা করেছে তার বেশি কিছু করার নেই, সে যা ভাবছে তার বাইরে কিছু ভাবার নেই। সে-যুগের মানুষের পক্ষে একথাটা আরো বেশি সত্যি। সে ভাবত, প্রচলিত কাঠামোটির বাইরে যদি সে কখনো ভুল করেও একটি পা ফেলে তাহলে তার সর্বনাশ হবে। সে যে সারা বছরের খাদ্যের সংস্থান করতে পেরেছে তার মানেই এই যে অলৌকিক শক্তি তার প্রতি সদয়। তার মানেই এই যে সে ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি ঠিকভাবে করতে পেরেছে। তার মানেই এই যে তার জীবনের ছকটির মধ্যে কোথাও এতটুকু নড়চড় হতে দেওয়া চলবে না। এ

অবস্থায় তার চলাফেরার জগৎটিও ভীষণ কড়াক্কড়িভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তার চিন্তা-ভাবনা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার—সব-কিছুই গড়ে ওঠে কতকগুলো বিধিনিষেধকে পুরোপুরি স্বীকার করে নিয়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে অজন্মা ও মড়ক আসে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ গোটা বসতিকে তছনছ করে দিয়ে যায়, আরো হাজারটা দুর্ঘটনা ঘটে। সেই মানুষটি এসব দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের কার্যকারণ জানে না, সে সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করে নেয় যে নিশ্চয়ই এমন কিছু অনাচার ঘটেছে যার ফলে অলৌকিক শক্তি রুষ্ট হয়েছে। কাজেই পদে পদে তার আশঙ্কা, তার চালচলনের মধ্যে এতটুকু অনাচার না ঢুকে পড়ে। পদে পদে তার চেষ্টা, অলৌকিক শক্তি তার প্রতি যেন সদয় থাকে। এজন্যে নানান রকমের বিধিনিষেধ, নানান রকমের আচার-অনুষ্ঠান। সব মিলিয়ে জাদুবিশ্বাসের একটি কাঠামো গড়ে ওঠে। এই কাঠামোটি বজায় রেখে চলতে পারলেই তার মঙ্গল। তার সবচেয়ে সতর্ক দৃষ্টি—কাঠামোটি যেন কোথাও এতটুকু চিড় না খায়। ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় এই কাঠামোর মধ্যে এমন কোনো ছিদ্র থাকে না যা দিয়ে অন্য কোনো জগতের হাওয়া ঢুকতে পারে।

কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায়, এই কাঠামোর মধ্যে শুধু একটি ছিদ্র হওয়া নয়, মাঝে মাঝে আচমকা গোটা কাঠামোটিই ভেঙে পড়েছে।

এর কারণ আগে বলেছি। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে যোগা-যোগের ফলে এ-ব্যাপারটি সম্ভব হয়েছিল।

বিভিন্ন গোষ্ঠী মানেই বিভিন্ন কালচার। গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর যোগাযোগ মানেই কালচারের সঙ্গে কালচারের যোগাযোগ। বা, বলা চলে, ঠোকাঠুকি। কারণ এ-ব্যাপারটি ঘটলে পরেই সমস্ত বিধিনিষেধের কড়াক্কড়ি ভেঙে পড়ে এবং নতুন ধ্যানধারণার জন্ম হয়।

মনে করা যাক, যে-কোনো কারণেই হোক, একটি গোষ্ঠী অপর একটি গোষ্ঠীকে দলভুক্ত করে নিয়েছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে ব্যাপারটা যতো আপোসেই ঘটুক না কেন, ঠোকাঠুকি বাধবে মতাদর্শের ক্ষেত্রে।

কারণ, দুটি গোষ্ঠী মিশে গিয়ে একটি গোষ্ঠী হবার আগে দুটি গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার পদ্ধতি ছিল পৃথক, তাদের রীতি-নীতি-আচার-অনুষ্ঠান ছিল পৃথক, তাদের ধ্যানধারণা-বিশ্বাস-মতামত ছিল পৃথক। একদলের কাছে যা ট্যাবূ অপরদলের কাছে হয়তো তা নিত্যকর্ম। একদল হয়তো বিশ্বাস করত যে বিশেষ একটি রিচুয়াল পালন না করলে মাঠে ফসল হয় না। কিন্তু দেখা গেল, অপর দলটি সেই বিশেষ রিচুয়ালের ধার ধারে না। তারা আবার যে রিচুয়ালটি পালন করে তা এ-দলের কাছে অর্থহীন। কিন্তু তা সত্বেও মাঠে ফসল হতে লাগল, গাছে ফল এবং দু'দলই হাতেনাতে প্রমাণ পেল যে প্রচলিত বাধানিষেধ পুরোপুরি মেনে না চললেও কোনো ক্ষতি নেই। অর্থাৎ, যে কাঠামোটির মধ্যে তাদের চলাফেরা গণ্ডীবদ্ধ ছিল তা ভেঙে পড়তে লাগল।

শ্রেণীভেদের সূত্রপাত

গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর যোগাযোগ সব সময়ে যে খুব আপোসে হয়েছিল তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল এবং এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত ছাড়া এই আক্রমণ করার ও বশে আনার ব্যাপারটা ঘটানো চলে না। সুতরাং এই রক্তাক্ত অধ্যায়টি স্বীকার করে নিতে হবে। এ-সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে কোনো নিশ্চিত সাক্ষ্য আশা করা চলে না, কারণ সে-যুগের কবর খুঁড়ে যে-সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছে তার ব্যবহার মানুষ খুন করার জন্যে না জন্তুজানোয়ার—তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল।

মানুষের দ্বিতীয় বিপ্লবটির নাম দেওয়া হয়েছে নগর-বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলে কয়েকটি গ্রাম নগরে রূপান্তরিত হয়েছিল। যে-কোনো

অঞ্চলে একটি নগর গড়ে উঠতে হলে একটি জরুরি শর্ত পূরণ হওয়া দরকার। তা হচ্ছে, উদ্বৃত্ত শস্যের একটি ভাণ্ডার তৈরি হওয়া, যাকে বলা চলে পুঁজি। নগরবাসীদের জীবিকা খাদ্য-উৎপাদন নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য বা তৎসংক্রান্ত নানা কাজ। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে পুঁজি চাই—পুঁজি মানে এক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শস্য যার বিনিময়ে পণ্য-সংগ্রহ করা চলে। ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে যারা লিপ্ত আছে তাদের খাদ্যের যোগান চাই। সেজন্যেও উদ্বৃত্ত শস্য দরকার।

এই উদ্বৃত্ত শস্য বা পুঁজি মজুদ হয়েছিল কি ভাবে? অধিকাংশ প্রত্নবিদের মতে, লুটপাটের মধ্যে দিয়ে, আক্রমণ-করা ও বশে-আনার মধ্যে দিয়ে, জোর-জবরদস্তির মধ্যে দিয়ে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে মিশর বা মেসোপটেমিয়ার কথা ধরা যাক। এ দুটি অঞ্চলে জমি এত উর্বর ছিল যে চাষীরা খুব বেশি মেহনত না করেও উদ্বৃত্ত শস্য উৎপাদন করতে পারত। এই উদ্বৃত্ত শস্য মজুদ রাখা হত দুর্দিনের সঞ্চয় হিসেবে। আরো বেশি মেহনত করলে আরো বেশি শস্য নিশ্চয়ই পাওয়া যেত কিন্তু কোনো চাপ ছিল না বলে আরো বেশি মেহনত করার বাধ্যবাধকতা ছিল না। এবারে ধরা যাক, কোনো একটি যাযাবর গোষ্ঠী এমনি একটি চাষী গোষ্ঠীর অঞ্চল অধিকার করে বসল এবং চাষীরা বাধ্য হল বশ্যতা স্বীকার করতে। এর পরের অবস্থাটা কী হতে পারে? বিজেতেরা কি চাষীদের জমি থেকে উৎখাত করবে? মোটেই নয়। বরং তারা চাইবে যে চাষীরা জমিই চাষ করুক এবং ফসলের একটা মোটা অংশ তাদের হাতে তুলে দিক। এমনকি চাষীদের ওপরে আর যাতে কোনো রকম হামলা না হয় সে-ব্যবস্থাও তারা করে। চাষীরা সাধ্যমতো চাষ করুক এবং আরো বেশি বেশি ফসল ফলাক। এ-অবস্থায় চাষীদের ওপরে প্রচণ্ড একটা চাপ পড়ে। প্রাণান্ত পরিশ্রম করে আরো বেশি বেশি ফসল ফলাতে হয়। নিজেদের খাওয়া-পরার সংস্থান না থাকুক প্রভুদের প্রাপ্য অংশ যে-ভাবে হোক মিটিয়ে না দিলে চলে না। এভাবেই একদলের বাধ্যতামূলক মেহনত অপরদলের

হাতে পুঁজি হয়ে জমতে থাকে। কাজেই পুঁজি মজুদ হওয়ার পেছনে যেমন অনেক রক্তপাত ও নৃশংসতা আছে, তেমনি আছে অনেক হাহাকার ও দীর্ঘনিশ্বাস।

'প্রভু' শব্দটি লক্ষ করতে বলছি। মানুষের ঠিকানার উদ্দেশে রওনা হয়ে আমরা কয়েক লক্ষ বছর পার হয়ে এসেছি কিন্তু 'প্রভু' শব্দটি ব্যবহার করার উপলক্ষ আগে আর কখনো হয় নি। এই প্রথম। আরো লক্ষ করার বিষয় এই যে, গোড়ার দিকে এই প্রভুত্বটা অনেকটাই গায়ের জোরের ব্যাপার। এই প্রভুত্ব যাতে কায়েম হয়ে বসে তার ব্যবস্থাও পাকাপাকিভাবে তৈরি হয়েছিল। বিশেষ করে সেই জাহুবিশ্বাসের আমলে চাষীদের মনে এই অন্ধ বিশ্বাস জাগিয়ে তোলা কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার ছিল না যে প্রভুই হচ্ছে অলৌকিক শক্তির প্রতিনিধি, প্রভুকে সন্তুষ্ট করার অর্থই হচ্ছে অলৌকিক শক্তিকে সন্তুষ্ট করা। এই হচ্ছে জায়গিরদার প্রভুদের জন্মের গোড়ার কথা। হালের পৃথিবী থেকেও এরা একেবারে লুপ্ত হয় নি।

সাধারণত দেখা যায় যারা প্রভুত্ব করে তাদের সংখ্যা খুবই কম। যাদের ওপরে প্রভুত্ব করা হয় তাদের সংখ্যা খুবই বেশি। সে-সময়েও তাই হয়েছিল। বেশি-সংখ্যকরা যে শস্য উৎপাদন করত তার মোটা ভাগ চলে যেত কম-সংখ্যকদের হাতে। অর্থাৎ প্রভুদের হাতে। প্রভুরা নিজেদের উদর-পূর্তির জন্যে যতোটুকু পারত খরচ করত, বেশির ভাগটাই তাদের হাতে জমত। এই জমানো শস্যকেই আমরা বলেছি পুঁজি। এই পুঁজির সাহায্যেই শুরু হয়েছিল ব্যবসা-বাণিজ্য এবং গড়ে উঠেছিল শিল্প। অর্থাৎ নগরের পত্তন।

তাহলে আমরা বলতে পারি, নগর-বিপ্লব হবার পক্ষে বাস্তব অবস্থা তৈরি হয়েছিল তখনই যখন একদল মানুষের হাতে পুঁজি জমেছিল। এটি একটি জরুরি শর্ত। পুঁজি না জমা পর্যন্ত কিছুতেই নগর-বিপ্লব হওয়া সম্ভব নয়।

আগে বলেছি, এই রক্তাক্ত অধ্যায়টির নিশ্চিত কোনো সাক্ষ্য

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে যে একই জায়গায় পর পর দু'সময়ের দুটি গ্রামের মধ্যে সবদিক থেকেই অমিল—তখন একটিমাত্র সিদ্ধান্তই হতে পারে। পুরনো গ্রামের বাসিন্দাদের হটিয়ে দিয়ে নতুন একদল মানুষ নিজেদের ধরনে নতুন একটি গ্রাম গড়ে তুলেছে। হটিয়ে যদি না দিয়েও থাকে তো পুরোপুরি তাঁবে এনেছে। এ-ধরনের ব্যাপার কখনো আপোসে হতে পারে না—যুদ্ধে পরাজিত করার পরেই গোটা একটি গ্রামের মানুষের ওপর এভাবে প্রভুত্ব করা চলে।

লুটপাটের ও যুদ্ধবিগ্রহের এ-ধরনের সাক্ষ্য আরো আছে। সে-সময়ের অনেক গ্রামের চারদিকে মাটি উঁচু করে পাঁচিলের মতো তোলা হত। দেখে মনে হয়, এ-ব্যবস্থা হানাদারদের ঠেকাবার জন্যে। সে-সময়ে যাযাবর গোষ্ঠীর অভাব ছিল না। তারা কেউ জন্তু-জানোয়ার ও মাছ শিকার করত, কেউ পশুপালন করত। এদের চেয়ে গ্রামের চাষীদের অবস্থা ছিল অনেক ভালো। এ-অবস্থায় লুটপাট ও হামলা চলাটা খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না।

এবার তাহলে আমরা স্বীকার করে নিতে পারি যে নগর-বিপ্লব হবার আগে কিছুকাল ধরে যুদ্ধ ও হানাহানির একটা অবস্থা চলেছিল।

আর আমরা জানি, যুদ্ধ যে-ধরনেরই হোক না কেন, তা মানুষের কাছে সব সময়েই একটা নতুন অভিজ্ঞতা। সে-যুগের মানুষও যুদ্ধ ও হানাহানির অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে দুটি আবিষ্কার করেছিল।

একটি হচ্ছে পাথরের হাতিয়ারের চেয়ে ধাতুর হাতিয়ারের উৎকর্ষ বুঝতে পারা। শিকার করে আনা পশুর ছাল ছাড়াবার সময়ে যদি চকমকি পাথরের হাতিয়ারটি ভেঙে যায় তাহলে বিশেষ অসুবিধে হয় না। কিন্তু হাতাহাতি লড়াইয়ের সময়ে পাথরের অস্ত্রটি ভেঙে গেলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। এদিক থেকে তামা বা ব্রোঞ্জের তৈরি অস্ত্র অনেক বেশি মজবুত ও পাকাপোক্ত।

অন্য আবিষ্কারটির গুরুত্ব অনেক বেশি। এতদিন পর্যন্ত মানুষ শুধু

জানোয়ারকেই পোষ মানাতে শিখেছিল, এবার মানুষকেও জানোয়ারের মতো পুষতে শিখল। তার এই অভিজ্ঞতা হল যে পরাজিত শত্রুকে বধ করার চেয়ে তাকে দিয়ে দাসত্ব করানো অনেক বেশি লাভজনক। একদল মানুষের কাছে আরেক দল মানুষের দাসত্বের সূত্রপাত এই সময় থেকেই। একটি মানুষকে প্রাণে বধ না করে বাঁচিয়ে রাখা হল, খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত করা হল ঠিক ততোটুকুই যতোটুকু না হলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না, তারপর সারা জীবন ধরে মানুষটির কর্মক্ষমতা শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত নিংড়ে বার করে নেওয়া হল—এই হচ্ছে দাসত্বের ছবি। এমনকি সে-যুগের যে-সব ছবির মধ্যে হাত-পা বাঁধা দাসকে খুঁজে পাওয়া যায় তার মধ্যেও মানুষটির অসহায়তা পুরোমাত্রায় ফুটে উঠেছে।

অন্য একভাবেও দাসত্বের সূত্রপাত হতে পারে। হয়তো কোনো এক অঞ্চলে মড়ক বা অজন্মা হয়েছে, তখন সেই অঞ্চলের সহায়-সম্বলহীন মানুষরা বাঁচার তাগিদে কোনো এক সমৃদ্ধ অঞ্চলে গিয়ে হাজির হতে পারে। এক্ষেত্রে যারা তাদের আশ্রয় দেয় তারা তার বদলে আশ্রয়প্রার্থীদের কাছ থেকে পুরো মেহনত আদায় করে ছাড়ে। আমরা যাকে বলি পেটভাতায় কাজ করা—এও অনেকটা তাই। এ অবস্থা দাসত্বেরই নামান্তর। এটা যে এই বিশেষ যুগেরই একটা বিশেষত্ব তা নয়। পরের যুগেও দেখা গিয়েছে যে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের মধ্যে দিয়েই সবচেয়ে সহজে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় দাসমজুর পাওয়া সম্ভব। অবস্থাটা বোঝাতে গিয়ে 'পেটভাতা' 'মজুর' এসব শব্দ ব্যবহার করা হল বটে কিন্তু সে-সময়ে ভাতা বা মজুরি বলে কিছু ছিল কিনা সে-বিষয়ে খুবই সন্দেহ আছে। নিশ্চিতভাবে আমরা শুধু একটি কথাই বলতে পারি—যারা নিজেদের খাদ্য নিজেরা উৎপাদন করত না তাদের খাদ্যের সংস্থান হত উদ্বৃত্ত শস্যভাণ্ডার থেকে।

বলা বাহুল্য, দাসত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রভুত্বেরও সূত্রপাত হয়েছিল। এই প্রভুদের নানা রকম চেহারা। কেউ মোড়ল, কেউ সর্দার, কেউ রাজা। বিশেষ একজন ব্যক্তির পক্ষে রাজা হয়ে বসার দুটি পথ

আছে। একটি হচ্ছে পরাক্রম, অর্থাৎ যুদ্ধে জয়লাভ করা। অপরটি হচ্ছে জাদুশক্তি। গোষ্ঠীর মধ্যে জাদুক্রিয়ার পুরোহিতের এমনিতেই আলাদা একটি মর্যাদা। খুব সম্ভবত গোড়া থেকেই তাকে খাদ্য-উৎপাদনের কাজে সরাসরি অংশ নিতে হত না। তার বিশেষ ধরনের কাজের জন্যে তার খাদ্যসংস্থান বাড়তি ফসলের ভাগ থেকে করা হত। এভাবে চলতে চলতে জাদুক্রিয়ার পুরোহিতের জাদুদণ্ডটিই শেষ পর্যন্ত রাজদণ্ড হয়ে উঠেছিল।

আমরা জানি, প্রথম বিপ্লবের পরেও মানুষের জাদুবিশ্বাস পুরোমাত্রায় টিকে ছিল। টিকে না থাকার কোনো কারণও ছিল না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের সামনে তখনো সে নিজেকে একেবারেই অসহায় মনে করত। মাঠের ফসলের জন্যে তখনো তাকে তাকিয়ে থাকতে হত বৃষ্টি বন্যা আর রোদ্দুরের দিকে। ভূমিকম্প বা ঘূর্ণিবাত্যার মতো কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়লে বাঁচার কোনো রাস্তাই তার জানা ছিল না। এ অবস্থায় সে যে জাদুবিশ্বাসের ওপরেই নির্ভর করবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। নানা ধরনের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে সে অলৌকিক শক্তির আশীর্বাদ কামনা করত যাতে দুর্যোগ দূরে থাকে আর বৃষ্টি-বন্যা-রোদ্দুর ঠিক ঠিক সময়ে এসে মাঠকে ফসলে ভরিয়ে তোলে। এ অবস্থায় যে-ব্যক্তি সকলের মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারে যে জাদুক্রিয়ার প্রভাবে অলৌকিক শক্তিকে সন্তুষ্ট করার ক্ষমতা তার আছে, তার পক্ষে সমস্ত ব্যাপারে সর্বেসর্বা হয়ে বসা অসম্ভব নয়। জাদুবিশ্বাসের আমলে মানুষের অসহায়তা ও কুসংস্কারই ছিল রাজ-সিংহাসনের ভিত্তি।

অনেকের মতে মিশরে রাজ-সিংহাসনের ভিত্তিও ছিল এই। প্রতি বছরে ঠিক একই দিনে নীলনদে বন্যা আসত। আবিসিনিয়ার পর্বতমালায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ার ফলেই ব্যাপারটা ঘটে। কাজেই এই দিনটি ঠিক কবে আসবে তা নির্ভর করে সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর পাক খাওয়ার ওপরে। কক্ষপথে পৃথিবী বিশেষ একটি অবস্থানে পৌঁছলে পরেই উত্তর-পশ্চিম মৌসুমী

বায়ুর বিশেষ প্রবাহটি তৈরি হয়। এ-অবস্থায় সূর্যকে একবার পাক খেতে পৃথিবীর কতদিন সময় লাগছে তা যদি নির্ভুলভাবে গণনা করা যায় এবং পুরো সময়টিকে একটি বছর হিসেবে ধরে নিয়ে বন্যার দিন থেকে যদি বছর শুরু করা যায়—তবে অনেক আগে থেকেই নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব যে বছরের প্রথম দিনটিতে নীলনদে বন্যা আসবে। এবারে সে-যুগটিকে একবার কল্পনা করা যাক। জাদুবিশ্বাসী মানুষরা যখন দেখত কোনো একজন ব্যক্তি অনেক আগে থেকেই নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারছে আর কতদিন পরে নীলনদে বন্যা আসবে এবং চাষের কাজ শুরু করতে হবে—তখন তারা অনায়াসে বিশ্বাস করত যে সেই বিশেষ ব্যক্তিটির অলৌকিক ক্ষমতা আছে।

হয়তো এ-ধরনের একজন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিই মিশরের রাজা হয়ে বসেছিলেন।

নগর-বিপ্লব

মানুষের ঠিকানার উদ্দেশে রওনা হয়ে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সাল পর্যন্ত আমরা পৌঁছেছি। আমাদের আলোচনা থেকে জানা গিয়েছে যে এই সময়ের মধ্যে মানুষ কয়েকটি বৈপ্লবিক আবিষ্কার করতে পেরেছিল। যেমন, তামা, চাকা, গোরুর গাড়ি, নৌকোর পাল, ইত্যাদি। এই আবিষ্কারগুলো বৈপ্লবিক এই কারণে যে এর ফলে মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে একটা বড়ো রকম ওলোটপালোট হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। আমরা জানি নূতন প্রস্তরযুগের মূল লক্ষণ ছিল কৃষিনির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম। গ্রামের মানুষদের সমস্ত চাহিদা স্থানীয়ভাবেই পূরণ হয়ে যেত—বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে ওঠার কোনো উপলক্ষই ছিল না। এই কাঠামোর মধ্যে এসব আবিষ্কারের কোনো একটিকেও কাজে লাগানো সম্ভব নয়। সেজন্যে নতুন যে কাঠামোটি দরকার, মানুষের দ্বিতীয় বিপ্লব বা নগর-বিপ্লব তা গড়ে তুলেছিল। নগর-বিপ্লব কথাটির মধ্যে এই নতুন-গড়ে-ওঠা কাঠামোর চেহারাও চেনা যাচ্ছে। শিল্প ও বাণিজ্য-নির্ভর নগর। আমরা আগেই জেনেছি যে এই বিপ্লবের জন্ম হয়েছে নীল, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস ও সিন্ধু উপত্যকায়।

তিনটিই পলিমাটির অঞ্চল। প্রতি বছরের বন্যায় তিনটি অঞ্চলের জমিই উর্বরা হয়ে উঠত। অনেক জলা ও জঙ্গল পরিষ্কার করে এসব জমিকে চাষযোগ্য করতে হয়েছিল। জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল নালা ও খাল কেটে কেটে। বাস্তব অবস্থাটাই ছিল এমনি যে অনেক

মানুষের জোট না বেঁধে উপায় ছিল না। পুরাতন প্রস্তরযুগে গোষ্ঠীর শাসন অসহ্য মনে হলে যে-কেউ নতুন কোনো জায়গায় গিয়ে আস্তানা গড়ে তুলতে পারত। কিন্তু এক্ষেত্রে তা সম্ভব ছিল না। এখানে জীবনধারণের উপায় ছিল কৃষি—বাধ্য হয়ে মানুষকে চাষযোগ্য এলাকার মধ্যেই থাকতে হত। অবাধ্য মানুষকে শাস্তি দেবার উপায় ছিল নালা আটক করে জলের যোগান বন্ধ করে দেওয়া। শাস্তি দেবার ব্যবস্থা আয়ত্তের মধ্যে থাকার ফলে কতকগুলো নিয়মকানুন কড়াক্কড়িভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছিল।

তবে এই তিনটি পলিমাটির অঞ্চলে যদিও ফলন হত প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিন্তু অন্য কতকগুলো জিনিসের খুবই অভাব ছিল। যেমন কাঠ, আকর ও পাথর। নীল-উপত্যকায় কাঠ একেবারেই পাওয়া যেত না, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস উপত্যকায় যা পাওয়া যেত (খেজুর গাছের কাঠ) তাকে কাঠ না বলাই ভালো। সিন্ধু-উপত্যকাতেও একই অবস্থা। হাতিয়ার তৈরির পাথর বা তামা তৈরির আকরও এই তিনটি অঞ্চলে বিশেষ সহজলভ্য ছিল না।

ফলে, এসব কাঁচামালের যোগান পাবার জন্যে তিনটি অঞ্চলেই একটা বাণিজ্যের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়েছিল। পুঁজিরও অভাব ছিল না, কারণ উদ্বৃত্ত শস্য এমনিতেই মজুদ হয়েছিল। এই উদ্বৃত্ত শস্য থেকে যেমন বাণিজ্য চলত তেমনি চলত বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের (খাদ্য উৎপাদন না করা সত্ত্বেও) খাদ্যের যোগান। পলিমাটির জমিতে প্রচুর ফলন এ-ব্যাপারটিকে সম্ভব করে তুলেছিল।

কাজেই, খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালে দাঁড়িয়ে এই তিনটি অঞ্চলের একটি নতুন বৈশিষ্ট্য আমাদের লক্ষ করতে হচ্ছে। পুরোপুরি চাষী-গ্রাম আর নয়, সে-জায়গায় শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র বিচিত্র কর্মমুখর এক-একটি নগর। তার নগরবাসীদের মধ্যেও অনেক শ্রেণীভেদ। রাজা, পুরোহিত, সর্দার, মোড়ল, হিসাবরক্ষক, কারিগর, মজুর, সেনানী, ইত্যাদি। লক্ষ করার বিষয় এই যে এরা কেউ চাষী নয়। অথচ নগর গড়ে ওঠার আগে চাষের কাজ থেকে কারও রেহাই পাবার উপায় ছিল না।

পুরাতন প্রস্তরযুগের এবং নূতন প্রস্তরযুগের গোড়ার দিকের প্রত্ন-তাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে পাওয়া গিয়েছিল শিকারের ও চাষের হাতিয়ার এবং ঘরোয়াভাবে তৈরি নানা জিনিস। কিন্তু এবারে পাওয়া যাচ্ছে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, অস্ত্রশস্ত্র, কুমোরের চাকায় তৈরি পোড়ামাটির পাত্র, গয়নাগাটি এবং দক্ষ কারিগরের হাতের তৈরি নানা ধরনের জিনিস। আগে ছিল কুটির ও গোলাঘর, এখন সমাধিমন্দির, দেবমন্দির, প্রাসাদ ও কারখানা। আর এসব মন্দির ও অট্টালিকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে নানা ধরনের নিত্য-ব্যবহার্য সাজসরঞ্জাম। এসব সাজসরঞ্জামের মধ্যে আবার অনেকগুলোই বাইরে থেকে আমদানী করা।

অর্থাৎ, এই প্রথম আমরা পুরোপুরি নগরের সাক্ষাৎ পাচ্ছি। নগরের বিন্যাস ও আয়তন দেখে বোঝা যায়, মানুষের সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছিল। যেমন ধরা যাক, সিন্ধু উপত্যকার মোহেন-জো-দড়ো নগরটি। এটির আয়তন ছিল এক বর্গমাইলেরও বেশি। চওড়া রাস্তা ও অলিগলিও ছিল অনেক। বাড়িগুলো ছিল দোতলা এবং গায়ে গায়ে লাগানো। সহজেই অনুমান করা চলে, আগের আমলের ছ'সাত কাঠা জমির ওপর গড়ে ওঠা একটি গ্রামে যতো মানুষ বাস করত তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ বাস করত এমনি একটি নগরে। নীলনদের উপত্যকায় সাধারণ কবরখানা যেমন পাওয়া যাচ্ছে তেমনি পাওয়া যাচ্ছে মস্ত মস্ত সমাধি-মন্দির। এ থেকেও বোঝা যায় যে মানুষের সংখ্যা খুবই বেড়ে গিয়েছিল।

আমরা জানি এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। এটি বিপ্লবেরই একটি লক্ষণ। শিকার ও সংগ্রহের ওপরে নির্ভরশীল মানুষ যখন চাষ করতে শিখেছিল এবং কৃষিনির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গড়ে তুলেছিল তখনো এই লক্ষণটি প্রকাশ পেয়েছে। আবার শিল্প ও বাণিজ্য যখন গ্রামের স্ব-নির্ভরতাকে ভেঙে দিয়ে নগরের গোড়াপত্তন করল—তখনো এই একই লক্ষণ। কারণ, এটিও একটি বিপ্লব।

কিন্তু তাই বলে এমন আশা করাটা ঠিক হবে না যে যেহেতু

মিশর মেসোপটেমিয়া ও ভারতবর্ষ একই বিপ্লবের আওতায় পড়েছে, অতএব বিপ্লবের চেহারাও এই তিনটি অঞ্চলে হুবহু এক। যেমন নূতন প্রস্তরযুগে মোটামুটি একটা লক্ষণগত মিল থাকা সত্ত্বেও এক অঞ্চলের হাতিয়ারের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের হাতিয়ারের কোনো মিল আমরা খুঁজে পাই নি—নগর-বিপ্লবের সময়েও তাই। মিল যেটুকু এক্ষেত্রেও তা শুধু লক্ষণগত। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ব্যাপারে অমিল। যেমন, পোড়ামাটির পাত্র তিনটি অঞ্চলেই তৈরি হত—এটি লক্ষণগত মিল। কিন্তু তিনটি অঞ্চলে পোড়ামাটির পাত্র তৈরি হত একেবারে আলাদা ধরনের। এটি অমিল। তিনটি অঞ্চলের কামারশালাতেই তামার বা ব্রোঞ্জের হাতিয়ার তৈরি হত—এখানে মিল। কিন্তু যে-সব হাতিয়ার তৈরি হত—যেমন, কুড়ুল, ছুরি, ছোরা, বর্শার ফলক—তা হত একেবারেই আলাদা আলাদা ধরনের। সেখানে পুরোমাত্রায় অমিল। আবার অমিল শুধু যে কতকগুলো শিল্পবস্তু তৈরি করার ধরনের মধ্যে তাই নয়, রীতি-নীতি-আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেও। অর্থাৎ, মতাদর্শের ক্ষেত্রেও।

এ-অবস্থায় নগর-বিপ্লবের একটি সাধারণ বিবরণের মধ্যে তিনটি অঞ্চলকে এক সঙ্গে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তিনটি অঞ্চলকেই আলাদা আলাদাভাবে জানতে হবে।

মেসোপটেমিয়া

প্রথমে আমরা তাকাব মেসোপটেমিয়ার দিকে। নগর-বিপ্লবের আলাদা আলাদা ধাপগুলো এই অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে খুবই স্পষ্ট।

আলোচনা শুরু করার আগে মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে মেসো-পটেমিয়া দেশটিকে চিনে নেওয়া দরকার। এখন যে-দেশটির নাম হয়েছে ইরাক তারই নাম ছিল মেসোপটেমিয়া। মেসোপটেমিয়া

নামটি গ্রীকদের দেওয়া—এর অর্থ, দুই নদীর মধ্যেকার দেশ। আমরা যে-সময়ের কথা বলছি তখন এই দেশের উত্তরাংশের নাম ছিল আসিরিয়া ও দক্ষিণাংশের নাম ব্যাবিলোনিয়া। আবার ব্যাবিলোনিয়ার দুটি অংশ—উত্তরে আক্কাদ, দক্ষিণে সুমের। অনেক আগে সুমের অঞ্চলটি ছিল পারস্য উপসাগরের জলের নিচে। কিন্তু টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর পলি জমে জমে অঞ্চলটি জলের ওপরে জেগে উঠেছে। আর আগেই বলেছি, গোড়ার দিকে গোটা অঞ্চলটি জুড়ে ছিল জলাভূমি, নলখাগড়ার জঙ্গল আর খেজুর গাছ। অঞ্চলটিকে চাষযোগ্য ও বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে অনেক মানুষের অনেক মেহনত দিতে হয়েছিল।

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যেকার অঞ্চলটি যদিও পলিমাটির অঞ্চল—কিন্তু এ-অঞ্চলে অনেকগুলো ঢিবি। এ-সমস্ত ঢিবি খুঁড়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। দক্ষিণের সুমের অঞ্চলের কয়েকটি ঢিবির নাম হচ্ছে এরিদু, ইরেক, লাগাশ, উর, ইত্যাদি। উত্তরের আক্কাদ অঞ্চলেও ঢিবি আছে তবে তা আরো পরবর্তীকালের। সুমেরের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে বিভিন্ন ঢিবি থেকে পাওয়া নিদর্শন থেকে একই ধরনের জীবনযাত্রার পদ্ধতির সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি শুরু ও শেষও একই পর্যায়ে। এ থেকে বোঝা যায় যে গোটা অঞ্চলটিতে একই ভাষা, একই রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও একই সামাজিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। কাজেই যে-কোনো একটি ঢিবি থেকে পাওয়া নিদর্শন সম্পর্কে জানলেই বাকিগুলো সম্পর্কে জানা হয়ে যায়। ইরেক ঢিবিটিকে ধরা যাক।

ইরেক ঢিবির একেবারে নিচের স্তরে, অর্থাৎ একেবারে শুরুর স্তরে পাওয়া যাচ্ছে নূতন প্রস্তরযুগের একটি চাষী-গ্রাম। একেবারে নিচের স্তর থেকে শুরু করে প্রথম পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত একই ধরনের গ্রামের পর গ্রামের ধ্বংসাবশেষ। নূতন প্রস্তরযুগের এই পর্যায়টি সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। গ্রামের মূল কাঠামোটি

বজায় থাকছে কিন্তু তারই মধ্যে ধাতুর ব্যবহার বাড়ছে, পোড়ামাটির পাত্র তৈরি করার জন্যে কুমোরের চাকার প্রচলন হচ্ছে এবং এমনি আরো কতকগুলো লক্ষণ।

কিন্তু পঞ্চাশ ফুট পেরিয়ে আসার পরেই গ্রামের চিহ্ন আর নেই। সে জায়গায় মস্ত মস্ত দেউল। পাশেই একটি কৃত্রিম পাহাড়, পরবর্তীকালে যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'জিগুরাট' (ziggurat)। আসলে জিগুরাট হচ্ছে সুমেরের নগর-দেবতার মন্দির। প্রথম জিগুরাটটি তৈরি হয়েছিল কাদামাটির পিণ্ড সাজিয়ে সাজিয়ে। দুই থাক্ মাটির পিণ্ডের মাঝখানে বিটুমেনের একটি স্তর। সবটাই শুধু-হাতে তৈরি। তবুও মাটি থেকে পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচুতে উঠেছিল এর চুড়ো। চুড়ো মানে একটি বিন্দু নয়, লম্বায় হাজার গজ ও চওড়ায় হাজার গজ মাপের মস্ত একটি জায়গা। এই চুড়োর ওপরে তৈরি হয়েছিল ছোট্ট একটি মন্দির, লম্বায় তিয়াত্তর ফুট, চওড়ায় সাড়ে সাতান্ন ফুট। এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল কাদামাটির তৈরি ইট দিয়ে, দেওয়ালগুলো চুনকাম করা হয়েছিল। আর ছিল সিঁড়ির ধাপ যাতে নগর-দেবতা স্বর্গ থেকে নেমে আসতে পারেন। আবার প্রায়-খাড়া পাহাড়ের গায়ে সারিবদ্ধভাবে গেঁথে দেওয়া হয়েছিল পোড়ামাটির তৈরি খুরি। ফলে পাহাড়ের গা একদিকে যেমন হয়েছিল মজবুত অন্যদিকে তার ওপরে ফুটে উঠেছিল চমৎকার একটি প্যাটার্ন। এই কৃত্রিম পাহাড়ের লাগালাগি তৈরি হয়েছিল আরো সব জাঁকালো মন্দির।

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে যে জিগুরাট ও তার আশেপাশের মন্দিরগুলো খাড়া করতে তাল তাল মাটি নিয়ে আসতে হয়েছিল, হাজার হাজার ইট ও পোড়ামাটির পাত্র তৈরি করতে হয়েছিল, অজস্র উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়েছিল।

অনুমান করা চলে যে এই বিরাট নির্মাণকার্যের ব্যবস্থা করা বড়ো সহজসাধ্য নয়। বিপুল সংখ্যক মজুর ও কারিগরের পুরো সময়ের খাটুনি দরকার হয়েছিল এজন্যে। এই খাটিয়ে মানুষরা

নিজেদের খাদ্য নিজেরা উৎপাদন করত না, উদ্বৃত্ত শস্যভাণ্ডার থেকে তাদের খাদ্যের যোগান দিতে হত।

উদ্বৃত্ত শস্যভাণ্ডারের কথা আগেও অনেকবার বলেছি। কিন্তু এবারে আসল প্রশ্নটা তোলা যেতে পারে। এই উদ্বৃত্ত শস্যভাণ্ডারটি কার জিম্মায় ছিল? কার মালিকানায়? যদি কোনো বিশেষ একজনের মালিকানায় থেকে থাকে তবে সেই বিশেষ ব্যক্তিটি কে?

লক্ষণ দেখে মনে হয়, ব্যক্তিটি হচ্ছেন নগর-দেবতা নিজেই, যাঁর মর্যাদায় এই বিরাট নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল। জমি ছিল এত উর্বর যে এমনিতেই প্রয়োজনের বেশি উৎপাদন হত। অথচ চাষীরা বিশ্বাস করত যে নগর-দেবতা সন্তুষ্ট আছেন বলেই এত বেশি শস্য পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই নগর-দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে বাড়তি শস্য তাঁর পায়ে উজাড় করে ঢেলে দিতে চাষীদের আপত্তি হবার কথা নয়। এভাবেই নগর-দেবতার মালিকানায় উদ্বৃত্ত শস্যভাণ্ডারটি তৈরি হয়েছিল। এবং এই উদ্বৃত্ত শস্যভাণ্ডারের জিম্মাদার ছিল নিশ্চয়ই নগর-দেবতার পুরোহিতরা।

নির্মাণকার্য সম্পর্কে আরো একটি কথা আছে। বিপুল সংখ্যক মজুর ও কারিগরকে কাজ করাতে হলে একটি পরিকল্পনা থাকা দরকার, একটি পরিচালন-কেন্দ্র। নগর-দেবতা তো আর গলার আওয়াজ বার করে হুকুম দিতে পারেন না বা মাথা খাটিয়ে নির্মাণ-কার্যের ছকটি দেগে দেবার ক্ষমতাও তাঁর নেই। তাঁর হয়ে সত্যি-কারের একদল মানুষ এসব কাজ করে। নগর-দেবতার আজ্ঞাবহ হিসেবে এদের পরিচয়। অর্থাৎ, দেবতার মুখপাত্র হয়ে দেবতার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সাধারণ্যে প্রচার করার ভার এদের হাতে। দেবতার শস্যভাণ্ডারে এদেরও ভাগ থাকে এবং শস্যভাণ্ডারটিকে নানাভাবে বাড়িয়ে তোলার জন্যে এরা চেষ্টার ত্রুটি করে না। নূতন প্রস্তরযুগের গ্রামে যাদের আমরা জাদুক্রিয়ার পুরোহিত হিসেবে দেখেছি—নগর গড়ে ওঠার পরে তারাই নগর-দেবতার পুরোহিত হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে। যা ছিল ম্যাজিক তাই হয়ে উঠেছে ধর্ম। কিন্তু

এই মানচিত্রটি খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ সালের কাছাকাছি সময়ের। ইরাক নামে যে-অঞ্চলটিকে দেখানো হয়েছে সেটিই প্রাচীন মেসোপটেমিয়া। মেসোপটেমিয়ার উত্তরাংশের নাম আসিরিয়া, দক্ষিণাংশের নাম ব্যাবিলোনিয়া। ব্যাবিলোনিয়ার দুটি অংশ—উত্তরে আক্কাদ, দক্ষিণে সুমের। মানচিত্রে এই অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হয় নি। পশ্চিম ভারতবর্ষের মোহেনজো-দড়ো ও হরপ্পা হালের পশ্চিম পাকিস্তানে পড়ছে। ইরান নামে যে-দেশটিকে দেখানো হয়েছে তার আগেকার নাম ছিল পারস্য।

তা সত্ত্বেও জাদুবিশ্বাসের আমলের মতোই হাজার রকমের বিধিনিষেধ ও আচার-অনুষ্ঠান। প্রকৃতির প্রত্যেকটি ঘটনাই কোনো না কোনো অলৌকিক শক্তির মর্জির ওপরে নির্ভর করছে—কাজেই কৃষিকর্ম বা শিল্পকর্ম যাই করা হোক না কেন, পদে পদে এই অলৌকিক শক্তিকে সন্তুষ্ট করে চলা দরকার। এ-ব্যাপারে কখন কি করতে হবে তা বলে দেবার ভার পুরোহিতদের ওপর। কখন কি ধরনের আচার ও অনুষ্ঠান পালন করা দরকার তার নির্দেশ পাওয়া যায় পুরোহিতদের কাছ থেকে। সাধারণ মানুষ একটা অন্ধবিশ্বাস নিয়ে পুরোহিতদের নির্দেশ মেনে চলে। নগর-দেবতার জন্যে মন্দির (জিগুরাট) গড়ার পরিকল্পনা পুরোহিতদের মাথাতেই এসেছিল। দেবতার আদেশ হিসেবে তারা সেই পরিকল্পনাকে সাধারণ্যে প্রচার করেছে। ফলে, এ-কাজের জন্যে বিপুল সংখ্যক মজুর ও কারিগর সহজেই পাওয়া গিয়েছিল। পরবর্তীকালে রাজারাও মন্দির গড়ার পরিকল্পনাকে দেবতার স্বপ্নাদেশ বলে প্রচার করত।

তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি, যে-সময় থেকে নগর-দেবতার মন্দিরের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে সে-সময় থেকে একদল পুরোহিতও রয়েছে। দেবতার সম্পত্তির জিম্মাদারি এরাই করে। তবে এই কাজটি করতে গিয়ে এদের একটি বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হয়। তা হচ্ছে সম্পত্তির হিসেব রাখা। কার কাছ থেকে কী পরিমাণ শস্য পাওয়া যাচ্ছে, কার কাছে কী পরিমাণ পাওনা থাকছে, আর কি-ভাবে কী পরিমাণ খরচ হচ্ছে—এসব হিসেব খুঁটিয়ে রাখতে হলে সবসময়ে স্মৃতির ওপরে নির্ভর করা চলে না। তাছাড়া হিসেবটি এমনভাবে রাখা দরকার যেন একজন পুরোহিতের মৃত্যুর পরে পরবর্তী জনের পক্ষে তা বুঝে নিতে কিছুমাত্র অসুবিধে না হয়। দেবতার ভাণ্ডারটি চিরকালের, পুরোহিত সম্প্রদায়কে পুরুষানুক্রমে তার জিম্মাদার হতে হবে। কাজেই হিসেব রাখার একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল। এই অবস্থার মধ্যেই গণনা-পদ্ধতির সূত্রপাত। জিগুরাটের মাটি খুঁড়ে একটি বিশেষ চেহারার ফলক

পাওয়া গিয়েছে যার গায়ে অনেকগুলো ফুটো। পণ্ডিতদের ধারণা, এই ফুটোগুলো হচ্ছে সংখ্যা। তাই যদি হয় তো এই ফলকটিকে বলা চলে হিসেবের পাতা এবং খুব সম্ভবত এইটিই একেবারে শুরুর পাতা। পরবর্তীকালে সুমেরের মন্দিরে যে গণনা-পদ্ধতির প্রচলন হয়েছিল তার শুরু এভাবে। অবশ্য শুরু হিসেবে একেবারেই বিশেষত্বহীন। কিন্তু আমরা যদি বলি যে মাটির ফলকের গায়ে কয়েকটি মামুলি ফুটো করার মধ্যেই ভবিষ্যতের লেখা ও লিপির আভাস ফুটে উঠেছিল—তাহলে এই সম্ভাবনার দিকটির কথা ভেবে অবাক হতে হবে।

ইরেক-এর এই মন্দিরটির নিদর্শন থেকে সে-সময়কার সামাজিক কাঠামো সম্পর্কেও আমরা ধারণা করতে পারি। নূতন প্রস্তরযুগের স্ব-নির্ভর গ্রাম আর নয়, পুরোপুরি একটি নগর যেখানে উদ্বৃত্ত শস্যের একটি ভাণ্ডার মজুদ হয়েছে। এই ভাণ্ডারটির মালিক হচ্ছেন নগর-দেবতা, জিম্মাদার একদল পুরোহিত। নগরবাসীদের মধ্যে ছিল বিপুল সংখ্যক মজুর ও কারিগর। বিশেষ বিশেষ শিল্পের পত্তন হয়েছিল এবং প্রাথমিক ধরনের হলেও অল্পস্বল্প বাণিজ্য ও যোগা-যোগ-ব্যবস্থা। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, মানুষের একটি মহত্তম আবিষ্কারের সূত্রপাত এই সময়ে। লেখা ও লিপি।

এই হচ্ছে নগর-বিপ্লবের একেবারে গোড়ার দিকের ছবি। এই ছবির মধ্যে অনেক ফাঁক ও ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু এখান থেকে শুরু করে যতোই এগিয়ে যাওয়া যাবে ততোই দেখা যাবে, নতুন নতুন সম্পদ ও নতুন নতুন আবিষ্কার এই ফাঁক ও ঘাটতিগুলোকে ভরাট করছে। শেষ পর্যন্ত চোখে পড়বে নগর-সভ্যতার এক আশ্চর্য উজ্জ্বল ছবি। মানুষের লিখিত ইতিহাসের শুরু।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় যে ঐতিহাসিক কাল শুরু হবার আগে ইরেক-এর এই জিগুরাটটি অন্তত চারবার নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছিল। প্রত্যেক বারেই আগের বারের চেয়ে অনেক বেশি জাঁকালোভাবে। পাহাড়ের গায়ে প্রথমবারে গাঁথা

হয়েছিল পোড়ামাটির খুরি, পরের দিকে গাঁথা হত মোচাকৃতি পাত্র। এই পাত্রগুলোকে লাল, কালো বা সাদা রং করা হত। ফলে সুন্দর একটি মোজেইক প্যাটার্ন ফুটে উঠত পাহাড়ের গায়ে। ঐতিহাসিক কালে এসে যে জিগুরাটের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে তার সাজসজ্জা আরো বিচিত্র। সেখানে মোজেইক প্যাটার্নটি ফুটিয়ে তোলা হত রামধনু-রঙা ঝিনুক ও আরো বিচিত্র সব উপকরণের সাহায্যে। মন্দিরের ভেতরের দেওয়ালে গোড়ার দিকে পাওয়া যেত কাদামাটির তৈরি জন্তুজানোয়ারের মূর্তি, শেষের দিকে পাথর ও ঝিনুকের ; আর ঐতিহাসিক কালে এসে কাদামাটিরও নয়, পাথর-ঝিনুকেরও নয়, তামার।

ওদিকে নগর-দেবতার মন্দিরটি জাঁকালো হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের ধনসম্পদের হিসেব রাখার ব্যবস্থাটিও পাকা হয়ে উঠছিল। জিগুরাটের প্রত্যেকটি নতুন পর্বে আরো বেশি বেশি সংখ্যায় হিসেব-লেখা মাটির ফলক পাওয়া গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের কিছু পরের সময়ের যে-সমস্ত ফলক পাওয়া যাচ্ছে তাদের গায়ে লেখা হিসেবগুলো পণ্ডিতরা পাঠ করতে পেরেছেন। এই ফলকগুলোই হচ্ছে ঐতিহাসিক কালের প্রথম দলিল। পণ্ডিতরা এই দলিল ঘেঁটে তৎকালীন সুমের সম্পর্কে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তার সবটুকু না হলেও কিছুটা আমাদের জানা দরকার।

নগরের চারদিকে মাটির দেওয়াল, আর দেওয়াল তৈরি করার জন্যে মাটি কেটে নেবার ফলে পরিখার মতো গর্ত। ভেতরে বাগান, বাগিচা, ক্ষেত ও চারণভূমি। অর্থাৎ নিজেদের হাতে গড়ে তোলা একটি পরিবেশ। খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আবার এই খাল থেকেই নগরবাসীরা নিজেদের ব্যবহারের জন্যে জল তুলে নিত। খালের জলে মাছ ধরত। তাছাড়া এই জলপথেই বাইরে থেকে পণ্যবাহী নৌকো এসে লাগত নগরের ঘাটে।

আয়তনেও নিতান্ত ছোট নয়। অবশ্য হালের কোনো নগরের সঙ্গে তুলনা করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক গ্রামের

তুলনায় মস্ত। ইরেক নগরটির আয়তন ছিল দু'বর্গমাইল। জনসংখ্যারও একটা হিসেব পাওয়া গিয়েছে। লাগাশ, উম্মা ও খাফাজা—এই তিনটি নগরের জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯০০০, ১৬০০০ ১২০০০।

নগরের ঠিক মধ্যিখানটিতে জিগুরাট ও দেউল। জিগুরাটের মধ্যে মন্দির ছাড়াও আছে শস্যাগার, অস্ত্রাগার ও কামারশালা। জিগুরাটের ভেতরকার দেওয়ালের সাজসজ্জার মধ্যে নগরবাসীদের অনেক তৎপরতার সাক্ষ্য। যেমন স্যাকরার তৈরি তার, শিক্‌লি, ইত্যাদি। তামা-কারিগরের তৈরি কুড়ুল-কোদাল, ছোরা-ছুরি, করাত-বাটালি ইত্যাদি। তাছাড়া একদল জহুরীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে যারা মণিমুক্তোকে ফুটো করে পুঁতি বানাতে পারে এবং মণিমুক্তোর গায়ে কুঁদে কুঁদে চিহ্ন বসাতে পারে। একদল ভাস্করের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে যারা চুনাপাথর বা এমনকি ব্যাসল্ট পাথর দিয়ে মূর্তি গড়তে পারে। একদল ছুতোরের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে যারা নৌকো বা যুদ্ধরথ ছাড়াও বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র তৈরি করতে পারে।

জিগুরাটের মধ্যে এত বিচিত্র সাজসরঞ্জামের সমাবেশ দেখে এটুকু বোঝা যায় যে সে-সময়ে প্রচুর সম্পদ মজুদ হবার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল এবং মানুষের কারিগরি দক্ষতা ক্রমেই বাড়ছিল। আমরা জানি, কারিগরি দক্ষতা বাড়া মানেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কার, নতুন নতুন গাথা-গীতি ও বচনের প্রচলন। সুমেরের কামারশালায় যে-সব হাতিয়ার তৈরি হত তার ঢালাইয়ের কাজটি বড়ো চমৎকার। বোঝা যায় যে খাঁটি তামা দিয়ে এত চমৎকার ঢালাই সম্ভব নয়—তামা ও টিনের সংকর ধাতু ব্রোঞ্জ চাই। অবশ্য এ থেকে এ-সিদ্ধান্ত করা চলে না যে সুমেরীয়রা ব্রোঞ্জের আবিষ্কারক। প্রায় একই সময়ে ভারতবর্ষেও ব্রোঞ্জ ব্যবহার করা হত। সম্ভবত ব্রোঞ্জের আবিষ্কারও একটি আকস্মিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে। আকর গলিয়ে তামা বার করার সময় যে-ভাবেই হোক খানিকটা টিন তামার

সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এই আকস্মিক ঘটনাকে মেনে নিলেও ব্রোঞ্জের আবিষ্কারের কৃতিত্ব কিছুমাত্র কমে না। ব্রোঞ্জের কদর বুঝতে হলে কামারশালায় অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দরকার। হয়তো আকস্মিকভাবে তৈরি হয়ে যাওয়া খানিকটা ব্রোঞ্জ কামারের হাতে এসেছিল। কামার তাকে ধরে নিয়েছিল 'তামা' হিসেবেই। কিন্তু এই 'তামা' যে সত্যিকারের তামা নয় তা জানবার জন্যে তাকে নানাভাবে পরখ করতে হয়েছিল। আর সত্যিকারের তামার সঙ্গে কোন জিনিস মিশিয়ে এই 'তামা' (বা ব্রোঞ্জ) তৈরি হয়েছে তা জানতেও তাকে কম হিমসিম খেতে হয় নি।

অবশ্য, পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে আরো অনেক ব্যাপারে করা হয়েছিল তার সাক্ষ্য হিসেবে পাওয়া গিয়েছে একটি লোহার ছোরা। উল্কাপিণ্ডের লোহা নয়, স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া লোহা নয়— আকর থেকে গলিয়ে বার করে নেওয়া লোহা। তবে এটি নিতান্তই পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শিল্পগতভাবে এর প্রয়োগ হয় নি। আমরা জানি, শিল্পগতভাবে লোহার ব্যবহার শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ১৩০০ সালে। কিন্তু এই ঘটনাটি থেকে বোঝা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের কাছাকাছি সময়েও মানুষের তৎপরতা কত বিচিত্র ও ব্যাপক রূপ নিয়েছিল।

এ-সময়ের আরেকটি আবিষ্কার হচ্ছে স্বচ্ছ কাচ। প্রাগৈতিহাসিক মিশরীয়রা কাচের মতো চকচকে একধরনের পাথর ব্যবহার করত। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের আগেই মেসোপটেমিয়াতেও এ-ধরনের কাচ-পাথর তৈরি হয়েছিল। কিন্তু স্বচ্ছ কাচের আবিষ্কারের কৃতিত্ব সুমেরীয়দের। কাচের মতো চকচকে নানা ধরনের পাথর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেই এই আবিষ্কারটি সম্ভব হয়েছিল।

লক্ষ করার বিষয়, নানা ব্যাপারে এমন সব উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে যা পলিমাটির দেশে দুষ্প্রাপ্য। নানা অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এ-সমস্ত লক্ষণ দেখে বোঝা যায় যে বাণিজ্যিক যোগাযোগটি আরো

নিয়মিত ও প্রসারিত হয়েছে। নগর সম্পর্কে আমরা যতোটুকু জেনেছি তা থেকেই বলতে পারি, অন্য অঞ্চল থেকে আমদানী করা নানা জিনিস খুব বেশি মাত্রাতেই ব্যবহার করা হত। যেমন, তামা বা ব্রোঞ্জ, ঘরবাড়ি তৈরির জন্যে কাঠ, জাঁতা বা দরজার কীলক তৈরির জন্যে পাথর, সোনা, রুপো, সীসে, ল্যাপিস ল্যাজিউলাই (শেষোক্ত চারটি জিনিস আর কারও জন্যে না হলেও অন্তত দেবতাদের জন্যে দরকার), এবং এমনি আরো সব মূল্যবান জিনিস। তামা আসত পারস্য উপসাগরের দক্ষিণাঞ্চল থেকে ; টিন আসত ইরান, সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর থেকে ; কাঠ আসত উত্তর-পূর্ব দিকের পর্বতমালা থেকে—এমনি একেকটি জিনিস একেকটি অঞ্চল থেকে। ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তান থেকেও কিছু কিছু জিনিস সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া হত। শুধু যে কাঁচামালেরই লেনদেন হত তা নয়। সে-সময়ে মিশরে ও ভারতবর্ষেও নগর-বিপ্লব প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। আর যেখানে দেখা যাচ্ছে যে সুমেরের নগরগুলোর সঙ্গে নীল ও সিন্ধু-তীরের নগরগুলোর বাণিজ্যিক যোগাযোগ রয়েছে সেখানে নিশ্চয়ই আশা করা চলে এক নগরের শিল্পজাত পণ্য অন্য নগরের বাজারে বিক্রি হত। আর সত্যি সত্যিই সুমেরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে এমন সব সাক্ষ্য আছে যা দেখে বোঝা যায় যে সিন্ধু অঞ্চলের তৈরি জিনিসও সুমের-এ নিয়ে আসা হয়েছিল। এ থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হচ্ছে যে টাইগ্রিস থেকে সিন্ধু পর্যন্ত গোটা অঞ্চলটি এক বাণিজ্যিক সূত্রে বাঁধা পড়েছিল এবং এই দুই নদীর মধ্যেকার বারো-শো মাইল লম্বা দুর্গম পথে যাত্রীদলের নিয়মিত যাতায়াত ছিল।

'দুর্গম' বিশেষণটি কথার কথা নয়। জলাভূমি, মরুভূমি ও পর্বতমালা পেরিয়ে যাত্রীদলকে যাতায়াত করতে হত। জলপথটিও নির্বিঘ্ন ছিল না। নদী ও খালের সব জায়গায় নৌকো চলত না, মাঝে মাঝে চড়া ও অগভীর ঝিল, পুরো একটি বহরকে চড়া ও ঝিল পেরিয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তার ওপরে ছিল পারস্য উপসাগর ও আরব সাগর। প্রাণ হাতে নিয়ে এই দুটি সমুদ্রে

পাড়ি জমাতে হত। আর শুধু তো পথের দুর্গমতাই নয়, অন্য ধরনের বিপদও কম ছিল না। অন্য মানুষদের এলাকার মধ্যে দিয়ে যেতে হত। সুতরাং, হয় উপহার ও উপঢৌকন দিয়ে তাদের সঙ্গে মিতালি পাতাতে হত কিংবা অস্ত্রের জোরে তাদের বশে আনতে হত। সুতরাং এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বাণিজ্যের জন্যে যাত্রা করতে হলে যেমন পণ্য সঙ্গে নিতে হত, তেমনি নিতে হত রসদ ও পানীয়, উপহার ও উপঢৌকন, অস্ত্র ও হাতিয়ার।

এবং হয়তো আরো কিছু সঙ্গে থাকত। মানুষ। দ্বিতীয় বিপ্লব একদল মানুষকে জমি থেকে মুক্তি দিয়েছিল। তারা হচ্ছে কারিগর। জমির টান না থাকার ফলে তারা খুশিমতো নড়েচড়ে বেড়াত। কারিগরি দক্ষতাই ছিল তাদের পুঁজি, কাজেই তারা এমন সব অঞ্চলে গিয়ে হাজির হত যেখানে এই পুঁজি সবচেয়ে ভালোভাবে খাটানো সম্ভব। কিংবা, এমনও হতে পারে, তাদের নিজস্ব কোনো স্বাধীনতা ছিল না। তারা ছিল দাস, চড়া দাম পাবার আশায় পণ্যের মতোই তাদের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চালান দেওয়া হত। তবে ঘটনাটা যে-কারণেই ঘটুক, এর ফলে এক অঞ্চলের আবিষ্কার ও শিল্প অন্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে বিশেষ সময় লাগে নি।

আরো একটি কথা আছে। বাণিজ্যের সূত্রে নানা অঞ্চলের ও নানা ধরনের মানুষ এসে জড়ো হত এক-একটি নগরে। পণ্যের বিলি-ব্যবস্থা দু'একদিনে হত না, সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত বণিকদের পুরো দলটিকে অনেকদিন ধরে নগরে আস্তানা নিতে হত। কিন্তু এই বিদেশীদেরও কতকগুলো নিজস্ব রীতি-নীতি-আচার-অনুষ্ঠান আছে, যা বিদেশে থাকার সময়েও মেনে চলতে হয়। ফলে, রীতি-নীতি-আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে একটা যোগাযোগ ঘটে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে এ-ধরনের যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

আচার-অনুষ্ঠানের সাক্ষ্য থেকে অন্য একটি খবরও জানা যায়।

নগর-জীবনেও টোটেম-বিশ্বাস লুপ্ত হয় নি। এমন সব ছবি পাওয়া গিয়েছে যাতে দেখা যায় একদল মানুষ জন্তুজানোয়ারের মুখোশ পরে নাচছে।

আবাদী জমির বিলিব্যবস্থার যে-সমস্ত হিসেব পাওয়া গিয়েছে তা থেকে জানা যায়, মন্দিরের পুরোহিতেরাই সবচেয়ে বেশি জমি ভোগ করত। অন্য সমস্ত ব্যাপারেও এই পুরোহিতরাই ছিল সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী।

আসলে এরা ছিল নামেই পুরোহিত। মন্দিরের ধনসম্পদকে এরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করত। মন্দিরের দাসদের মনে করত ব্যক্তিগত দাস। এরা এমন সমস্ত নিয়মকানুন করেছিল যাতে অপরের সম্পদকেও অনায়াসে ভোগদখল করা চলে। যেমন, নিয়ম ছিল যে পুরোহিত যদি গরীবের বাগিচা থেকে কাঠ নিয়ে যায় তো বলার কিছু নেই। নিয়ম ছিল যে 'উঁচু' মানুষের বসতবাটির পাশে যদি 'নিচু' মানুষের বসতবাটি থাকে তাহলে 'উঁচু' মানুষটি বিনা ক্ষতিপূরণে 'নিচু' মানুষটির বসতবাটি আত্মসাৎ করতে পারে। নিয়ম ছিল যে 'প্রজার' পশুশালায় যদি সুন্দর একটি গাধার বাচ্চা হয় তাহলে সেটিকে যেমন-খুশি দামে 'প্রভুর' কিনে নেবার অধিকার আছে।

এ-অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে পুরোহিত শ্রেণীর হাতে বিপুল ধনসম্পদ জড়ো হয়ে যায়। অবশ্য মুখে বলা হয় যে সবই দেবতার সম্পত্তি। কিন্তু যে-দেবতাই হোন, তাঁর একটি মাথা গুঁজবার ঠাঁই চাই যার নাম মন্দির, প্রভাব-প্রতিপত্তির এলাকা চাই যার নাম রাজ্য, কাজকর্ম করে দেবার লোকজন চাই যাদের নাম দাস, আর চাই একদল জিম্মাদার যাদের নাম পুরোহিত। সব মিলিয়ে বিচিত্র এক কর্মকেন্দ্র। শুধু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের দিক থেকে নয়, ধনসম্পদ সঞ্চয়ের দিক থেকেও। এই হিসেবে সে-সময়ের এক-একটি মন্দির যেন আধুনিককালের এক-একটি ব্যাঙ্ক; দেবতা হচ্ছেন দেশের সবচেয়ে বড়ো পুঁজিপতি। আধুনিক ব্যাঙ্কের মতো সেই মন্দিরের

পক্ষ থেকেও ফলাও একটি লেনদেনের কারবার চালানো হত। হয়তো চাষীদের আগাম দেওয়া হত বীজধান ও লাঙলটানার পশু। কারিগরদের আগাম দেওয়া হত কাঁচামাল। বণিকদের আগাম দেওয়া হত সোনা-রুপোর বাট। কিন্তু ফেরত নেবার সময়ে প্রাপ্য পরিমাণটি তো ফেরত নেওয়া হতই, তার ওপরে দেবতার উদ্দেশে কিছু নৈবেদ্য। আগাম দেবার সময়েই বলে রাখা হত যে নৈবেদ্য সমেত ফেরত দিতে হবে। নৈবেদ্যের সর্বনিম্ন পরিমাণটিও অনেক সময়ে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত। আধুনিক পরিভাষায় এ-ধরনের বাধ্যতামূলক নৈবেদ্যকেই আমরা বলি সুদ।

দেশের সমস্ত ধনসম্পদ এভাবে মুষ্টিমেয় একটি শ্রেণীর হাতে জড়ো হবার ফলে সবচেয়ে বেশি ঘা পড়েছিল কারিগর ও চাষীদের ওপরে। কারিগররা যে-সব জিনিস তৈরি করত তার চাহিদা ছিল একমাত্র বিত্তশালীদের কাছে। কিন্তু সেই বিত্তশালীদের সংখ্যাই যদি মুষ্টিমেয় হয় তাহলে খুব অল্পসংখ্যক কারিগরই বৃত্তি বজায় রাখতে পারে। চাষীরা মাঠ থেকে যে ফসল তুলত তার বেশির ভাগটাই দিয়ে আসতে হত মন্দিরের শস্য-ভাণ্ডারে। নিজেদের ভাগে যেটুকু থাকত তা দিয়ে কোনো রকমে বেঁচে থাকা চলত। এ-অবস্থায় চাষীদের সংখ্যা যতো বাড়ে ততোই বেশি বেশি জমিতে চাষ করতে হয়। কিন্তু বেশি জমি চাইলেই সব সময়ে পাওয়া যায় না। জলা ও জঙ্গল নিকেশ করে জমিকে আবাদী করে তোলার কাজটা খুবই পরিশ্রম সাপেক্ষ এবং জলা ও জঙ্গলের জমিও অফুরন্ত নয়। তখন নজর পড়ে আশেপাশের নগরের দিকে, সেখানকার চাষের জমির দিকে। শুরু হয় জমি দখলের লড়াই।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে এবং লিখিত দলিল থেকে এ-ধরনের যুদ্ধের অনেক সাক্ষ্য ও বিবরণ পাওয়া গিয়েছে।

সুমের ও আক্কাদের গোটা এলাকাটিতে নগরের সংখ্যা ছিল পনেরো কি কুড়ি। জীবনধারণের উপায়, ধর্ম, ভাষা—সবদিক থেকেই তাদের মধ্যে মিল। এমনকি একই যুগল-নদীর জলের ওপরে

প্রত্যেকটি নগরকে নির্ভর করতে হত। প্রত্যেকটি নগর ছিল স্বাধীন, যদিও পরস্পরের মধ্যে একটা বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। এমন সাক্ষ্য প্রচুর আছে যা দেখে বোঝা যায়, এই নগরগুলোর মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিবাদ হয়েছে আর পুরনো বাসিন্দাদের যুদ্ধে পরাজিত করে আক্রমণকারীরা গোটা এলাকাটি দখল করে বসেছে। পুরনো বাসিন্দারা হয় উৎখাত হত, নয়তো বিজেতাদের দাস হয়ে থাকত।

তবে একটি আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ করা গিয়েছে! যুদ্ধে যে পক্ষই জিতুক না কেন, নগর-দেবতার কখনো লাভ ছাড়া ক্ষতি হত না। হয়তো আক্রমণকারীরা প্রচণ্ড আক্রোশে গোটা নগরকে ছারখার করে দিয়েছে কিন্তু নগর-দেবতার গায়ে এতটুকু আঁচ লাগে নি। বরং উল্টোটাই ঘটেছিল। আক্রমণকারীরা আরো জাঁকজমকের সঙ্গে নগর-দেবতার মন্দিরটি নতুনভাবে গড়ে তুলেছিল। ব্যাবিলোনিয়ার লিখিত ইতিহাস থেকে জানা যায় যে সে-দেশে বিভিন্ন রাজবংশ রাজত্ব করেছে এবং বিদেশী আক্রমণকারীরা বার বার লুটপাট চালিয়েছে—কিন্তু মন্দিরের সম্পত্তির ওপরে কখনো হাত পড়ে নি। বরং নতুন রাজা কিংবা বিজয়ী আক্রমণকারী নতুন করে মন্দির গড়ে দিয়েছে এবং নতুন নতুন অর্থাগমের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ইরেকের জিগুরাটটি চারবার নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারে নতুন করে গড়ে তোলার পরেও মন্দিরের পুরোহিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো অদল-বদল হয় নি।

আবার এই যুদ্ধ-বিবাদের অবস্থার মধ্যেই আরেকটি ব্যাপার ঘটছিল। শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে খুব শক্ত হাতে শাসন করার প্রয়োজন ছিল। অনেক সময়ে বিজয়ী যোদ্ধাই শাসক হয়ে বসত। গোড়ার দিকে নিজেকে সে রাজা বলত না, বলত ঈশ্বরের প্রতিনিধি। ভাবখানা এই যে ঈশ্বরই হচ্ছেন আসল শাসক, তাঁর পক্ষে সশরীরে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয় বলে এই ব্যক্তিটির ওপরে তিনি শাসনের ভার দিয়েছেন। অবশ্য রাজা হতে হলে বিজয়ী যোদ্ধা হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। অনেক আচার-অনুষ্ঠানে একজন রক্ত-

মাংসের মানুষকেই ঈশ্বরের ভূমিকা নিতে হত। এমনি বারকয়েক ঈশ্বরের ভূমিকা নেবার পরে তার পক্ষে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা রাজা হয়ে বসাটা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়।

তার চেয়ে বড়ো কথা, সুমের ও আক্কাদের বাস্তব অবস্থাটাই ছিল এমন যে একজন জবরদস্ত শাসক বা রাজা না হলে বার বার সংকটের মধ্যে পড়তে হচ্ছিল। ভৌগোলিক দিক থেকে নিম্ন মেসোপটেমিয়া অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু সেখানে পনেরো কি কুড়িটি বিচ্ছিন্ন নগর গড়ে উঠেছিল। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য একই যুগল-নদী দিয়ে। একই পলিমাটিতে একই ধরনে তারা চাষ করত। ফলে জমি ও জলের দখল নিয়ে প্রতিবেশী নগরবাসীদের মধ্যে অনবরত দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধত, অনবরত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এ অবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য যাতে নির্বিঘ্নে চলে বা ক্ষেতখামার-খালবিল যাতে হানাদারদের দৌরাত্ম্যে নষ্ট না হয়—সেজন্যে কিছু একটা ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই ব্যবস্থাটির নাম রাজতন্ত্র। ব্যবস্থাটিই আসল, ব্যক্তিটি নয়। রাজা যে-কেউ হতে পারে—বিজয়ী যোদ্ধা বা জাদু-ক্রিয়ার ইন্দ্রজালিক না নগর-দেবতার মন্দিরের পুরোহিত বা আচার-অনুষ্ঠানের ঈশ্বররূপী নায়ক।

কিন্তু রাজাদের রাজত্ব শুরু হবার পরেও আরো কয়েক-শো বছর সুমের ও আক্কাদ বিচ্ছিন্ন ও টুকরো টুকরো হয়ে ছিল। আক্কাদের রাজা সারগন খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ সালের কিছু পরে ব্যাবিলোনিয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে সত্যি-কারের ঐক্যবদ্ধ ব্যাবিলোনিয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০০ সালের কিছু পরে রাজা হামমুরাবির আমলে। ইতিহাসে এই ব্যাবিলোনিয়া সাম্রাজ্য ও তার রাজধানী ব্যাবিলন বিখ্যাত হয়ে আছে।

মিশর দেশটি খুবই ছোট। সরু একটি ফালি মাত্র। এই দেশের দু'দিকে সমুদ্র আর দু'দিকে মরুভূমি। উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পুবে লোহিত সাগর, দক্ষিণে নিউবিয়ার মরুভূমি, পশ্চিমে লিবিয়ার মরুভূমি।

মিশরকে বলা হয় নীলনদের দান। রামকে বাদ দিয়ে যেমন রামায়ণের কথা ভাবা যায় না, নীলনদ ও মিশরের বেলাতেও তাই। এই নদীটি ছিল বলেই মরুভূমির গ্রাস থেকে খানিকটা শ্যামল জমি রক্ষা পেয়েছে। প্রতি বছরে নির্ভুল দিনটিতে নীলনদে বন্যা আসে আর এই বন্যার পলিমাটি দুই তীরের জমিকে প্রতি বছরে নতুন করে উর্বরা করে তোলে। মিশরের সমস্ত উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে নীলনদের পলিমাটির এই অফুরন্ত উর্বরাশক্তি।

চার হাজার মাইল লম্বা এই নদটি আবিসিনিয়ার পর্বতমালা থেকে বেরিয়ে ভূমধ্যসাগরে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু এই চার হাজার মাইলের মধ্যে গোড়ার দিকের তিন হাজার মাইলে নদটি নাব্য নয়, অর্থাৎ এই অংশে নদটিকে জলপথ হিসেবে ব্যবহার করা চলে না। উঁচু-নিচু পাহাড়ে জমির ওপর দিয়ে আসতে হয়েছে বলে নদের এই অংশে ছ'টি বড়ো বড়ো জলপ্রপাত বা 'ক্যাটারাক্ট্' তৈরি হয়েছে। নদীর মোহনার দিকে প্রথম যে ক্যাটারাক্ট, তারই কাছে প্রাচীনকালে আসোয়ান নামে মস্ত একটি শহর গড়ে উঠেছিল, হালে এখানে এই নামেই একটি বাঁধ তৈরি হয়েছে।

মিশর বলতে এই আসোয়ান থেকে ভূমধ্যসাগরের মোহনা পর্যন্ত নীলনদের দুই তীর। সরু একটি ফালি। মোট আয়তন দশ হাজার বর্গমাইল— পশ্চিমবাংলার আয়তনের তিন ভাগের এক ভাগ।

মোহনার কাছে এসে নীলনদ কতগুলো শাখায় ভাগ হয়ে গিয়েছে। ফলে তৈরি হয়েছে একটি ব-দ্বীপ। মেসোপটেমিয়ার সুমের অঞ্চলের মতো মিশরের এই ব-দ্বীপ অঞ্চলটিও অনেক আগে ছিল সমুদ্রের নিচে। নদীর পলি জমে জমে জলের ওপরে উঠে এসেছে।

ব্যাবিলোনিয়ার মতো মিশরও ভৌগোলিক দিক থেকে অবিচ্ছিন্ন। একটিমাত্র নদের ওপরে নির্ভর করতে হত গোটা দেশটিকে। কোনো কারণে একটি বছর এই নদে বন্যা না হলে সারা দেশ জুড়ে হাহাকার পড়ে যেত। বা, বন্যার সময়ে যদি নদের ওপরের অংশে বেশি-বেশি খাল কেটে সমস্ত জল ধরে রাখার বন্দোবস্ত হত তাহলে নিচের অংশে সে-বছরের মতো চাষের কাজ আর শুরু হতে পারত না। চাষের কাজ শুরু করার জন্যে সারা বছর ধরে অপেক্ষা করে থাকতে হত এই বন্যার জন্যে। হালে অবশ্য আসোয়ান বাঁধ তৈরি হবার পরে সারা বছর ধরেই চাষের কাজ চলতে পারে। কিন্তু আমরা যে-সময়ের কথা আলোচনা করছি তখন নীলনদের বছরকার বন্যাই ছিল সারা দেশের কাছে জীবনের প্রতীক। এ-সমস্ত কারণে নীল-নদের উপত্যকার ভৌগোলিক অবিচ্ছিন্নতা টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকার চেয়েও বেশি।

তবে আঞ্চলিক প্রভেদ একেবারে নেই তা নয়। ব-দ্বীপ অঞ্চল (বা উত্তর মিশর) আর দক্ষিণ মিশরের মধ্যে আঞ্চলিক প্রভেদ যথেষ্ট। দুটি আলাদা প্রদেশ বললেও ভুল হয় না। আলাদা বটে, কিন্তু পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল প্রদেশ। কোনো প্রদেশেরই এতখানি স্বাতন্ত্র্য নেই যে আলাদা একটি দেশ হতে পারে। দুয়ে মিলতে পারলে তবেই দেশ।

ব্যাবিলোনিয়ার বেলায় আমরা দেখেছি, একই নদীর ওপর যে-সমস্ত অঞ্চলকে নির্ভর করতে হয় সে-সমস্ত অঞ্চল এক হয়ে একটি রাজ্য গড়ে না ওঠা পর্যন্ত এক-অঞ্চলের সঙ্গে অন্য-অঞ্চলের অনবরত মারামারি কাটাকাটি চলতে থাকে। এ-অবস্থা কোনো অঞ্চলের পক্ষেই উন্নতির সহায়ক নয়। শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থা তৈরি হয় যখন একজন জবরদস্ত শাসক বা রাজার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ব্যাবিলোনিয়ায় যিনি প্রথম গোটা অঞ্চলটিকে এক-শাসনের আওতায় এনেছিলেন তাঁর নাম সারগন। ব্যাপারটি ঘটেছিল খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০০ সালে। কিন্তু মিশরে আরো অন্তত পাঁচশো বছর আগেই একজন

একচ্ছত্র রাজার সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ, খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের মধ্যেই গোটা মিশর এক-রাজ্য হয়ে উঠেছিল। আগের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি, নগর-বিপ্লব সম্পূর্ণ হবার পরেই কোনো একটি অঞ্চল রাজ্য হিসেবে গড়ে উঠতে পারে এবং সেখানে একজন ব্যক্তি রাজা হয়ে বসতে পারে। এই বিচারে ধরে নেওয়া চলে যে মিশরের দুই প্রদেশে মোটামুটি একই সময়ে নগর-বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়েছিল।

মেসোপটেমিয়ার বেলায় আমরা দেখেছি, সেখানে নগর-বিপ্লবের আলাদা-আলাদা ধাপগুলোর সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। মিশরের বেলায় এই ধাপগুলো তেমন স্পষ্ট নয়। এখানে পাওয়া যাচ্ছে নগর-বিপ্লবের সম্পূর্ণ চেহারাটি, গোটা দেশের ওপরে একজন একচ্ছত্র রাজার শাসন কায়েম হওয়া। তার আগেকার প্রস্তুতির পর্বটি সম্পর্কে সরাসরি সাক্ষ্য খুবই কম। সে-সময়কার গ্রাম ও বসতির অধিকাংশ নিদর্শন নীলনদের পাঁকে তলিয়ে গিয়েছে।

দুটি নিদর্শন সম্পর্কে এখানে কিছু বলা দরকার। একটি হচ্ছে ফায়ুম, অপরটি মেরিম্‌ডে। দুটি জায়গাই নীলনদের পশ্চিমে, প্রথমটি বর্তমান কায়রোর কিছুটা দক্ষিণে, দ্বিতীয়টি কিছুটা উত্তরে।

ফায়ুম থেকে পাওয়া নিদর্শন থেকে বলা যায় যে প্রাগৈতিহাসিক কালে এই হ্রদের ধারে মানুষের বসতি ছিল। হাতিয়ারের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে চকমকি পাথরের তৈরি তীরের ফলক, হাড়ের তৈরি হার্পুন ও বর্শার ফলক, ইত্যাদি। হাতিয়ারের ধরন দেখে বোঝা যায় ফায়ুমীয়রা ছিল প্রধানত শিকারজীবী। হ্রদের মাছ ও অন্যান্য জীবজন্তু তারা শিকার করত। তবে খাদ্যসংস্থানের একমাত্র উপায় শিকার ছিল না। তাদের বসতিতে শস্যের গোলা বা 'সাইলো' পাওয়া গিয়েছে। এমের জাতীয় গম ও বার্লিও তাদের খাদ্য ছিল। তবে সাইলোর আকার দেখে অনুমান করা চলে, গম ও বার্লি তারা ব্যবহার করত আনুষঙ্গিক খাদ্য হিসেবে। কিন্তু এই গম ও বার্লি বুনো নয়, রীতিমতো চাষ করা। ফসল কাটার জন্যে তারা ব্যবহার করত কাঠের হাতলে চকমকি পাথরের দাঁত বসানো কাস্তে। আর

শস্যের দানা পেষাই করার জন্যে পাথরের জাঁতা। পোড়ামাটির পাত্র ও সূতার কাপড় তৈরি করতে ও বুনতে জানত। ঘষেমেজে ধারালো করা কুড়ুল এবং টেকো ও তাঁতও তাদের হাতিয়ারের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে।

মেরিম্‌ডের নিদর্শনও একই ধরনের। হাতিয়ারের ধরন দেখে বোঝা যায়, প্রধান খাদ্য ছিল শিকার করে আনা জন্তুজানোয়ারের মাংস, আনুষঙ্গিক খাদ্য গম ও বার্লি। শস্যভাণ্ডারের নিদর্শন আছে, শস্য মাড়াই করার জায়গাটিরও। যে-সব জন্তুজানোয়ারের হাড় পাওয়া গিয়েছে তা দেখে বোঝা যায়, গ্রামবাসীরা পশুপালন করতে জানত। পালিত পশুর মধ্যে ছিল শুয়োর, গোরু জাতীয় পশু, ভেড়া ও ছাগল। ঘষেমেজে ধারালো করা কুড়ুল, পোড়ামাটির পাত্র, টেকো, তাঁত—এসব হাতিয়ারের চল মেরিম্‌ডেতেও ছিল। এসব ছাড়াও মেরিম্‌ডেতে একটি নতুন ব্যাপার লক্ষ করা গিয়েছে। কুটিরগুলো এলোমেলো নয়, স্পষ্ট একটা বিন্যাস বজায় রেখে ঠিক যেন রাস্তা-বরাবর সারিবদ্ধভাবে তোলা। এ থেকে বোঝা যায়, এই গ্রামটির জীবনযাত্রায় রীতিমতো শৃঙ্খলা ও সংগঠন ছিল।

মিশরে একচ্ছত্র রাজার রাজত্ব শুরু হবার আগের অবস্থা সম্পর্কে যতোদূর জানা গিয়েছে তাতে মনে হয় মিশরে মেরিম্‌ডের মতো এমনি কতগুলো গ্রাম-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। 'গ্রাম-ব্যবস্থা' কথাটা লক্ষ করতে বলছি। বাঁচার তাগিদে একদল মানুষ বিশেষ একটা এলাকায় বসতি বা গ্রাম গড়ে তুলত। আগে বলেছি, নীলনদের উপত্যকাতে বসতি গড়ে তোলার কাজটা বড়ো সহজ ছিল না। অনেক জলা ও জঙ্গল নিকেশ করতে হয়েছিল, জলসেচের জন্যে অনেক খাল ও নালা কাটতে হয়েছিল। এতখানি মেহনতের পরে যে চাষযোগ্য জমি পাওয়া যায় সেই জমির ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা নতুন সম্পর্ক, মানুষের জীবনযাত্রায় একটা নতুন সংগঠন ও শৃঙ্খলা। এরই নাম গ্রাম্য-ব্যবস্থা। গ্রীকরা এই ব্যবস্থার নাম দিয়েছিল 'নোম্' (nome)। প্রাগৈতিহাসিক

মিশরে নগর-বিপ্লব শুরু হয়েছিল এমনি কতকগুলো বিচ্ছিন্ন গ্রাম বা নোম্ গড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে।

খুব সম্ভবত ঐতিহাসিক কাল শুরু হবার আগে মিশরে বিয়াল্লিশটি নোম্ ছিল ; বাইশটি দক্ষিণ মিশরে, কুড়িটি উত্তর মিশরে।

প্রত্যেকটি নোম্ একটি করে প্রতীক-চিহ্ন ব্যবহার করত। যেমন, বাজপাখি বা শেয়াল বা ভেড়া বা এ-ধরনের কোনো পশু-পাখি বা কোনো গাছগাছড়া। গ্রামবাসীরা মনে করত, যে-বিশেষ পশু বা পাখি বা গাছগাছড়াকে তারা প্রতীক-চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করছে তিনিই তাদের আদি-পুরুষ। তার মানে, জমির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্পর্কের মধ্যেও টোটেম-বিশ্বাসটি বজায় ছিল।

আগে বলেছি একটিমাত্র নদীর ওপরে নির্ভর করে যদি অনেক-গুলো আলাদা আলাদা বসতি গড়ে ওঠে তবে মারামারি কাটাকাটির একটা অবস্থা তৈরি হয়ে যায়। প্রাগৈতিহাসিক মিশরেও ঠিক তাই হয়েছিল। নোম্গুলোর মধ্যে জমি আর জলের দখল দিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই থাকত, আক্রমণ ও পাল্টা-আক্রমণের শেষ ছিল না। মিশরের একটি কবরে পাথরের ওপরে আঁকা একটি ছবি পাওয়া গিয়েছে যাতে দেখা যায়, একদল পশু আর পাখি নিজেদের মধ্যে ভীষণভাবে লড়াই করছে। এই ছবির এক-একটি পশু বা পাখি হচ্ছে এক-একটি টোটেম। আবার এক-একটি টোটেম হচ্ছে এক-একটি নোমের প্রতীক-চিহ্ন। তার মানে, নোম্গুলো নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করছে। এমনি একটি ছবির নিচে লেখা, বাজপাখি আর সবাইকে গিলে খেয়েছে। এ-ছবির অর্থও স্পষ্ট। বাজপাখি একটি টোটেম, অর্থাৎ একটি নোম্। এই বাজপাখির নোম্টি অন্য সমস্ত টোটেমের নোম্কে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেছে।

এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। মিশরের প্রথম একচ্ছত্র রাজার নাম মেনেস, তাঁর টোটেম ছিল বাজপাখি। দক্ষিণ মিশরে হিয়েরোকনপোলিস-কে কেন্দ্র করে যে নোম্টি গড়ে উঠেছিল সেটিই

ছিল বাজপাখির নোম্। কালক্রমে এই নোম্‌টির পরাক্রম এত বেড়ে গিয়েছিল যে অন্য সমস্ত নোম্‌কে পরাজিত করে গোটা মিশরের ওপর আধিপত্য কায়েম করেছিল। মিশরের ঐতিহাসিককালের শুরুও এই সময় থেকে।

লক্ষ করার বিষয়, মেনেসের একচ্ছত্র রাজা হয়ে বসার ঘটনাটি আমরা জানতে পারছি একটি কবরের ভেতর থেকে পাওয়া একটি ছবি ও একলাইন লেখা থেকে। এটি মিশরের একটি বিশেষত্ব। মিশর সম্পর্কে প্রায় সমস্ত খবরই সংগ্রহ করা হয়েছে মিশরের কবর থেকে। বিশেষ করে প্রাগৈতিহাসিক মিশরের সরাসরি সাক্ষ্য প্রায় না-থাকার মতো। সুমেরের বেলায় আমরা দেখেছি প্রাগৈতি-হাসিক সুমেরের বিবরণ তৎকালীন মন্দির থেকেই সরাসরি পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক মিশরের বিবরণ সংগ্রহ করা হচ্ছে পরবর্তীকালের কবরখানার কোনো একটি পরোক্ষ সাক্ষ্য থেকে।

কোনো কোনো পণ্ডিত মিশরকে বলেছেন কবরের দেশ। কথাটা একটুও বাড়িয়ে বলা নয়। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁজতে মিশরের যে-কোনো জায়গার মাটি খুঁড়লে শুধু পাওয়া যায় কবরখানা, আর কিছু নয়। প্রাচীন শহর ও গ্রামের বিশেষ কোনো চিহ্ন নেই।

মিশরের এই বিশেষত্বটি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। মিশরীয়রা বিশ্বাস করত যে মানুষের জীবনে জীবনের লক্ষণ শেষ হয়ে যাবার পরেও জীবন ফুরিয়ে যায় না। পুরাতন প্রস্তরযুগের মানুষরাও এই একই বিশ্বাস নিয়ে মৃতের কবর দিত। কবর দেওয়ার প্রথার শুরুই মানুষের এই বিশ্বাস থেকে। কিন্তু মিশরীয়দের এই বিশ্বাসটি ছিল আরো অনেক গভীর। তাদের কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হয় জীবিতকালেও তারা শুধু মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কেই ভাবত এবং সে-জীবনের আয়োজন করতে করতেই এক-একজন মানুষের সারাটা জীবন কেটে যেত। বিশেষ করে রাজারাজড়াদের বেলায় এ-ব্যাপারটা একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছত বলে মনে

হয়। রাজা হয়ে বসার দিনটি থেকেই শুরু হয়ে যেত তাদের সমাধি-সৌধ তৈরি করার তোড়জোড়। এমন নজিরও আছে যে কোনো কোনো রাজার সমাধি-সৌধ তৈরি করার জন্যে লক্ষাধিক মানুষকে কয়েক বছর ধরে মেহনত করতে হয়েছিল। আর শুধু কি একটি সৌধ, মৃত্যুর পরের জীবনেও যাতে আসবাব ও উপকরণের কোনো রকম অভাব বোধ করতে না হয় সেজন্যে খুঁটিয়ে বন্দোবস্ত করা হত। এমনকি পাত্রমিত্রের অভাবটুকুও নয়। পাত্রমিত্রদেরও রাজার সঙ্গে সঙ্গে কবর দেওয়া হত বা তাদের মূর্তি গড়ে কবরের মধ্যে সাজিয়ে রাখা হত। কবরখানা তৈরি করার জন্যে এতখানি চিন্তা, এতখানি আয়োজন, এতখানি মেহনত ও এতখানি সম্পদ খরচ করতে আর কোনো দেশে দেখা যায় নি। প্রাচীন মিশরের রাজাদের রাজপ্রাসাদের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না—তা নিশ্চয়ই কাদামাটি দিয়ে যেমন-তেমনভাবে তৈরি হত—কিন্তু রাজাদের কবরখানা এত হাজার বছর পরেও অটুট আছে।

মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে মিশরীয়দের এই গভীর বিশ্বাসের মূলে ছিল তাদের বাস্তব জীবন। চোখের সামনে তারা দেখত তাদের জীবনদাতা নীলনদকে। নীলনদ যেন তার জীবনের অংশ দিয়ে তাদের সকলের জীবন বাঁচিয়ে রাখছে। নীলনদের বন্যাই এই জীবন। কিন্তু বন্যার পরেই নীলনদের জীবনের সমস্ত লক্ষণ শেষ। যেন নীলনদের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এই মৃত্যুর অবস্থা চিরকালের নয়। বছর না ঘুরতেই আবার ফিরে আসে নীলনদের জীবন। তেমনি, যে-সূর্য তাদের মাঠে ফসল ফলায় সেই সূর্যেরও দিনের শেষে মৃত্যু। কিন্তু পরদিন সকালেই আবার দেখা যায় জীবন্ত সূর্য।

মানুষের বেলাতেও তাই। সমস্ত আয়োজন যেন তৈরি থাকে। শরীরটি যেন এতটুকু বিকৃত না হয়। নীলনদের মতো, সূর্যের মতো মৃত মানুষটিও আবার জীবন ফিরে পাবে।

আর রাজাদের কথাই তো আলাদা। রাজা হচ্ছেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তিনি আছেন বলেই সমস্ত দেবতা সন্তুষ্ট। তিনি আছেন

বলেই ঠিক সময়ে ঠিক ঠিকমতো বৃষ্টি, রোদ, বন্যা। দূরে থাকে মড়ক-মহামারি, ধনেসম্পদে শ্রীবৃদ্ধি হয় দেশের। রাজা এই গুরু-দায়িত্ব পালন করেন হাজার রকমের জাদুক্রিয়া পালন করে। মৃত্যুর পরেও রাজার এই অলৌকিক ক্ষমতাটি বিনষ্ট হবার নয়। সেজন্যে রাজ্যের মঙ্গলের জন্যেই রাজার মৃত্যুর পরেও রাজার জন্যে এমন সব বন্দোবস্ত যেন রাজার মৃত্যুর আগের জীবনটিই অব্যাহত।

কিন্তু তাই বলে রাজার মৃত্যুর পরে রাজার সিংহাসনটি শূন্য থাকত না। রাজার ভাই বা রাজার ছেলে বসত সেই সিংহাসনে। এমনকি মাঝে মাঝে রাজার বংশ পর্যন্ত পাল্‌টে যেত। কিন্তু তাতে রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় কিছু হেরফের হত না। প্রথমত প্রজাদের কাছে রাজা ছিলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি—ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে তিনি কেমন তাতে কিছু যেত আসত না। তার ওপরে ছিল একটি শাসন-যন্ত্র যা রাজার মৃত্যুর পরেও টিকে থাকত। এসব ব্যাপারে কোনো বিশেষত্ব ছিল না। বিশেষত্ব ছিল রাজার মৃত্যুর পরে মৃত রাজার সঙ্গে প্রজাদের সম্পর্কের মধ্যে। প্রজারা বিশ্বাস করত যে মৃত রাজা তাঁর কবরের মধ্যে থেকেই এমন জাদু-প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন যে রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হবে। রাজা নিজেও তাঁর জীবিতকালে এমন সব আচার-অনুষ্ঠান প্রচলন করতেন যাতে প্রজা-দের মনে এই বিশ্বাসটি বদ্ধমূল হতে পারে। এই ব্যাপারটি চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল যখন মিশরের রাজা বা 'ফেরাও' সূর্যের পুত্র হয়ে উঠেছিলেন।

অবশ্য সব রাজাই যে এমনি একটি কল্পনার জগৎ গড়ে নিয়ে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করার দায় সারতেন তা নয়। এমন সাক্ষ্যও আছে যে কোনো কোনো রাজা জলসেচের খাল কাটার কাজটি নিজের হাতে কোদাল ধরে শুরু করে দিয়েছেন বা বন্যার জল ধরে রাখার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন বা নীলনদের জলের উচ্চতা মাপার জন্যে নাইলোমিটার বসিয়েছেন। অবশ্য জলের উচ্চতা মাপার ব্যবস্থাটি প্রধানত হয়েছিল কর-ধার্য করার সুবিধের জন্যে। কিন্তু

ব্যবস্থাটি যে-জন্যেই হয়ে থাকুক এর ফলে প্রজাসাধারণ উপকৃত হয়েছিল। এমনি আরেকটি আবিষ্কার, বছর-গণনা বা ক্যালেণ্ডার।

তাছাড়া মিশরের রাজারা ছিলেন সে-দেশের বাণিজ্যের সবচেয়ে বড়ো পৃষ্ঠপোষক। এমনিতে রোজকার প্রয়োজনীয় কোনো জিনিসের জন্যে মিশরকে খুব বেশি বাণিজ্যের ওপরে নির্ভর করতে হত না। অন্তত এ-ব্যাপারে মেসোপটেমিয়ার চেয়ে মিশর ছিল অনেক বেশি স্ব-নির্ভর। হাতিয়ার তৈরি করার জন্যে চকমকি পাথর মিশরে স্থানীয়ভাবেই পাওয়া যেত, ফলে মিশরে ধাতুর ব্যবহার অনেক দেরিতে শুরু হয়েছিল। ব্যাবিলোনিয়ায় ধাতুর তৈরি হাতিয়ারের পুরোপুরি চল হবার পরেও বহুকাল পর্যন্ত মিশরে পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করা হত। মিশরে বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল অন্য ধরনের
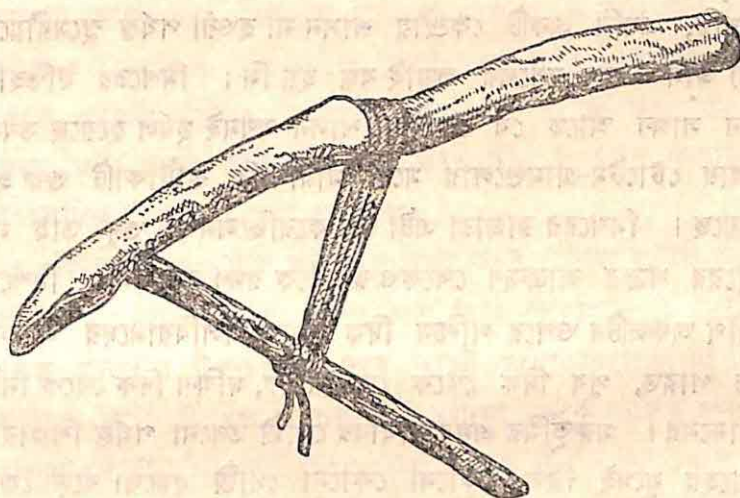
মিশরের কাঠের লাঙল (খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০)

একটি প্রয়োজন থেকে। বিলাসের বা জাদুক্রিয়ার উপকরণ হিসেবে কতকগুলো জিনিসের দরকার পড়ত যা মিশরে স্থানীয়ভাবে পাওয়া সম্ভব ছিল না। যেমন, ম্যালাকাইট, মণিমুক্তো, সোনা, মসলাপাতি ইত্যাদি। অথচ এ-জিনিসগুলো না হলে রাজারাজড়াদের চলত না। এজন্যে রাজকোষের খরচেই নানা অঞ্চলে বাণিজ্যের দল পাঠানো হত এসব জিনিস সংগ্রহ করে আনার জন্যে। তামা ও নীলকান্তমণি

কেটে আনা হত সিনাই-এর খনি থেকে। কাঠ ও রজন সংগ্রহ করা হত উত্তর সিরিয়ায়। এমনি আরো নানা অঞ্চলে। রাজকোষের খরচে এবং রাজকীয় সৈন্যদলের পাহারায় বাণিজ্য-দলগুলো রওনা হত।

বাণিজ্যের উদ্দেশ্য যাই হোক (বিলাস ও জাদুক্রিয়ার উপকরণ সংগ্রহ), এর ফল কিন্তু শুভ হয়েছিল। নতুন একটি শ্রেণী তৈরি হয়েছিল যারা রাজকোষের অর্থে প্রতিপালিত হত। যেমন, বণিক, নাবিক, পণ্য-বাহক, সৈনিক, করণিক। আর দেশের মধ্যে এমন একটি অবস্থা তৈরি হয়েছিল যা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সহায়ক।

মিশরে রাজার শাসনের ফলে সবচেয়ে বড়ো যে উপকারটি হয়েছিল সে-সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করেছি। টোটেম-গ্রামগুলোর মধ্যে মারামারি কাটাকাটি বন্ধ হয়েছিল। সুমেরের বেলায় আমরা দেখেছি, এমনি একটি কেন্দ্রীয় শাসন না হওয়া পর্যন্ত সুমেরীয়দের মধ্যে জমি ও জল দখলের লড়াই বন্ধ হয় নি। মিশরের ইতিহাসে এমন সাক্ষ্য আছে যে কেন্দ্রীয় শাসন যখনই দুর্বল হয়েছে তখনই আবার টোটেম-গ্রামগুলোর মধ্যে মারামারি কাটাকাটি শুরু হয়ে গিয়েছে। মিশরের রাজারা এটা বন্ধ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকেও রাজাকে রক্ষা করতেন। মিশরের ব-দ্বীপ অঞ্চলটির ওপরে পশ্চিম দিক থেকে লিবিয়ানদের আক্রমণ হতে পারত, পুব দিক থেকে বেদুইনদের, দক্ষিণ দিক থেকে নিউ-বিয়ানদের। মরুভূমির এসব যাযাবর গোষ্ঠী তখনো পর্যন্ত শিকার ও সংগ্রহের যুগেই ছিল, কোনো কোনো গোষ্ঠী হয়তো বড়ো জোর বাগিচা-ধরনের চাষ করত—এ অবস্থায় মিশরের ধনসম্পদের ওপর তাদের নজর পড়া স্বাভাবিক। সুযোগ পেলেই তারা লুটপাট চালাত। মিশরের রাজারা সীমান্তে স্থায়ীভাবে সৈন্য মোতায়েন করে এসব হানাদারদের ঠেকিয়েছিলেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, তখনকার অবস্থায় রাজার শাসন নানা দিক থেকে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও একই সাক্ষ্য দিচ্ছে। মেনেসের রাজত্বকাল শুরু হবার পরে মিশরে

মানুষের সংখ্যা যেমন বেড়েছিল, তেমনি বেড়েছিল ধনসম্পদ। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় এই যে মিশরের সমস্ত উন্নতির মূলে রয়েছে কতকগুলো জাদুক্রিয়া। জীবনযাত্রার পদ্ধতির দিক থেকে বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দিক থেকে যেখানেই বড়ো রকমের অগ্রগতি হয়েছে সেখানেই দেখা যায় যে তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কোনো না কোনো জাদু-অনুষ্ঠান।

খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ সাল পর্যন্ত মিশরের প্রায় সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে কবর থেকে। শুধু কবর বললে অন্তত মিশরদেশের কবর সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা করা সম্ভব নয়। বলা উচিত বিশেষ একটি ব্যবস্থা যেখানে মৃতব্যক্তি মৃত্যুর পরের জীবন যাপন করতে আসে। ফলে আয়োজনও করতে হয় তেমনি। এজন্যে দেখা যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মিশরের কবরের চেহারা ও সাজসজ্জা পাল্‌টে যাচ্ছে। চেহারার দিক থেকে যেমন বড়ো হচ্ছে, সাজসজ্জার দিক থেকে তেমনি সমৃদ্ধ। যতোটা সম্ভব ঘটা ও জাঁকজমকের সঙ্গে কবর তৈরি করার তাগিদ থেকেই তৎকালীন মিশরের অনেকগুলো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সাল পর্যন্ত যে-সমস্ত কবর পাওয়া যাচ্ছে তা খুবই মামুলি। মাটির মধ্যে একটা গর্ত আর ঘরোয়াভাবে তৈরি করা কিছু মূল্যবান উপকরণ। তবে তারই মধ্যে ক্রমোন্নতির একটি ধারাও ফুটে উঠছিল। শুধু গর্ত খোঁড়া থেকে গর্তের ওপর গড়ে তোলা ছোটখাটো একটি স্তূপ; শুধু ঘরোয়া জিনিসপত্র থেকে ক্রমে বিদেশ থেকে নিয়ে আসা বিলাস-উপকরণ; শুধু পাথরের হাতিয়ার থেকে ক্রমে তামার যন্ত্রপাতি।

তারপর মেনেসের রাজত্বকাল শুরু হবার পরে দেখা যায়, কবরের ওপর শুধু একটি স্তূপ নয়, রীতিমতো সৌধ গড়ে তোলার চেষ্টা চলেছে।

এ-আলোচনায় আরো এগোবার আগে মিশরের রাজবংশের সাল-তারিখ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করে নেওয়া দরকার।

প্রাচীন মিশরের ইতিহাসকে মোটামুটি ত্রিশটি রাজবংশের রাজত্বকালে ভাগ করা চলে। খ্রীষ্টপূর্ব ২৯৫০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১১০০—মোটামুটি এই দু'হাজার বছরের রাজত্বকালে তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ বংশের রাজত্বকালকে (খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৫০ থেকে ২৪০০) বলা হয় পুরনো যুগের রাজত্ব, দ্বাদশ রাজবংশের রাজত্বকালকে (খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৭৫০) মাঝের যুগের রাজত্ব আর অষ্টাদশ থেকে বিংশ রাজবংশের রাজত্বকালকে (খ্রীষ্টপূর্ব ১৬০০ থেকে ১১০০) নতুন যুগের রাজত্ব। অর্থাৎ তিনটি যুগ—সাড়ে-তিনশো বছরের পুরনো যুগ, আড়াই-শো বছরের মাঝের যুগ ও পাঁচশো বছরের নতুন যুগ। আর মোটামুটি বলা চলে পুরনো যুগটির শুরু খ্রীষ্টের জন্মের আড়াই-হাজার বছর আগে, মাঝের যুগটির দু'হাজার আগে আর নতুন যুগটির দেড়-হাজার বছর আগে।

আমরা বলেছি, পুরনো যুগটির শুরু তৃতীয় রাজবংশ থেকে। তার মানে পুরনো যুগেরও আগে দুটি রাজবংশের রাজত্বকাল রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় রাজবংশ—খ্রীষ্টপূর্ব ২৯৫০ থেকে ২৭৫০। এই দুটি রাজবংশের রাজত্বকালের কবর নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম।

যে কথা হচ্ছিল, এই সময়ে এসে দেখা যাচ্ছে কবর বলতে শুধু একটা গর্ত নয়, গর্তের ওপর মাটির স্তূপ বা ইটের গাঁথুনিও। সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে কবরের ভেতরকার ঐশ্বর্য। কত রকমের আসবাব যে জড়ো করা হয়েছে! কত রকমের অস্ত্রশস্ত্র! কত রকমের পাত্র ও প্রসাধনের উপকরণ! কত রকমের অলংকার! সীডার কাঠ, তামা, সোনা, অ্যালাবাস্টার, ল্যাপিস ল্যাজিউলাই ও আরো নানান ধরনের মণিমুক্তো দিয়ে তৈরি হয়েছে অলংকারগুলো। কারিগরি দক্ষতাও আশ্চর্য রকমের নিখুঁত। উপকরণের তালিকা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, অনেকগুলো উপকরণ স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় নি, বিদেশ থেকে সংগৃহীত। এ তো গেল কবরের সাজসজ্জার দিক। এসব ছাড়াও আছে একটি ভাঁড়ার ঘর যেখানে সুন্দর সুন্দর পাত্রে মজুত করা রয়েছে তেল, সুরা, শস্য ও আরো নানান ধরনের খাদ্য ও পানীয়।

আছে একটি দরবার-ঘর যেখানে রাজার অনুচর ও পরিচররা হয় সশরীরেই বর্তমান (অর্থাৎ তাদের খুন করে কবর দেওয়া হয়েছে) কিংবা প্রতিমূর্তি ধারণ করেছে। আর আছে কয়েকটি ফলক ও সীলমোহর যার গায়ে খোদাই করে লেখা আছে রাজার রাজত্বকালের বড়ো বড়ো ঘটনার বিবরণ। সব মিলিয়ে মৃত্যুর পরের জীবনের কবরখানা মৃত্যুর আগের জীবনের রাজপ্রাসাদের চেয়ে কোনো দিক থেকে হীন নয়।

অনুমান করা চলে, এমনি একটি কবর তৈরি করার জন্যে বেশ কিছু লোককে মেহনত করতে ও মাথা খাটাতে হত। মাটি খোঁড়া, ইট ও কাঠ বয়ে আনা, ইটের গাঁথুনি তোলা—এসব কাজের জন্যে ছিল একদল মজুর ও রাজমিস্ত্রী। সাজসজ্জা ও অলংকার তৈরির জন্যে একদল দক্ষ কারিগর। ফলক ও সীলমোহরে লিপি খোদাই করার জন্যে একদল লিপিকর ও খোদকার। গোটা নির্মাণকার্যটির পরিকল্পনা ও তদারক করার জন্যে একদল তত্ত্বাবধায়ক। এই বিপুল সংখ্যক মানুষ সরাসরি খাদ্য উৎপাদন করত না, রাজভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত শস্য থেকে তাদের খাদ্যের যোগান দেওয়া হত। তেমনি বিদেশ থেকে যে-সব উপকরণ সংগ্রহ করতে হত (যেমন সীডার-কাঠ, তামা ল্যাপিস ল্যাজিউলাই ও মণিমুক্তো) তার জন্যেও খরচ করতে হত এই রাজভাণ্ডার থেকেই। তার মানে, সুমেরের নগর-বিপ্লবের ফলে সে-দেশে যেমন একটি নতুন শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল তেমনি একটি নতুন শ্রেণী মিশরেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মিশরে এ-ব্যাপারটি সম্ভব হয়েছে একই শাসনের আওতায় মিশরের দুটি অংশ যুক্ত হবার ফলে। কিন্তু লক্ষ করার বিষয়, মিশরের এই নতুন শ্রেণীর সমস্ত কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য কিন্তু মূলত একটি—রাজার মৃত্যুর পরে তাঁর মৃতদেহটি ঠিক-ভাবে রাখার জন্যে আয়োজন ও বন্দোবস্ত।

পরবর্তীকালে যখন পুরনো যুগের রাজত্ব শুরু হচ্ছে তখনো দেখা যায়, এই উদ্দেশ্যটি বদলায় নি। ইতিমধ্যে দেশের ধনসম্পদ আরো বেড়েছে এবং সেই বেড়ে-যাওয়া ধনসম্পদ রাজার কবরের জাঁক-

জমককে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। তৃতীয় রাজবংশের রাজত্বকালে এসে চেখে পড়ে, সমাধি-সৌধ তৈরি হচ্ছে মাটি বা ইট দিয়ে নয়, পাথরের চাঁই দিয়ে। ফলে সে-যুগের সেই প্রাথমিক ধরনের যন্ত্র-পাতির সাহায্যেই মস্ত মস্ত পাথরের চাঁইকে কেটেকুটে ঠিকমতো সাইজে নিয়ে আসার বিদ্যাটি আয়ত্ত করতে হয়েছিল। জটিল একটি ব্যবস্থা করতে হয়েছিল ভারী পাথরের চাঁইগুলোকে উঁচুতে তোলার জন্যে। আর এসব বিদ্যা যতোই আয়ত্ত হয়েছিল ততোই সমাধি-সৌধটি আরো বেশি-বেশি উঁচু হয়ে উঠেছিল। তৃতীয় রাজবংশের রাজত্বকালেই একধরনের পিরামিড তৈরি হত যাকে বলা চলে ধাপ-ওলা পিরামিড। আর খাঁটি পিরামিড তৈরি হয়েছিল চতুর্থ রাজবংশের আমলে।

মিশরের পিরামিডের ছবি আমরা সকলেই দেখেছি। কিন্তু পিরামিড তৈরি করার পেছনে যে বিপুল কর্মকাণ্ডটি রয়েছে সে-সম্পর্কে কোনো ধারণা ছবি থেকে হওয়া সম্ভব নয়। প্রথমে কয়েকটা হিসেব দিচ্ছি যা থেকে নির্মাণকার্যের বিপুলতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হতে পারে। বর্তমান কায়রোর কাছে নীলনদের পশ্চিমে গিজা-তে যে পিরামিডটি রয়েছে সেটি তৈরি করতে প্রায় আড়াই লক্ষ পাথরের চাঁই লেগেছিল। কোনো কোনো চাঁইয়ের ওজন প্রায় হাজার মন, গড়-পড়তা ওজন সত্তর মনের কাছাকাছি। ভূমিতে এক-একটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৭৫৫ ফুট, আর ভূমি থেকে চূড়োর উচ্চতা ৪৮১ ফুট। পাথর সংগ্রহ করা হয়েছিল নীলনদের পুব তীরের তুরা-তে। স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়ে পাথরগুলো নিয়ে আসা হয়েছিল গিজা পর্যন্ত, তারপর সেখানে একশো ফুট উঁচু জায়গায় টেনে তোলা হয়েছিল। একলক্ষ লোকের পুরো দশটি বছর সময় লেগেছিল শুধু এই পাথর সংগ্রহ করার জন্যে। তারপরে আরো দশটি বছর সময় লেগেছিল পিরামিডটি গেঁথে তোলার জন্যে।

কিন্তু কর্মকাণ্ড যে কতখানি ব্যাপক তা এই হিসেব থেকে বোঝা যাবে না। কেননা পিরামিডটি তৈরি করতে শুধু যে একলাখ

মানুষের কুড়ি বছরের মেহনত লেগেছিল তাই নয়, কয়েকটি বিদ্যাও আয়ত্ত করতে হয়েছিল। যেমন স্থপতিবিদ্যা। পিরামিডের মতো এমন একটি বিপুল আয়তনের গাঁথুনি তুলতে হলে আগে থেকেই নির্ভুলভাবে অনেক মাপজোক ও হিসেব করে নিতে হয়। স্থপতি-বিদ্যা বেশ কিছুটা আয়ত্ত না হলে এ-কাজটি সম্ভব নয়। ভারী ভারী পাথরকে উঁচুতে টেনে তুলতে হলে বলবিদ্যা কিছুটা আয়ত্ত করা দরকার। আর্চ্ বা খিলান তৈরি করতে হলে চাপ ও ঠেলার তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার। এমনি আরো অনেক কিছু সম্পর্কে। আবার শুধু কয়েকটি বিদ্যা আয়ত্ত করার ব্যাপার নয়, এমন একটি নিখুঁত তত্ত্বাবধান-ব্যবস্থা দরকার যার ফলে সমস্ত বিদ্যার সমন্বয় হয়, সমস্ত মেহনত একই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে।

এ তো গেল শুধু গাঁথুনি তোলার দিক। তারপরেও আছে পিরামিডের ভেতরকার সাজসজ্জা ও অলংকরণ। সেজন্যে চাই একদল ছুতোর, কামার, স্যাকরা, জহুরী ইত্যাদি। অনুমান করা চলে, এই বিরাট আকারের পিরামিডের ভেতরকার সাজসজ্জা ও অলংকরণ হবে বিরাট। আর হয়েছেও তাই। পিরামিডের ভেতরকার সাজসজ্জা ও অলংকরণের পুরো একটি বিবরণ দিতে হলে আরেকটি বই লিখতে হবে। এককথায় বলা চলে, সম্ভবমতো সব রকমের আসবাব, অলংকার, খাদ্য ও পানীয়ের রাজোচিত একটি আয়োজন পিরামিডের মধ্যে ছিল।

চতুর্থ রাজবংশের রাজত্বকালে এসে চোখে পড়বে, শুধু পিরামিড নয়, রাজার মৃতদেহটিও যাতে অবিকৃত অবস্থায় থাকে সেজন্যে মৃতদেহকে মমি করার ব্যবস্থা হয়েছে। এ-কাজটি করত একদল ভেষজবিদ। আমাদের আলোচনায় এতক্ষণ পর্যন্ত কামার, ছুতোর ইত্যাদি নানান ধরনের কর্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, নানান ধরনের বিদ্যার অনুশীলনের খবর আমরা পেয়েছি কিন্তু ভেষজবিদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এর আগে হয় নি। রাজার মৃতদেহকে মমি করার ব্যবস্থা শুরু হবার পর থেকে একদল মানুষ শুধু এই ভেষজবিদ্যার অনুশীলনেই

লেগে থাকতে পারল। ফলে শারীরবৃত্ত সম্পর্কেও জ্ঞান বাড়তে লাগল। প্রাচীন মিশরে রাজাদের রাজত্ব শুরু হবার আগে যখন শুধু গর্ত খুঁড়েই মৃতদেহকে কবর দেওয়া হত তখন অনেক সময়ে শুকনো বালির মধ্যে থাকার ফলে মৃতদেহে পচ ধরত না। কিন্তু রাজাদের কবর দেওয়া হত রীতিমতো একটি সমাধি-সৌধ তুলে আর মৃতদেহটি রাখা হত কাঠের বা পাথরের কফিনের মধ্যে। এ-অবস্থায় সহজেই মৃতদেহে পচ ধরত। এই পচ-ধরাকে বন্ধ করার জন্যে ও মৃতদেহ অবিকৃত রাখার জন্যে ভেষজবিদ্যার অনুশীলন শুরু। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই চলত নানা ধরনের জাদুক্রিয়া ও রিচুয়াল।

এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে অপর যে বিদ্যাটির অনুশীলন শুরু তা হচ্ছে ভাস্কর্য। কাঠ বা পাথর দিয়ে রাজার একটি প্রতিমূর্তি গড়ে নেওয়া চলে, একটি জাদু-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রতিমূর্তির মধ্যে 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' করাও অসম্ভব ব্যাপার নয়। তখন রাজার রক্ত-মাংসের শরীরটি যদি চোখের সামনে নাও থাকে তো এই মূর্তিটিকে দিয়ে কাজ চলতে পারে। ফলে পুরনো রাজত্বে ভাস্কর্যবিদ্যার আশ্চর্য উন্নতি হয়েছিল। এমন সব প্রতিমূর্তি গড়া হত যা সমস্ত দিক থেকে হুবহু বাস্তব মানুষটির মতোই।

আরো একটি ব্যাপার আছে। জীবিতকালে রাজা যেমন রাজত্ব ভোগ করেছেন, মৃত্যুর পরের জীবনেও সেটি থাকা দরকার। ফলে কবরখানার মধ্যে শুধু যে অজস্র আসবাব ও উপকরণ মজুদ করা হত তাই নয়, রাজার ভোগের জন্যে কিছুটা ভূ-সম্পত্তিও আলাদা করে দান করা হত। এটিও করা হত বিশেষ কতকগুলো জাদু-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এসব জাদু-অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ ছিল প্রজাদের জীবনযাত্রার ছবি কবরের দেওয়ালে এঁকে রাখা। ছবিতে যে-সব দৃশ্য আঁকা হয়েছে তাতে দেখা যায়—চাষের কাজ ও পশুপালন হচ্ছে, শিকারীরা বেরিয়েছে জন্তুজানোয়ার বা মাছ শিকার করতে, গোমস্তরা তদারক করছে, চাষীরা আসছে খাজনা দিতে, লিপিকর হিসেব লিখছে, খাজনা না দেবার জন্যে চাষীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, এমনি

নানা ঘটনা। এসব ছাড়াও আছে কুমোর-কামার-ছুতোর-জহুরী ইত্যাদি নানা ধরনের কারিগরদের কাজের দৃশ্য। সব মিলিয়ে মনে হয় মস্ত একটা খামার-বাড়ি, পুরোপুরি নগর নয়। কিন্তু এই খামার-বাড়িটিকে কল্পনা করতে হবে বৃহত্তর রাষ্ট্রব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে। মিশরের রাজার শাসনের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যের ব্যবস্থাটিও খাদ্য-উৎপাদনের ব্যবস্থার মতোই সমান গুরুত্ব লাভ করেছিল। এদিক থেকে মেসোপটেমিয়ার বিপ্লবের সঙ্গে মিশরের বিপ্লবের লক্ষণগত মিল আছে। বিপ্লবের ফলে দুটি দেশেই সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল। দুই দেশেই লেখা ও লিপির সূত্রপাত হয়েছিল। দুটি দেশেই নানা বিদ্যার অনুশীলন শুরু হয়েছিল।

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে শুধুই লক্ষণগত মিল। খুঁটিনাটি ব্যাপারের অমিল সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। যেমন, একদেশের পোড়ামাটির পাত্র অন্যদেশের পোড়ামাটির পাত্রের মতো নয়। কিন্তু এ ছাড়াও একটা মৌলিক ব্যাপারেও অমিল রয়েছে। সুমের-এ উদ্বৃত্ত ভাণ্ডারটির মালিকানা পুরোহিত সম্প্রদায়ের, মিশরে রাজার। সুমের-এ নগর-বিপ্লব হয়েছিল অনেকগুলো নগর আলাদা আলাদাভাবে গড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে, মিশরে এক রাজার শাসনে গোটা দেশকে এক-রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে।

সিন্ধু-উপত্যকা

নগর-বিপ্লবের তৃতীয় কেন্দ্র সিন্ধু-উপত্যকা। মিশর ও ব্যাবিলো-নিয়ার মতো এই অঞ্চলটিও পলিমাটির দেশ। কিন্তু আয়তনে এই অঞ্চলটি মিশর বা মেসোপটেমিয়ার চেয়ে অনেক বড়ো। পশ্চিমে বেলুচিস্তান ও ওয়াজিরিস্তানের পর্বতমালা, উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা, আর পুবে থর মরুভূমি—এই হচ্ছে সীমানা। আকারে মস্ত একটি

ত্রিভুজের মতো। এই ত্রিভুজের তিনটি বাহু যথাক্রমে ৯৫০ মাইল, ৭০০ মাইল ও ৫৫০ মাইল।

এই অঞ্চলের মাটি খুঁড়ে অনেকগুলো প্রাগৈতিহাসিক যুগের বসতির সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে। অনুমান করা চলে, সিন্ধুনদের মোহনা থেকে পঞ্চনদের সমতল জমি পর্যন্ত বিরাট এলাকায় সে-সময়ে চাষের কাজ চলত। এই হিসেবে সিন্ধু-উপত্যকার চাষযোগ্য জমির আয়তন ছিল মেসোপটেমিয়া বা মিশরের চেয়েও অনেক বিশি। পঞ্চনদ ও সিন্ধুর জলপথে যোগাযোগ-ব্যবস্থাও সহজেই গড়ে তোলা গিয়েছিল।

আমরা এই এলাকাটিকে নগর-বিপ্লবের একটি কেন্দ্র বলেছি। আমরা জানি নগর-বিপ্লব তখনই সম্ভব যখন মানুষের হাতে এমন উদ্বৃত্ত শস্য মজুদ হয় যাতে একদল মানুষ সরাসরি খাদ্য-উৎপাদন না করেও শুধু শিল্প ও বাণিজ্যের মাধ্যমে খাদ্য-সংস্থান করতে পারে। এই শর্ত পূরণ হবার পরেই মেসোপটেমিয়ায় ও মিশরে নগর-বিপ্লব হয়েছিল। সিন্ধু-উপত্যকাতেও যে এই শর্ত পূরণ হয়েছিল তার অন্তত দুটি সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে। দুটি নগর। একটি হচ্ছে ইরাবতীর ধারে হরপ্পা, হালের লাহোর থেকে একশো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। অন্যটি সিন্ধু প্রদেশে সিন্ধুনদের ধারে মোহেন-জো-দড়ো, হালের করাচী থেকে দুশো মাইল উত্তরে। নগর দুটি খুব কাছাকাছি নয়—মোহেন-জো-দড়ো থেকে হরপ্পা চারশো মাইল উত্তরে। অথচ এতখানি ব্যবধানে থাকা সত্ত্বেও নগর দুটির মধ্যে সমস্ত দিক থেকে পুরোপুরি মিল—এমনকি ঘরবাড়ি তৈরি করার জন্যে যে ইট ব্যবহার করা হয়েছিল তার মধ্যেও। অনায়াসে মনে হতে পারে, হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়ো যেন একই রাজ্যের দুটি রাজধানী বা একই কালচারের দুটি অবস্থান। প্রত্নবিদরা নাম দিয়েছেন হরপ্পা কালচার। মিশর ও সুমেরের সঙ্গে মিল এদিক থেকে যে এই কালচারের পীঠস্থানও নদী-উপত্যকা। যেমন টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস, যেমন নীল, তেমনি পঞ্চনদ ও সিন্ধু। তেমনি ভৌগোলিক দিক থেকে অবিচ্ছিন্ন একটি দেশ। গোটা দেশটিকে আমরা বলব হরপ্পা।

কিন্তু স্থমেরের বেলায় যেমন আমরা মন্দিরের সাক্ষ্য থেকে নগর-বিপ্লবের প্রায় প্রত্যেকটি ধাপকে চিনতে পেরেছিলাম, মিশরে যেমন আমরা রাজার শাসন কায়েম হবার মধ্যে দিয়ে নগর-বিপ্লবের ধাপগুলোকে অনুসরণ করতে পেরেছিলাম—হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োর বেলায় তেমন কোনো হদিশ নেই। শিল্পে, বাণিজ্যে ও ব্যবস্থাপনায় পুরোপুরি ছুটি নগর—অথচ আমরা জানি না এই নগর ছুটি ঠিক কি-ভাবে গড়ে উঠেছে, কি-ধরনের গ্রাম থেকে, সেখানে কি-ধরনের মানুষ, ইত্যাদি। এমনকি রাজার শাসন চলত, না, পুরোহিতের—তাও নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি। ছুই নগরেই উঁচুদরের পৌর-ব্যবস্থার নিদর্শন রয়েছে। তার মানে, ছুই নগরেই একটা পৌর-শাসনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই পৌর-শাসনের সংগঠনের দিকটি সম্পর্কে বিস্তারিত খবর জানা সম্ভব নয়। ঘরবাড়ির নিদর্শন থেকে বোঝা যায় যে ছুই নগরেই স্পষ্ট ছুটি শ্রেণী ছিল—বিত্তবান ও বিত্তহীন। এই বিত্তহীনেরা দাস ছিল, না, মজুর, তা বলাও সম্ভব নয়। স্থমের ও মিশর সম্পর্কে মস্ত স্থবিধের ব্যাপার ছিল এই যে ওই ছুই দেশ থেকেই এমন সব লিখিত দলিল পাওয়া গিয়েছে যার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োতে এ-ধরনের লিখিত দলিল নেই, হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োর কবরে মৃত-ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো বিবরণ লিখে রাখার রেওয়াজ ছিল না। অবশ্য ছুই নগর থেকেই অজস্র সীলমোহর পাওয়া গিয়েছে, সীলমোহরের গায়ে কিছু লেখাও—কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো লেখার পাঠোদ্ধার করা যায় নি। এ অবস্থায় হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োকে আমরা দেখব নগর-বিপ্লবের ছুটি সিদ্ধ প্রমাণ হিসেবে, ছুটি দৃষ্টান্ত, কিন্তু তার মধ্যে নগর-বিপ্লবের আলাদা আলাদা ধাপগুলোকে খুঁজতে চেষ্টা করব না। অবশ্য এই ছুই নগরেই খোঁড়াখুঁড়ির কাজ এখনো অনেক বাকি, বিশেষ করে মোহেন-জো-দড়োতে। আশা করা চলে যে ভবিষ্যতে এই ছুই নগর সম্পর্কে সমস্ত খবর পুরোপুরি জানা যাবে।

তবে হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োর আশেপাশে তাকিয়েও এই

নগর-বিপ্লবের পটভূমি সম্পর্কে ধারণা হতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, টাইগ্রিস থেকে সিন্ধু পর্যন্ত গোটা এলাকাটিতেই অনেকগুলো ঢিবি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আর এসব ঢিবি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে প্রাগৈতিহাসিক বসতির সাক্ষ্য। নগর নয়, গ্রাম। সেখানে চাষ হত, পোড়ামাটির পাত্র তৈরি হত এবং আরো কিছু আনুষঙ্গিক শিল্পের চর্চাও ছিল। কিন্তু কোথাও উদ্বৃত্ত শস্যের কিছু পরিমাণ এত বেশি নয় যে গ্রাম রূপান্তরিত হতে পারত নগরে। এই গ্রাম-বসতিগুলোর কিছু কিছু বিবরণ আমাদের জানা দরকার।

পুবদিকে সিন্ধু প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও মাকরান। হালের মানচিত্রে অবশ্য এগুলো আলাদা আলাদা দেশ, কিন্তু আমরা যে-সময়ের কথা আলোচনা করছি তখন এই ছিল পশ্চিম ভারতবর্ষ। অঞ্চলটি এখন একেবারে মরুভূমির মতো, বৃষ্টিপাত নেই বললেই চলে। কিন্তু এই অঞ্চলেরই পুবদিকের সীমানায় রয়েছে সিন্ধুনদ। হালে এই নদে সুক্কুর বাঁধ তুলে খানিকটা জমি চাষযোগ্য করে তোলা হয়েছে বটে কিন্তু কৃত্রিম জলসেচের ব্যবস্থার বাইরে তেমনি মরুভূমি। দক্ষিণ সীমানায় মাকরানের উপকূল—ইরানের সীমান্ত থেকে তিনশো মাইল লম্বা একটি ফালি। সেখানেও কোনো বসতি নেই। মাঝে মাঝে বালির পাহাড় আর অগভীর জলাভূমি, জলাভূমির মধ্যে গরানের জঙ্গল, আর কিছু চোখে পড়ে না। উপকূলভাগের সমতল অংশ পেরিয়ে এলেই রুক্ষ পাথুরে পর্বতমালা। কিন্তু দক্ষিণ থেকে উত্তরে বিস্তৃত এই পর্বতমালার ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে তিনটি বিচ্ছিন্ন নদী-উপত্যকা : মাশকাই, নাল ও হাব। গোটা অঞ্চলটিতে গ্রীষ্মকালে দিনের তাপমাত্রা ছায়াতেই একশো-কুড়ি ডিগ্রি পর্যন্ত ওঠে। আর জমিতে নুনের ভাগ এত বেশি যে সূর্যের তাপে গোটা অঞ্চলটি কাচের মতো জ্বলতে থাকে।

টাইগ্রিস ও সিন্ধুর মাঝামাঝি ইরানের মস্ত মালভূমি। এই অঞ্চলটিতেও অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়—চারদিক ঘিরে রয়েছে উঁচু

উঁচু পর্বতমালা আর মাঝখানের জমি জলের অভাবে মরুভূমির মতো। কিন্তু এসব উঁচু পর্বতমালা থেকে কয়েকটি ঝরনা ও নদী নেমে এসেছে, তার ফলে তৈরি হয়েছে কয়েকটি মরূদ্যান। উদ্ভিদ-বিদদের মতে এখানে বুনো গম ও বার্লি জন্মাত। অ্যাপ্রিকট, পীচ্ বা এ-ধরনের ফলের গাছ তো এখনো আছে। বুনো ভেড়া এখনো পাহাড়ে-পর্বতে চরে বেড়ায়। কাজেই প্রাগৈতিহাসিক কালে মানুষের প্রথম বিপ্লবটি হবার পক্ষে এটি একটি উপযুক্ত জায়গা ছিল।

টাইগ্রিস থেকে সিন্ধু পর্যন্ত গোটা এলাকাটিতে হালে লোকবসতি খুবই কম—প্রতি বর্গমাইলে তুজনের বেশি নয়। কিন্তু ছড়ানো ছিটানো ঢিবিগুলো দেখে বোঝা যায় যে প্রাগৈতিহাসিক কালে এই এলাকায় ঘন বসতি ছিল।

ঢিবিগুলো থেকে যে-সব নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে রঙীন পোড়ামাটির পাত্র। এক-এক অঞ্চলে এক-এক রকম রঙ ও এক-এক ধরনের অলংকরণ। পোড়ামাটির পাত্রের রঙ ও অলংকরণের ভিত্তিতে ঢিবিগুলোকে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

মসুল-এর কাছাকাছি হালে একটি ঢিবি খোঁড়া হয়েছে, তার নাম টেল হাস্থনা। এই ঢিবির সবচেয়ে নিচের স্তর থেকে—অর্থাৎ সময়ের দিক থেকে সবচেয়ে প্রাচীনকালের যে-সব নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে স্থায়ী বসতির সাক্ষ্য নেই। সম্ভবত তাঁবু খাড়া করে একদল মানুষ আস্তানা পেতেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন সাক্ষ্য আছে যা থেকে বোঝা যায় তারা চাষ ও পশুপালন তুই-ই জানত। গোরু জাতীয় পশু ও ভেড়ার হাড় যেমন পাওয়া গিয়েছে তেমনি চাষ করার কোদাল, শস্য পেষাই করার জাঁতা, ইত্যাদি। আর খোদাই-করা অলংকরণযুক্ত পোড়ামাটির পাত্র। কিন্তু একেবারে নিচের স্তরের খানিকটা ওপরেই, অর্থাৎ সময়ের দিক থেকে অল্প পরেই পাওয়া যাচ্ছে স্থায়ী বসতির সাক্ষ্য। ছোট একটু উঠোনকে ঘিরে কয়েকটি মাটির তৈরি কোঠা—তার মধ্যে রান্নার জায়গা, শস্য রাখার

জায়গা এবং আরো নানা বন্দোবস্ত। চকমকি পাথরের দাঁত বসানো কাস্তেও পাওয়া গিয়েছে।

তারপরে পশ্চিম ইরানে কাশান-এর কাছাকাছি টেপ্ সিয়ালক্। এখানেও সবচেয়ে নিচের স্তরে স্থায়ী বসতির নিদর্শন নেই। হাতিয়ারের মধ্যে নাটুফীয় ধরনের কাস্তে আর পাথরের তৈরি কোদালের ফলা। টেল্ হাস্‌্নার মতো এখানেও পরবর্তী স্তরে স্থায়ী বসতির নিদর্শন।

শিকার ও সংগ্রহের যুগের মানুষরা যে-বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিল তারই একেবারে গোড়ার দিকের নিদর্শন এই দুটি ঢিবি।

উত্তর মেসোপটেমিয়ায় টেল্ হালাফ। এখানকার নিদর্শনগুলোর মধ্যে আছে রোদে শুকিয়ে নেওয়া ইটের তৈরি ঘরবাড়ি, পাথরের হাতিয়ার আর টুকরো-টাকরা তামা। পোড়ামাটির পাত্রে মেটে রঙের ওপরে লাল ও কালো অলংকরণ।

দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় আল উবায়েদ। এখানেও স্থায়ী বসতির সাক্ষ্য। তামার ব্যবহার জানা ছিল। চাষ করা হত পাথরের ফলা লাগানো কোদাল দিয়ে। কাদামাটির বা পাথরের তৈরি ঘরবাড়ি।

এমনি আরো অনেকগুলো ঢিবি। টেপ গিয়ান, টেপ হিসার, টেপ গাওরা, ইত্যাদি। আগে বলেছি, ঢিবিগুলোকে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে পোড়ামাটির পাত্রের রঙ ও অলংকরণের ভিত্তিতে। যেমন, টেপ গিয়ান থেকে পাওয়া গিয়েছে মেটে রঙের পাত্র। হালাফ ঢিবির পাত্রেরও একই রঙ। কাজেই ধরে নেওয়া চলে যে এ-দুটি একই কালচারের অঙ্গীভূত। ঠিক এই একই যুক্তিতে টেপ গিয়ানের পঞ্চম স্তরটিকে তুলনা করা চলে টেপ সিয়ালক্-এর তৃতীয় স্তরের সঙ্গে। যাই হোক, এতসব খুঁটিনাটি বিবরণের মধ্যে আমাদের যাবার দরকার নেই। মোট কথাটা হচ্ছে এই যে পাত্রের রঙ ও অলংকরণের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন ঢিবির কর্মতৎপরতার সাক্ষ্যগুলোকে বা কালচারকে কতকগুলো ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

পশ্চিম ভারতের ঢিবিগুলোকেও এই একই পদ্ধতিতে ভাগ করে নেওয়া চলে। মোটামুটি দুটি ভাগ: মেটেরঙের পাত্র আর লাল-রঙের পাত্র। কালচার শব্দটিও ব্যবহার করা চলে। মেটেরঙের পাত্রের কালচার ও লালরঙের পাত্রের কালচার। প্রথম ভাগে তিনটি কেন্দ্র: কোয়েটা (বোলান গিরিপথের ঢিবিগুলোর নিদর্শন থেকে), আমরি-নাল (আমরি ঢিবিটি সিন্ধু প্রদেশে আর নাল ঢিবিটি বেলুচিস্তানের নাল নদীর উপত্যকায়) ও কুল্লি (দক্ষিণ বেলুচিস্তানের একটি ঢিবি)। দ্বিতীয় ভাগে একটি কেন্দ্র: ঝোব্ (উত্তর বেলুচিস্তানের ঝোব্ নদীর উপত্যকার ঢিবিগুলোর নিদর্শন থেকে)।

হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োর নগর-বিপ্লবের পটভূমিটি ঠিক মতো বুঝতে হলে এই ঢিবিগুলো সম্পর্কেও আমাদের কিছুটা ধারণা থাকা দরকার। কিন্তু তার আগে পশ্চিম ভারতবর্ষের অতীতের জলবায়ু সম্পর্কে আলোচনা তুলতে হবে।

আগে বলেছি, খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের কাছাকাছি সময়ে সিন্ধু-উপত্যকায় ও বেলুচিস্তানে ঘন বসতির সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে। মেসোপটেমিয়া ও মিশরের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে মানুষ এমন সব জায়গায় স্থায়ী বসতি গড়ে তুলত যেখানকার জলবায়ু চাষের উপযুক্ত। ধু-ধু মরুভূমির মধ্যে স্থায়ী বসতি সম্ভব নয়। এদিক থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে সিন্ধু-উপত্যকায় ও বেলু-চিস্তানে সে-সময়কার জলবায়ু এখনকার মতো এতটা খরা ছিল না। বিশেষ করে সিন্ধু-উপত্যকায় সে-সময়ে এখনকার চেয়ে অনেক বেশি বৃষ্টি হত ও অনেক বেশি বনজঙ্গল ছিল। এই বক্তব্যের সমর্থনে ঐতিহাসিক দলিল কিছু নেই কিন্তু একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য আছে। হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োতে লক্ষ লক্ষ পোড়ামাটির ইট পাওয়া গিয়েছে। তার মানে ইট পোড়াবার কাঠ নাগালের মধ্যেই ছিল। তার মানে গোটা অঞ্চলটিতে ঘন বনজঙ্গলের অভাব ছিল না। তার মানেই বৃষ্টিপাত। তাছাড়া ঘরবাড়ি তোলার জন্যে যে পোড়ামাটির ইট ব্যবহার করতে হয়েছিল এ থেকেও মনে হতে পারে যে বৃষ্টি

হয়তো একটু বেশিই হত—নইলে রোদে শুকিয়ে নেওয়া ইট দিয়েই কাজ চলে। আবহবিদদের মতে, মৌসুমী বায়ুর প্রবাহ যদি আর সামান্য একটু পশ্চিম দিকে সরে আসে তাহলেই সিন্ধু প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের জলবায়ু অন্যরকম হয়ে যেতে পারে।

বেলুচিস্তানের সে-সময়কার জলবায়ু কি-রকম ছিল সে-সম্পর্কে সরাসরি সাক্ষ্য আরো কম। কিন্তু হালের বেলুচিস্তানের দিকে তাকালে আমরা দেখি, জনসংখ্যার হিসেব হচ্ছে প্রতি বর্গমাইলে মাত্র দু'জন। তাও স্থায়ী বাসিন্দা নয়—যাযাবর। বছরের মধ্যে কয়েকটি মাস মাত্র তারা দেশে কাটায়—শীতকাল এলেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে জীবিকার ধান্দায় বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু আগে বলেছি, বেলুচিস্তানে প্রাচীন বসতির নিদর্শন হিসেবে অনেকগুলো ঢিবি পাওয়া গিয়েছে। ঢিবি তখনই তৈরি হতে পারে যখন একই জায়গায় একদল মানুষ পুরুষানুক্রমে বসবাস করে। বেলুচিস্তানের ঢিবিগুলো চল্লিশ ফুট থেকে একশো ফুট পর্যন্ত উঁচু। তার মানে বহুকাল ধরে এই একই জায়গায় বসতির পর বসতি গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই ধরে নিতে পারি যে জমি থেকে ভালো ফসল পাওয়া যেত—নইলে এতগুলো লোকের খাদ্য-সংস্থান হত কি করে? তার মানে জলবায়ু নিশ্চয়ই চাষের সহায়ক ছিল।

বেলুচিস্তানে প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান চালাতে গিয়ে এক-ধরনের পাথরের তৈরি বাঁধের (স্থানীয় ভাষার 'গবরবন্দ') সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যা থেকে মনে হয় জলসেচের একটা ব্যবস্থাও সে-সময়ে ছিল। বাঁধগুলো ঠিক কোন সময়ে তৈরি তার কোনো হদিশ পাওয়া যায় নি। কিন্তু এ থেকে দুটি অনুমান করা চলে। এক, সে-সময়ে নিশ্চয়ই বৃষ্টিপাত খুব বেশি ছিল। দুই, বাঁধ তৈরি করার জন্যে অনেক মানুষকে একজোট হতে হয়েছিল। মাশ্‌কাই নদীর উপত্যকায়, লাকোরিয়ান গিরিপথে যে-দুটি বাঁধের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা খুবই মজবুত। জলের পরিমাণ খুব বেশি না হলে এত মজবুত করে বাঁধ তৈরি করার কোনো দরকার ছিল না।

সিন্ধুনদ ও কির্থার পর্বতমালার মধ্যে একটি হ্রদ আছে যার নাম মানসেরা হ্রদ। লম্বায় প্রায় আট-দশ মাইল, চওড়াতেও তাই। কিন্তু সিন্ধুনদে যখন বন্যা আসে তখন এই হ্রদটি দুশো বর্গমাইল জায়গা জুড়ে প্রায় একটা সাগরের মতো হয়ে ওঠে—যদিও জলের গভীরতা কোথাও দশ ফুটের বেশি নয়। এই হ্রদের ধারে প্রাগৈতিহাসিক বসতির অনেক সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে। বেলুচিস্তান থেকে সিন্ধু-উপত্যকায় যাতায়াতের পথও এই হ্রদের ধার দিয়েই। প্রাগৈতি-হাসিক কালেও এই পথেই মাশ্‌কাই ও নাল উপত্যকার সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, প্রাগৈতিহাসিক কালে বেলুচিস্তানের আবহাওয়া সবদিক থেকেই গ্রাম-বসতি গড়ে ওঠার পক্ষে উপযুক্ত ছিল।

এবারে বেলুচিস্তানের ঢিবি সম্পর্কে আলোচনা তোলা যেতে পারে।

আমরা যাকে কোয়েটা কালচার বলেছি তার মধ্যে আছে কোয়েটার কাছাকাছি পাঁচটি ঢিবি। সবচেয়ে বড়ো ঢিবিটির পরিধি ৬০০ ফুট, উচ্চতা ৪৫ থেকে ৫০ ফুট। আয়তন দেখে বোঝা যায়, বসতিটি ছিল ছোটখাটো একটি গ্রাম। যে-সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে তা থেকে বলা যায়, ঘরবাড়ি তৈরি হত কাদামাটি দিয়ে বা রোদে শুকিয়ে নেওয়া ইট দিয়ে। পোড়ামাটির পাত্র যা পাওয়া গিয়েছে তা সবই মেটে রঙের। রঙের কাজ খুবই সূক্ষ্ম এবং এমন একটি বিশেষত্ব মণ্ডিত যা টাইগ্রিস থেকে সিন্ধু পর্যন্ত গোটা এলাকাটির মধ্যে আর কোথাও পাওয়া যায় নি। বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয়, পাত্রের অলংকরণে কোনো জন্তুজানোয়ার বা গাছপালার ছবি নেই।

আমরি-নাল কালচারের আমরি জায়গাটি সিন্ধুতে, নাল বেলুচি-স্তানে। আর এই একই কালচারের মাঝামাঝি অবস্থার সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে দক্ষিণ বেলুচিস্তানের অপর একটি জায়গা নান্দারা থেকে।

ঢিবিগুলো দশ থেকে চল্লিশ ফুট পর্যন্ত উঁচু। নানান জায়গার ঢিবির হিসেব থেকে মোটামুটি ধারণা করা হয়েছে যে বসতির আয়তন ছিল দু' একরের কম। ঘরবাড়ি তোলার সময়ে দেওয়ালের নিচের দিকের খানিকটা অংশ তোলা হত পাথর দিয়ে, বাকিটা কাদামাটি দিয়ে। অবশ্য কোথাও কোথাও রোদে শুকিয়ে নেওয়া ইটের দেওয়ালও পাওয়া গিয়েছে। আবার আমরির কোনো কোনো ঢিবিতে বসতির সাক্ষ্য পাওয়া সত্ত্বেও ঘরবাড়ির চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় নি। সম্ভবত এখানকার ঘরবাড়ি পুরোপুরি কাদামাটি দিয়ে তৈরি হয়েছিল।

আমরি, নান্দারা ও নাল অঞ্চলের ঢিবিগুলো থেকে প্রত্নবিদরা আরো নানান খুঁটিনাটি তথ্য যোগাড় করেছেন। কি ধরনের গ্রাম তৈরি হত, কি ধরনের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি ও কবরখানা ইত্যাদি নানা তথ্য। তবে আমাদের আলোচনার পক্ষে এতসব খুঁটিনাটি বিবরণের কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা মোটামুটি ধরে নিতে পারি, খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের কাছাকাছি সময়ে সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এমন একদল লোকের স্থায়ী বসতি ছিল যাদের জীবনধারণের উপায় ছিল কৃষি আর যারা বিশেষ ধরনের পোড়ামাটির পাত্র তৈরি করত। হাতিয়ার বলতে প্রধানত পাথরের হাতিয়ার, তবে অল্পবিস্তর তামার ব্যবহারও জানা ছিল। এক-একটি বসতির আয়তন খুব বড়ো ছিল না—ঘরবাড়ি তৈরি করা হত পাথর বা কাদামাটি দিয়ে। একটি লক্ষ করার মতো ঘটনা এই যে পোড়ামাটির ইট কোনো জায়গাতেই ব্যবহার করা হয় নি। সবচেয়ে বড়ো কথা, এই বসতিগুলো ছিল নিতান্তই গ্রাম, আর আয়তনে এত ছোট যে কোনো সময়েই এই গ্রামগুলোর নগরে রূপান্তরিত হবার মতো অবস্থা তৈরি হওয়া সম্ভব ছিল না।

এই একই কথা কুল্লি কালচার সম্পর্কেও। দক্ষিণ বেলুচিস্তানে বামপুর নদী ও মাকরানের উপত্যকায় কয়েকটি ঢিবির নিদর্শনকে এই নাম দেওয়া হয়েছে। একই ধরনের ছোট ছোট গ্রাম-বসতি। ঘর-

বাড়ি বা রাস্তাঘাট বা কবরখানাও প্রায় একই ধরনের কিন্তু তফাত রয়েছে পোড়ামাটির পাত্রের রঙ ও অলংকরণে।

একটি ঢিবি মাশ্‌কাই নদীর উপত্যকায়—নাম মেহি। এই ঢিবিটি ৫০ ফুট উঁচু এবং প্রায় ২,৫০,০০০ বর্গগজ আয়তন জুড়ে আছে। তার মানে বসতিটি নিতান্ত ছোট নয়। তবুও এই বসতিটিও কোনোকালে নগর হয়ে উঠতে পারে নি। আরেকটি ঢিবি কেজ্‌ উপত্যকায়—নাম শাহীটুম্প্‌। এখানকার বসতি আয়তনে আরো বড়ো কিন্তু মোটামুটি গ্রামই থেকে গিয়েছে। কিন্তু তাই বলে কোনোটাই পুরোপুরি চাষী-গ্রাম নয়, কুমোর-কামার-ছুতোর নিশ্চয়ই ছিল, অন্যান্য বিশেষ ধরনের কারিগর থাকাও অসম্ভব নয়। তাছাড়া পুবে হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োর সঙ্গে এবং পশ্চিমে মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে রীতিমতো ব্যবসাগত যোগাযোগ ছিল। ফলে ধাতু ও ল্যাপিস ল্যাজিউলাই এ অঞ্চলে অজানা ছিল না। কুল্লি থেকে একটি তামার আরশি ও একটি কুড়ুল পাওয়া গিয়েছে, এবং আরো কিছু ছোটখাটো তামার জিনিস। কিন্তু পাথরের কুড়ুল বা চকমকি পাথরের তৈরি তীরের ফলক একেবারেই পাওয়া যায় নি। প্রত্ন-বিদদের ধারণা, এ অঞ্চলে পাথর ব্যবহার হত শুধু সাধারণ গোছের ফলা তৈরি করার জন্যে, তাছাড়া তামার হাতিয়ারেরই চল ছিল। এখান থেকে রপ্তানী করা হত নর্তকীর মূর্তি (হরপ্পায় যে-ধরনের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে) আর খোদাই করা পাথরের পাত্র।

পোড়ামাটির পাত্রেও পশ্চিমের মেসোপটেমিয়ার ও পুবের সিন্ধু উপত্যকার ছাপ। পাত্র তৈরি হত কুমোরের চাকায়, তারপরে এমন-ভাবে পোড়ানো হত যেন বিশেষ এক ধরনের মেটে রঙ ফুটে ওঠে। পাত্রের গায়ে আঁকা হত জন্তুজানোয়ারের ছবি ও ভূদৃশ্য। এসব ছবি আঁকার ধরনের মধ্যে মেসোপটেমিয়া ও হরপ্পার প্রভাব খুবই স্পষ্ট।

কুল্লি কালচারের যে-সব নিদর্শন সবচেয়ে বেশি কৌতূহল জাগায় তা হচ্ছে পোড়ামাটির তৈরি অজস্র খুদে খুদে মূর্তি। নারী-মূর্তি বা জন্তুজানোয়ারের মূর্তি। এত অজস্র খুদে-মূর্তি কেন তৈরি করা

হয়েছিল সে-সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় নি। হয়তো এগুলো নিতান্তই খেলনা কিংবা এমনও হতে পারে নারী-মূর্তিগুলো পুজোর উদ্দেশ্যে তৈরি। হিন্দুদের মধ্যে এখনো এ-ধরনের খুদে-মূর্তি পুজোর চল আছে। এক-একটি মূর্তি তিন-চার ইঞ্চি লম্বা।
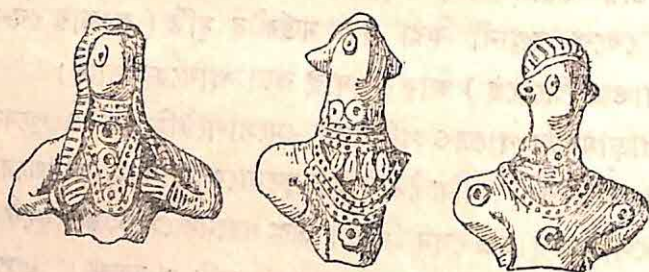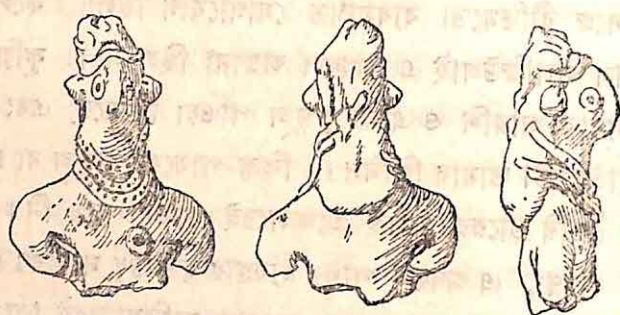
কুল্লির নারী-মূর্তি

জন্তুজানোয়ারের খুদে-মূর্তির মধ্যে একটি ষাঁড়ের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে যার পায়ে চাকা লাগানো। একটি পাখি পাওয়া গিয়েছে যার ল্যাজের ফুটো দিয়ে ফুঁ দিলে শিসের মতো শব্দ বেরিয়ে আসে। হরপ্পাতেও এ-ধরনের শিস্‌-দেওয়া পাখির নিদর্শন আছে।

নারী-মূর্তিগুলোর অবয়ব মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত। হাতদুটো কোমরের কাছে বিশেষ ভঙ্গিতে রাখা। মুখমণ্ডলকে সত্যিকারের মানুষের মুখের আকৃতি দেবার কোনো চেষ্টা নেই—একটা উদ্ভট আভাস মাত্র। কিন্তু মুখমণ্ডল যেমনই হোক, কেশবিন্যাস ও অলংকার সম্পর্কে মনোযোগের অভাব হয় নি। কারও বেণী, কারও খোঁপা, কারও বা চুড়ো। আর কত রকমের যে ভঙ্গিমা তার মধ্যে! আর তারপর আছে গয়না। কানে, গলায়, হাতে—কোনো জায়গাতেই গয়নার অভাব নেই। গলায় কত রকমের যে হার আর লকেট তা দেখলে আজকালকার মেয়েরাও অবাক হবে। হাতের চুড়ি সম্পর্কে বিশেষভাবে একটা বলার কথা আছে। কবজির অংশে দু'হাতেই চুড়ি আছে। কিন্তু বাঁ হাতের বেলায় কনুইয়ের ওপরের অংশটিও বাদ পড়ে নি। এ থেকে অনুমান করা চলে, মেয়েরা বোধ হয় শাড়ি পরত, বা শাড়ি-ধরনের কোনো পোশাক, যাতে বাঁ হাতটি আদুড় থেকে যেত।

চাকা-লাগানো জন্তুজানোয়ারের মূর্তির কথা বলেছি। কিন্তু মেহি ও শাহীটুম্প্ থেকে পোড়ামাটির তৈরি চাকা-লাগানো গাড়িও পাওয়া গিয়েছে। প্রত্নবিদদের ধারণা, চাকা-লাগানো গাড়ি এ-অঞ্চলে এসেছিল হরপ্পা থেকে।

কুল্লি কালচারে হরপ্পার প্রভাব আরো বিশেষভাবে পাওয়া যায় এ-অঞ্চল থেকে পাওয়া নানান ধরনের পাত্রের মধ্যে। শুধু হরপ্পার প্রভাব নয়, মেসোপটেমিয়ারও। যেমন, মেহি থেকে কয়েক ধরনের নরম পাথরের পাত্র পাওয়া গিয়েছে যার মধ্যে হরপ্পার ও মেসোপটেমিয়ার ছাপ খুবই স্পষ্ট। প্রত্নবিদরা এ-সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য যোগাড় করেছেন।

এ-প্রসঙ্গে মেহির অপর একটি নিদর্শন সম্পর্কে বিশেষভাবে বলা দরকার। নিদর্শনটি হচ্ছে একটি ব্রোঞ্জের আরশি, পাওয়া গিয়েছে মেহির কবরখানা থেকে। আরশিটির বিশেষত্ব এই যে এর হাতলটি তৈরি হয়েছে মুণ্ডহীন নারী-মূর্তির আকারে। আরশিতে যখন কোনো

একটি মুখের ছায়া পড়ে তখন সেই ছায়াটিকে এই নারী-মূর্তির মুখ বলে মনে হয়। এ-ধরনের হাতলওলা আরশি পশ্চিম এশিয়ার অন্য কোনো জায়গা থেকে পাওয়া যায় নি (মিশরে এ-ধরনের হাতলওলা আরশির চল হয়েছিল অষ্টাদশ রাজবংশের রাজত্বকালে, খ্রীষ্টপূর্ব ১৫৭০ সালের কাছাকাছি সময়ে)। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এই হাতলওলা আরশিটি বেলুচিস্তানের ধাতু-কারিগদের একটি অনন্য-সাধারণ কৃতিত্ব।

তাহলে মোট কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই : আমরি-নাল-এ আমরা যে-ধরনের বসতির সাক্ষাৎ পেয়েছি কুল্লিতেও তার চেয়ে আলাদা ধরনের কিছু নয়। এমনকি মেসোপটেমিয়া ও ইরানের চাষী-গ্রামের সঙ্গেও এখানকার বসতির কোনো অমিল নেই। তবে কুল্লি কালচারের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে এখানে হরপ্পা কালচারের প্রভাব খুবই স্পষ্ট। এমন সাক্ষ্য প্রচুর আছে যা থেকে বোঝা যায় কুল্লির সঙ্গে হরপ্পার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। আবার এমন সাক্ষ্যও প্রচুর আছে যা থেকে বোঝা যায় কুল্লির সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক যোগাযোগও কম ঘনিষ্ঠ ছিল না। প্রত্নবিদদের ধারণা, মেসোপটে-মিয়ার সঙ্গে হরপ্পার যোগাযোগও কুল্লির বাণিজ্যের মাধ্যমেই—নগর-বিপ্লবের এই দুটি প্রাচীন কেন্দ্রের মধ্যে বহুকাল পর্যন্ত সরাসরি কোনো যোগাযোগ ছিল না।

এবার আমাদের চোখ ফেরাতে হবে উত্তর বেলুচিস্তানের দিকে, বিশেষ করে ঝোব নদীর উপত্যকা-অঞ্চলে। যদিও ঢিবির সংখ্যা এখানে খুব বেশি নয় (সিন্ধু বা পশ্চিম বেলুচিস্তানের তুলনায়), তবুও এখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে এমন কিছু বিশেষত্ব আছে যা আলাদা একটি কালচার হিসেবে গণ্য হতে পারে। আমরা বলেছি ঝোব কালচার।

প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে এ-অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কাজ এখনো অনেক বাকি। একটি বাদে আর কোনো ঢিবি পুরোপুরি খোঁড়া হয় নি। তবে গোটা অঞ্চলটি সম্পর্কে মোটামুটি

ধারণা করার জন্যে একটি ঢিবিই যথেষ্ট। এই বিশেষ ঢিবিটির নাম রানা ঘুণ্ডাই, ৪০ ফুট উঁচু।

রানা ঘুণ্ডাইয়ের একেবারে নিচের স্তর থেকে পাওয়া গিয়েছে হাতে-তৈরি পোড়ামাটির পাত্র (রঙ করা নয়) এবং নানা ধরনের জন্তুজানোয়ারের হাড় (যেমন, ষাঁড়, ভেড়া, গাধা, এমনকি ঘোড়া পর্যন্ত)। এই স্তরে স্থায়ী বসতির কোনো সাক্ষ্য নেই। ১৪ ফুট উঁচু এই স্তরটিতে মাঝে মাঝে শুধু ছাইয়ের গাদা। প্রত্নবিদদের ধারণা, একেবারে গোড়ার যুগে একদল ঘোড়সওয়ার যাযাবর অস্থায়ী কুটির বা তাঁবু খাড়া করে মাঝে মাঝে এখানে আস্তানা পাতত।

কিন্তু দ্বিতীয় স্তরেই স্থায়ী বসতির চিহ্ন, যে-সময়ে কুমোরের চাকার সাহায্যে পোড়ামাটির পাত্র তৈরি করা হয়েছে। পাত্রের গায়ে অতি চমৎকার সব ছবি আঁকা। যেমন, মেটে বা লালচে পটভূমিতে কালো রঙে আঁকা ষাঁড়ের ছবি।

তবে এই দ্বিতীয় স্তরটি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শেষ। একবারের বেশি ঘরবাড়ি তুলতে হয় নি। মনে হয়, তারপরে কিছুকালের জন্যে এখানে কোনো বসতি ছিল না।

রানা ঘুণ্ডাইয়ের তৃতীয় স্তরে তিনটি পর্যায়ের সাক্ষ্য রয়েছে—পর পর তিনবার তোলা ঘরবাড়ি। পাত্রের গায়ে একই ধরনের ছবি, তবে ছবিতে দ্বিতীয় আরেকটি রঙ এসেছে। লাল। মেটে বা লালচে পটভূমিতে লাল রঙের ষাঁড় বা অন্য কিছু।

রানা ঘুণ্ডাইয়ের আশেপাশে আরো যে-সব ঢিবি রয়েছে (যেমন স্থুর জঙ্গল, পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই, মোগল ঘুণ্ডাই, ইত্যাদি) সেখানে একেই স্তরের নিদর্শন হিসেবে পাওয়া গিয়েছে কতকগুলো খুদে-মূর্তি। অনেকটা দক্ষিণ বেলুচিস্তানের কুল্লি কালচারের মতো।

জন্তুজানোয়ারের মূর্তির মধ্যে একটি মূর্তি পাওয়া গিয়েছে যেটিকে মনে হয় ঘোড়া। নারী-মূর্তিগুলো ইঞ্চি ছয়েক লম্বা, অবয়ব তেমনি কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত, খুব খুঁটিয়ে আঁকা না হলেও গলায় হারের আভাস—কিন্তু কুল্লির সঙ্গে তফাতটা হচ্ছে মুখমণ্ডলে। চওড়া চকচকে

কপাল, ছুটি চোখের জায়গায় ছুটি কালো গর্ত, চাপা ঠোঁট—সব মিলিয়ে রানা ঘুণ্ডাইয়ের নারী-মূর্তি বড়ো ভয়ংকর। এগুলো খেলনা কিছুতেই নয়—দেবী-পূজা বা বিশেষ কোনো আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে এদের সম্পর্ক আছে।

রানা ঘুণ্ডাইয়ের নারী-মূর্তি

ঘরবাড়ি তোলা হয়েছিল পাথরের ভিতের ওপরে কাদামাটির ইট দিয়ে। প্রথম স্তরে যে-ধরনের চকমকি পাথরের ফলা পাওয়া গিয়েছিল, তৃতীয় স্তরেও তা আছে। চকমকি পাথরের তৈরি তীরের ফলকও পাওয়া গিয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সাক্ষ্য হিসেবে পাওয়া গিয়েছে তামা, ল্যাপিস ল্যাজিউলাই, ইত্যাদি। প্রত্নবিদদের ধারণা রানা ঘুণ্ডাইয়ের সঙ্গে হরপ্পার যোগাযোগ এই তৃতীয় স্তরটিতে এসে, —কাজেই রানা ঘুণ্ডাইয়ের প্রথম স্তর ছুটি প্রাক্-হরপ্পা কালের।

টাইগ্রিস থেকে সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কাজ খুব বেশি এগোয় নি। এমনকি যে-কটি ঢিবির উল্লেখ করা হল সেখানেও খোঁড়াখুঁড়ির কাজ অনেক বাকি। তবে যতোদূর

জানা গিয়েছে তাতে মনে হয়, এই এলাকায় অজস্র গ্রাম-বসতি থাকা সত্ত্বেও সুমের বা হরপ্পা বা মোহেন-জো-দড়োর মতো বড়ো নগর একটিও ছিল না। অর্থাৎ এই বসতিগুলো ছিল কৃষিনির্ভর গ্রাম। হাতিয়ার ব্যবহার করা হত প্রধানত পাথরের, তবে সুমের ও হরপ্পার সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে ওঠার পরে তামার হাতিয়ারেরও চল হয়েছিল। গ্রাম বলতে পুরোপুরি চাষী-গ্রাম নয়, কুমোর ও কামাররাও ছিল। পোড়ামাটির পাত্র তৈরি হত কুমোরের চাকায় আর তাতে নিজস্ব ধরনে রঙ করা হত। লক্ষ করার বিষয়, এই গ্রামগুলো যদিও পুরোপুরি নগর হয়ে উঠতে পারে নি কিন্তু সুমের ও হরপ্পার সঙ্গে যোগাযোগের ফলে হয়ে উঠেছিল প্রায়-নগর। অর্থাৎ, কিছু কিছু শিল্প ও বাণিজ্য প্রত্যেকটি গ্রামেই গড়ে উঠেছিল আর সেজন্যে বেশ কিছু লোককে সরাসরি খাদ্য-উৎপাদনের কাজ থেকে রেহাই দিতে হয়েছিল। এ-ব্যাপারটি তখনই সম্ভব হতে পারে যখন কিছু শস্য উদ্বৃত্ত হয়—কিন্তু এই উদ্বৃত্ত শস্যের পরিমাণ কোথাও এত বেশি হয় নি যে গ্রামগুলো নগর হতে পারত।

এবারে আমরা হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়ো সম্পর্কে আলোচনা তুলতে পারি। প্রাগৈতিহাসিক কালে এই অঞ্চলটিও ছিল মেসোপটেমিয়ার মতো 'দুই নদীর মধ্যেকার দেশ'। পশ্চিমে পঞ্চনদ ও সিন্ধু, আর পুবে ছিল সরস্বতী নামে একটি নদী। চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল মেসোপটেমিয়ার চেয়ে অনেক বেশি। পাঞ্জাবে অবশ্য হাল আমলেও চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কম নয়, ফলনও খুব বেশি; কিন্তু সিন্ধু প্রদেশটি প্রায় মরুভূমি হয়ে উঠেছে, সেখানে কৃত্রিম জলসেচের ব্যবস্থার বাইরে চাষের কাজ চলে না। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে সে-সময়ে এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ছিল এখনকার চেয়ে অনেক বেশি এবং সম্ভবত মৌসুমী বায়ুর প্রবাহ খানিকটা পুবদিকে সরে যাবার ফলেই এই অঞ্চলের জলবায়ু এতবেশি খরা হয়ে উঠেছে।

এই বক্তব্যের সমর্থনে কতকগুলো সাক্ষ্যও আছে। প্রথম সাক্ষ্য

জন্তুজানোয়ারের। এই অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক কালের যে-সমস্ত জন্তুজানোয়ারের ছবি ও মূর্তি পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে আছে গণ্ডার, হাতি, বাঘ ইত্যাদি। মাটি খুঁড়ে এসব জন্তুজানোয়ারের (বাঘ বাদে) হাড়ও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু হাল আমলে এদের (বাঘ বাদে) আর এ-অঞ্চলে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, জলবায়ু বদলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জন্তুজানোয়ারের জগৎটিও বদলে গেছে।

দ্বিতীয় সাক্ষ্য পোড়ামাটির ইট। এ বিষয়ে আগেই আলোচনা করেছি।

তৃতীয় সাক্ষ্য কৃষিজাত ফলনের প্রাচুর্য। হালের মোহেন-জো-দড়োতে গ্রীষ্মকালে উত্তাপ ওঠে একশো-কুড়ি ডিগ্রি ফারেনহাইটে, আর শীতকালে তুষার জমে। বৃষ্টিপাত বছরে ছ'ইঞ্চিরও কম। এ-ধরনের আবহাওয়ায় প্রচুর ফলন কিছুতেই সম্ভব নয়।

আগে বলেছি, মোহেন-জো-দড়ো থেকে হরপ্পা প্রায় চারশো মাইল দূরে। গোটা অঞ্চলটি আয়তনে মিশরের দু'গুণ, সুমের ও আক্কাদের চার-গুণ। হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়ো ছাড়াও এ অঞ্চলে আরো প্রায় চল্লিশটি বসতির সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এত বিরাট এলাকা জুড়ে এতগুলো বসতি গড়ে ওঠা সত্ত্বেও জীবনযাত্রার পদ্ধতি কিন্তু সব জায়গায় একই রকম। বাস্তব নিদর্শনে কোথাও কোনো অমিল নেই। একই ধরনের পোড়ামাটির পাত্র, একই মাপের পোড়ামাটির ইট। সীলমোহরে একই ধরনের ছবি ও একই ধরনের লেখা। ওজন করার ব্যবস্থাও একই রকম। সুতরাং গোটা অঞ্চলটিকে একটিমাত্র রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। পশ্চিম এশিয়ার বৃহত্তম রাজ্য। হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়ো এই রাজ্যের দুটি রাজধানী।

রাজ্যের উত্তরাংশে হরপ্পা ছাড়াও আরো চোদ্দটি বসতির নিদর্শন আছে। দক্ষিণাংশে মোহেন-জো-দড়ো ছাড়াও আরো প্রায় সতরোটির। এই বসতিগুলোর আয়তন ষাট হাজার বর্গফুট থেকে সাত লক্ষ বর্গফুট পর্যন্ত। রাজধানীর সঙ্গে মফস্বল শহরের যে-

সম্পর্ক—তেমনি সম্পর্ক হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োর সঙ্গে এই বসতিগুলোর।

আগে বলেছি, হরপ্পা কালচারের যেখানে যা কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা সবই একধরনের। কোনো রকম অদল-বদল বা অমিলের চিহ্নমাত্র নেই। এই মিল শুধু ইট বা পাত্র তৈরি করার বেলাতেই নয়, সমস্ত ব্যাপারেই। শুধু এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য-অঞ্চলের নয়, এক-সময়ের সঙ্গে অন্য-সময়েরও।

হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োর মাটি খুঁড়ে অনেকগুলো স্তর পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু একেবারে গোড়ার দিকের স্তর ও একেবারে শেষের দিকের স্তরের মধ্যে ক্রম-পরিণতির কোনো ছাপ নেই। একেবারে গোড়ার স্তরটি থেকেই পুরোপুরি পরিণত একটি কালচারের নিদর্শন। মোহেন-জো-দড়ো নগরটিকে অন্তত ন-বার নতুন করে গড়ে তুলতে হয়েছিল কিন্তু প্রত্যেকবারেই নগর-পরিকল্পনা হুবহু এক ধরনের। এমনকি সদর-রাস্তার দিকে কোনো বাড়ির জানলা না থাকার রেওয়াজটা পর্যন্ত একই ভাবে চলে এসেছে। মোহেন-জো-দড়োর ধ্বংসস্তূপে মাঝে মাঝে বন্যার ধ্বংসলীলার সাক্ষ্য আছে কিন্তু প্রত্যেকবারের ধ্বংসলীলার পরে অবিকল আগের মতো করেই নগরটি গড়ে তোলা হয়েছিল। অবিকল আগের মতো করেই নগরবাসীরা জীবন কাটিয়েছিল। সুমের ও আক্কাদের সঙ্গে হরপ্পার বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও সুমের ও আক্কাদের কোনো আবিষ্কার বা হাতিয়ার তৈরির কোনো নতুন ধরন হরপ্পায় চালু হয় নি। প্রায় সাতশো বছর স্থায়ী হরপ্পা কালচারে বরাবর একই ধরনের হাতিয়ারের নিদর্শন। রক্ষণশীলতার নিদর্শন হিসেবে হরপ্পা কালচারকে প্রাগৈতিহাসিক কালের একটি অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বলা চলে।

হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে কোথাও কোনো তারতম্য নেই বলে এই দুটি নগরের পারস্পরিক সম্পর্কটি সঠিকভাবে বোঝা যায় না। মোহেন-জো-দড়োর মাটি

খুঁড়ে ন-টি স্তরের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, আরো নিচের স্তরগুলো জলের তলায় রয়েছে বলে এখনো উদ্ধার করা যায় নি। হরপ্পায় পাওয়া গিয়েছে ছ-টি স্তর—কিন্তু তবুও বলা সম্ভব নয় এই দুটি নগর সমসাময়িক না একটির পরে আরেকটি। একটির পরে আরেকটি হলে ধরে নিতে হয় যে রাজ্যের রাজধানী উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চলে (অর্থাৎ হরপ্পা থেকে মোহেন-জো-দড়োয়) কিংবা দক্ষিণাঞ্চল থেকে উত্তরাঞ্চলে (অর্থাৎ মোহেন-জো-দড়ো থেকে হরপ্পায়) সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু সমস্ত দিক বিবেচনা করার পরে প্রত্নবিদদের ধারণা হয়েছে যে এই রাজ্যটির শাসনকার্য দুটি রাজধানী থেকে চালানো হত। হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়ো। বা বলা যেতে পারে উত্তর বিভাগ ও দক্ষিণ বিভাগ। একই শাসনব্যবস্থার দুটি অঙ্গ, যা কয়েক-শো বছর ধরে একটানা কায়েম ছিল। মোহেন-জো-দড়ো নগরটি অন্তত ন-বার নতুন করে গড়তে হয়েছিল কিন্তু রাস্তাঘাট ও বাড়িঘরের সীমানা বরাবর একই রকম থেকেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শাসকগোষ্ঠী হয়তো পালটিয়েছিল কিন্তু শাসন-ব্যবস্থাটি পালটায় নি।

এ থেকে আরেকটি অনুমান করা চলে। কয়েক-শো বছরের অনড় অব্যয় একটি শাসনব্যবস্থা, যেখানে রোজকার জীবনের অত্যন্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারেও কোনো পরিবর্তন আসে নি—তার ভিত্তিভূমি কী হতে পারে? অস্ত্রের জোর না হয়ে ধর্মবিশ্বাস হওয়াটাই স্বাভাবিক। সম্ভবত মন্দিরের পুরোহিত-সম্প্রদায় রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা চালনা করত এবং উদ্বৃত্ত শস্য মন্দিরের ভাণ্ডারে মজুদ হত।

তবে পুরোহিতই হোক আর রাজাই হোক—শাসনকর্তার আবাসের নিদর্শনটি দুই নগরেই আছে। মন্দির কিংবা রাজপ্রাসাদ। তবে ব্যবস্থা দেখে দুর্গপ্রাকার বলে মনে হয়। নগরের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে এই দুর্গপ্রাকারটি। প্রায় ৪০০ গজ লম্বা ও ২০০ গজ চওড়া। ত্রিশ ফুট উঁচু একটি চাতাল, চারদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, তার ওপরে

রয়েছে কয়েকটি বিশেষ ধরনের দালান—এই হচ্ছে দুর্গপ্রাকারের মোটামুটি চেহারা। মস্ত একটি শস্যভাণ্ডারও রয়েছে সঙ্গে। তবে এই দুর্গপ্রাকারটি মন্দির না রাজপ্রাসাদ তা এখনো জানা যায় নি। হরপ্পায় এই দুর্গপ্রাকারের ওপরকার দালানের বিশেষ কোনো চিহ্ন নেই। আর মোহেন-জো-দড়োতে দুর্গপ্রাকারের ঢিবির ওপরে পরবর্তী কালে (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ কি পঞ্চম শতকে) তৈরি হয়েছে একটি বৌদ্ধস্তূপ; এটি না ভাঙলে ঢিবি খোঁড়া সম্ভব নয়। প্রত্নবিদদের ধারণা, এই ঢিবিটি খুঁড়তে পারলে হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়ো সম্পর্কে অনেক বিষয় জানা যাবে।

দুর্গপ্রাকারের নিচেই নগরের রাস্তা ও ঘরবাড়ি এবং শ্রমজীবীদের থাকার জায়গা। হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োর রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ি সম্পর্কে একটু পরেই আমরা আলোচনা তুলব। তার আগে দেখা যাক কৃষি সম্পর্কে কি কি খবর পাওয়া যাচ্ছে।

আমরা জানি বিপুল পরিমাণে উদ্বৃত্ত শস্যভাণ্ডার মজুদ হবার পরেই হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োর মতো নগর গড়ে উঠতে পারে। আর শুধু তো এই দুটি নগর নয়, আশেপাশে অনেকগুলো আধা-শহরও ছিল। এ-অবস্থায় উদ্বৃত্ত শস্যভাণ্ডারের ওপরে নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম হবার কথা নয়। তার মানে, আমরা ধরে নিতে পারি যে হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়ো নগরদুটিকে কেন্দ্র করে বিরাট একটি এলাকায় চাষের কাজ চলত। তবে কি-ভাবে চাষ হত আর কি-ধরনের কৃত্রিম জলসেচের ব্যবস্থা ছিল সে-সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোনো নিদর্শন নেই।

যে-সব শস্যের চাষ হত তার মধ্যে ছিল গম, বার্লি, তিল, মটর, ইত্যাদি। প্রাগৈতিহাসিক কালে ধানের চাষ প্রথম কোথায় শুরু হয়েছিল তা এখনো নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি, তবে খুব সম্ভবত ভারতবর্ষেই। চীনে ধানের চাষ শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ সালের কাছাকাছি সময়ে; তা ভারতবর্ষের কাছ থেকেই শেখা।

তবে হরপ্পা অন্য সকলের ওপরে টেক্কা দিয়েছিল তুলোর চাষে।

যতোদূর জানা গিয়েছে, তুলোর চাষ হরপ্পাতেই প্রথম। হরপ্পার মাটি খুঁড়ে সত্যিকারের সুতীর কাপড়ের একটি টুকরো পাওয়া গিয়েছে। তা থেকে জানা গিয়েছে যে হরপ্পায় যে-জাতের তুলোর চাষ হত তা বুনো নয়; আজকাল যে-জাতের তুলোর চাষ হয় সেই জাতের। কাজেই এমনটি হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে হরপ্পা থেকে প্রচুর পরিমাণে সুতীর কাপড় রপ্তানী হত। হরপ্পার বাণিজ্যের একটা বড়ো অংশ জুড়ে ছিল সুতীর কাপড়। অন্তত মেসোপটেমিয়ায় যে হরপ্পার সুতীর কাপড় প্রচুর পরিমাণে গিয়েছিল তার একটি প্রমাণ এই যে মেসোপটেমিয়ায় কাপড়কে বলা হত 'সিন্ধু'।

চাষের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল পশুপালন। গৃহপালিত পশু বলতে প্রধানত ছিল ষাঁড়, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও শুয়োর। কাশ্মীরে যে-জাতের ছাগলের লোম থেকে কাশ্মীরী শাল তৈরি হয়, হরপ্পার ছাগলও সেই জাতের। কাজেই, অনুমান করা চলে, হরপ্পাতেও হয়তো গরম কাপড় তৈরি করার জন্যে ছাগলের লোম কাজে লাগানো হত।

অন্যান্য যে-সব গৃহপালিত পশুর সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে আছে কুকুর, বেড়াল, উট, গাধা, ঘোড়া ও হাতি। গৃহপালিত পশু হিসেবে উট ও ঘোড়ার সাক্ষ্য পশ্চিম এশিয়ার অন্য কোনো বসতি থেকে পাওয়া যায় নি। আর ছিল মুরগি। মুরগি-পালনও হরপ্পাতেই প্রথম।

এবার হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োর নগর-পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা তোলা যেতে পারে।

হরপ্পা নগরটি ইরাবতী নদীর ধারে। সে-সময়ে ইরাবতীর দুটি শাখা এখানে মিলেছিল। হালে অবশ্য নদীটি ছ'মাইল দূরে সরে গিয়েছে কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের কাছাকাছি সময়ে নগরের গা ঘেঁষেই ছিল নদী। আগে আলোচনা করেছি, সে-সময়ে এ-অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ছিল অনেক বেশি। ফলে ইরাবতীতে বন্যাও হত ব্যাপক। হরপ্পা নগরের অবস্থান দেখে মনে হয়, এই নগরটি ছিল বন্যার এলাকার মধ্যেই। প্রত্নবিদদের ধারণা, শহরের পশ্চিম দিকে যে

দুর্গপ্রাকারের নিদর্শন রয়েছে তার উঁচু চাতালটি গোড়ায় তৈরি হয়েছিল বন্যা ঠেকাবার জন্যে বাঁধ হিসেবে।

মোহেন-জো-দড়ো নগরটি সিন্ধুনদের ধারে। নগরের পুবদিকে সিন্ধুর মূল প্রবাহ আর পশ্চিম দিক দিয়ে পাক খেয়েছে নারা বাঁক। ফলে জায়গাটি একটি দ্বীপের মতো। কিছুকাল আগে পর্যন্ত এই জায়গাটি বন্যায় ডুবে যেত, একটি বাঁধ তৈরি করে এই বন্যা ঠেকানো হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক কালে মোহেন-জো-দড়ো নগরটি যে বারকয়েক বন্যার জলে ডুবে গিয়েছিল তার সাক্ষ্য আছে। মোহেন-জো-দড়ো নগরের পশ্চিম দিকেও রয়েছে একই ধরনের উঁচু বাঁধ, যাকে আমরা বলেছি দুর্গপ্রাকার।

রাস্তাঘাটের বিন্যাস ও ঘরবাড়ির অবস্থানের দিক থেকেও দুই নগরের মধ্যে আশ্চর্য রকমের মিল। দুই নগরের পশ্চিম দিক ঘেঁষা দুর্গপ্রাকারের কথা আগে বলেছি। এই দুর্গপ্রাকারের ওপরেই ছিল নগরের শাসকবর্গের বাসস্থান ও শাসন-বিভাগীয় ভবন। দুর্গপ্রাকারের নিচে আসল নগর। দুই জায়গাতেই এই আসল নগরের আয়তন অন্তত এক বর্গমাইল। উত্তর থেকে দক্ষিণে আর পুব থেকে পশ্চিমে টানা-টানা সিধে রাজপথ—ন-ফুট থেকে ত্রিশফুট পর্যন্ত চওড়া। ফলে গোটা এলাকাটি কতকগুলো ব্লকে বা পাড়ায় ভাগ হয়ে গিয়েছে। প্রায় সমান মাপের এক-একটি পাড়া—পুব-পশ্চিমে ৮০০ ফুট, উত্তর-দক্ষিণে ১২০০ ফুট। মোহেন-জো-দড়োতে এমনি বারোটি পাড়ার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। হরপ্পা সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা চলে না। চারদিকে রাজপথ দিয়ে ঘেরা এক-একটি পাড়ার মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো এলোমেলো অলিগলি।

হরপ্পা বা মোহেন-জো-দড়োর কোথাও পাথরের তৈরি ঘরবাড়ি নেই—সমস্তই ১১ × ৫.৫ × ২.৫ ইঞ্চি মাপের পোড়ানো ইটের। আমরা বিশেষ করে মোহেন-জো-দড়োর ঘরবাড়ি নিয়ে আলোচনা করব। তবে দুটি নগর এমনই একছাঁচে গড়া যে একই কথা হরপ্পা সম্পর্কেও ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বাড়িগুলো মোটামুটি একই পরিকল্পনায় তৈরি। চৌকোনা একটি উঠোন, চারদিকে কোঠা। প্রবেশপথ সদর রাস্তার দিক থেকে নয়, পাশের গলির দিক থেকে। রাস্তার দিকে কোনো জানলা নেই। দেওয়ালের ভেতর দিকে সম্ভবত কাদামাটির প্রলেপ দেওয়া হত। বাড়িগুলো ছিল দোতলা বা আরও বেশি তলা-বিশিষ্ট। ছাদের বীম তৈরি হত দেবদারু বা শিশু গাছের কাঠ দিয়ে। সব বাড়িতেই ছাদে যাবার সিঁড়ি।

একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, বাড়ির মধ্যে পায়খানার কোনো চিহ্ন নেই কিন্তু স্নানের ঘর আছে। স্নানের ঘরের ব্যবস্থা দেখে মনে হয়, নগরবাসীরা দাঁড়ানো অবস্থায় মাথায় জল ঢেলে স্নান করত। স্নান করার এই পদ্ধতিটি হাল আমলেও আমাদের দেশে টিকে আছে। স্নানঘর থেকে ময়লা জল বেরিয়ে যাবার জন্যে নর্দমার ব্যবস্থা ছিল। এই নর্দমাগুলো যুক্ত ছিল বাইরের রাস্তার নিচের বড়ো নর্দমার সঙ্গে। এই বড়ো নর্দমাগুলোকে পরিষ্কার করার জন্যে জায়গায় জায়গায় ছিল ইট দিয়ে ঢাকা 'ম্যানহোল'। আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থাও ছিল উঁচুদরের। বাড়ির বাইরের দিকে দেওয়ালের গায়ে ইট দিয়ে গেঁথে তৈরি হত একটি চৌকোনা ডাস্টবিন। বাড়ির সমস্ত আবর্জনা এসে পড়ত ডাস্টবিনের মধ্যে। সেখান থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করার নিশ্চয়ই কোনো ব্যবস্থা ছিল। নগরকে পরিষ্কার রাখার জন্যে এমন ড্রেন ও ডাস্টবিনের ব্যবস্থা সেই প্রাগৈতিহাসিক কালে আর কোথাও ছিল না, এমনকি ভারতের অনেক আধুনিক শহরেও নেই।

বেশির ভাগ বাড়ি লম্বায় ফুট তিরিশেক ও চওড়ায় ফুট তিরিশেক জায়গার ওপরে। কিন্তু এর চেয়ে বড়ো মাপের বাড়িও ছিল। দেখে মনে হয় এগুলো অপেক্ষাকৃত বিত্তবানের বাড়ি। মোহেন-জো-দড়োতে বিত্তবানের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। আর সাধারণ মাপের বাড়িগুলো যদি মধ্যবিত্তদের হয় তাহলে মধ্যবিত্তরাও সংখ্যায় ছিল প্রচুর এবং নগর-জীবনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল।

আর বিত্তহীনদের কথা আগেই বলেছি। এরা পুরোপুরি দাসও হতে পারে বা শ্রমজীবী। এদের জন্যে দু'খোপওলা কুঠরির সারি—অনেকটা হালের কোনো চা-বাগানের কুলি লাইনের মতো।

মোহেন-জো-দড়োতে এই কুঠরিগুলোর মাপ—লম্বায় ২০ ফুট, চওড়ায় ১২ ফুট। দু'সারি সমান্তরাল কুঠরি, তার একদিকে রাস্তা, অন্যদিকে সরু গলি। কুঠরির একটি খোপ আয়তনে অপর খোপের দ্বিগুণ। হরপ্পাতেও একই ধরনের কুঠরি পাওয়া গিয়েছে। তবে হরপ্পার কুঠরির মাপ মোহেন-জো-দড়োর প্রায় দ্বিগুণ।

হরপ্পার দুর্গপ্রাকারের উত্তর দিকে নিচু জমিতে এমনি দু'সার কুঠরির নিদর্শন আছে। আর কুঠরিগুলোর কাছেই রয়েছে ইট দিয়ে বাঁধানো গোল গোল চত্বর (দশ ফুট ব্যাস)। চত্বরগুলো সার দিয়ে সাজানো। চত্বরের মাঝখানে একটি গর্ত আর চিহ্ন দেখে বোঝা যায় যে এই গর্তের মধ্যে বিরাট একটি কাঠের মুষল বসানো থাকত। প্রত্নবিদদের ধারণা, এই চত্বরগুলো শস্য পেষাই করার জায়গা—অনেকটা বাংলাদেশের ঢেঁকিশালের মতো।

দুই নগরেই জলের ব্যবস্থা ছিল কুয়ো। কুয়োর পাড় চমৎকার-ভাবে ইট দিয়ে বাঁধানো। বন্যার পলিমাটিতে বা পুরনো ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষে নগরের জমি যতোই উঁচু করতে হয়েছে ততোই ইট গেঁথে উঁচু করতে হয়েছে কুয়োর পাড়। জমি খোঁড়ার পরে এখন এই গাঁথুনিগুলোকে কারখানার চিমনির মতো দেখায়। কয়েকটি কুয়োর চারপাশে অসংখ্য খুরি ছড়ানো। মনে হয় এই কুয়োগুলো সাধারণের জলপানের জায়গা ছিল এবং খুরিতে জল খাবার পরে খুরিটা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হত।

মোহেন-জো-দড়োর দুর্গপ্রাকারের উঁচু ঢিবির পাশেই মস্ত একটি বাপি বা স্নানের জায়গা আছে। মস্ত একটি চৌবাচ্চাও বলা চলে। প্রায় ৪০ ফুট লম্বা ও ২৪ ফুট চওড়া এবং ৮ ফুট গভীর। ইটের গাঁথুনির ওপরে কাঠের পাটাতন বসানো সিঁড়ি। চৌবাচ্চার ইটের গাঁথুনির কাজ এত সূক্ষ্ম যে হালের পাকা রাজমিস্ত্রীরাও দেখে অবাক

হবে। জল যাতে বেরিয়ে যেতে না পারে সেজন্যে ইটের গাঁথুনির ফাঁকগুলোকে বিটুমেন দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। এককোণে চৌবাচ্চার জল বার করে দেবার জন্যে একটি ফুটো। চৌবাচ্চার চারদিকে খিলান দিয়ে ঢাকা রাস্তা আর তিনদিকে এই রাস্তার পরেই সারি সারি কামরা। অনেকের ধারণা, এই চৌবাচ্চাটি ছিল আসলে একটি ধর্মানুষ্ঠানের জায়গা, তিনদিকের কামরাগুলোয় পুরোহিতরা থাকত। আমাদের দেশে অনেক ধর্মানুষ্ঠানের জায়গাতেই এমনি পুকুর আছে আর পুকুরকে ঘিরে এমনি সারি সারি কামরা। খুব সম্ভবত মোহেন-জো-দড়োর নগরবাসীরা এই চৌবাচ্চার জলকে পবিত্র মনে করত (যেমন হিন্দুদের কাছে গঙ্গাজল) এবং এই চৌবাচ্চার জল অনেক রিচুয়ালের উপকরণ হয়ে উঠেছিল। আগেই বলেছি, বৌদ্ধস্তূপটি রয়েছে বলে ঢিবিটি খোঁড়া হয় নি। খুঁড়লে হয়তো একটি মন্দিরের নিদর্শনও পাওয়া যেত।

মোহেন-জো-দড়োতে সবচেয়ে বড়ো যে দালানটির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা লম্বায় ১৩০ ফুট, চওড়ায় ৭৮ ফুট। এই মস্ত দালানটি রাজপ্রাসাদ হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু দালানটিকে যে-ভাবে কামরায় ভাগ করা হয়েছে তাতে মনে হয় 'আশ্রম'-ধরনের কোনো একটি প্রতিষ্ঠান ছিল এখানে। এ-ধরনের দালান মোহেন-জো-দড়োতে আর একটিও নেই। এই দালানটির দক্ষিণ দিকে রয়েছে আরো অদ্ভুত ধাঁচের একটি দালান—লম্বায় ৮০ ফুট, চওড়ায় ৮০ ফুট। দালানটি একটি হলঘরের মতো, ইটে গাঁথা কুড়িটি চৌকোনা থামের ওপরে হলঘরের ছাদ।

হরপ্পার শস্য-পেষাইয়ের চত্বরের কথা বলেছি। চত্বরগুলোর পেছনেই মস্ত একটি শস্যাগার। বন্যার জল যাতে শস্যাগারের ক্ষতি করতে না পারে সেজন্যে ইট দিয়ে তৈরি উঁচু ভিতের ওপরে শস্যাগারটি তৈরি। লম্বায় ২০০ ফুট, চওড়ায় ১৫০ ফুট। দালানটি কয়েকটি ব্লকে বা গুদামে ভাগ করা। প্রত্যেকটি লম্বায় ৫০ ফুট, চওড়ায় ২০ ফুট।

এই শস্যাগারটির কাছেই ধাতু-কারিগরদের কামারশালা।

হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োর এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, সে-সময়ে এই অঞ্চলে মোটামুটি একটা সমৃদ্ধির অবস্থা তৈরি হয়েছিল। যদিও নগরবাসীদের মধ্যে উঁচু-নিচু ভেদ এসেছিল, যদিও একদল ছিল বিত্তবান, আরেক দল বিত্তহীন—কিন্তু অবস্থাটা বিত্তহীনদের পক্ষেও অসহনীয় ছিল না। তারাও দু'খোপওলা পাকা কুঠরিতে থাকত। এই সমৃদ্ধি এসেছিল দু'দিক থেকে। কৃষি ও বাণিজ্য। একদিকে যেমন বিরাট অঞ্চল জুড়ে চাষ করা হত অন্যদিকে তেমনি দূর দূর অঞ্চলের সঙ্গে লেনদেনের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

বেলুচিস্তানের গ্রাম-বসতিগুলোর সঙ্গে হরপ্পার বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল, সে-কথা আগে বলেছি। কিন্তু হরপ্পায় যে-সমস্ত ধাতু ও মূল্যবান পাথর পাওয়া গিয়েছে তা থেকে বোঝা যায় আরো অনেক দূর দূর অঞ্চলের সঙ্গে হরপ্পার বণিকদের যোগাযোগ ছিল। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ঝিনুক ও কয়েক ধরনের পাথর আসত কাথিয়াওয়াড় ও দাক্ষিণাত্য থেকে। রুপো, নীলকান্তমণি ও ল্যাপিস ল্যাজিউলাই আসত পারস্য ও আফগানিস্তান থেকে। রাজস্থান কিংবা পারস্য থেকে তামা। তিব্বত কিংবা মধ্য এশিয়া থেকে জেড্ পাথর। বেলুচিস্তান ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোতে তো হরপ্পার বাণিজ্যিক ঘাঁটিই ছিল।

আর যতোদূর জানা গিয়েছে, হরপ্পা রাজ্যের বাণিজ্য চলত স্থলপথে। যদিও সিন্ধুনদের মোহনা পর্যন্ত হরপ্পা কালচারের বিস্তৃতি কিন্তু হরপ্পা রাজ্যের বণিকদের সমুদ্রপথে যাতায়াত প্রায় না-থাকার মতো। হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ থেকে মাত্র দুটি জলযানের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। দুটি ছবি—একটি পোড়ামাটির পাত্রে আঁকা, অপরটি সীলমোহরে খোদাই করা। ছবিতে জলযানের আকার ও আয়োজন দেখে বোঝা যায়, এ দুটি জলযান বড়ো জোর নদীপথে পাড়ি দিতে পারে, সমুদ্রযাত্রার উপযোগী কিছুতেই নয়।

স্থলপথের যানবাহন ছিল গোরুর গাড়ি। প্রায় নিরেট চাকা,

চাকাদুটি ঘুরত অক্ষদণ্ড সমেত আর গাড়ির সঙ্গে অক্ষদণ্ডটি বাঁধা থাকত চামড়া দিয়ে। সিন্ধুর গ্রামে হাল আমলেও প্রায় একই ধরনের গোরুর গাড়ি চলে। মোহেন-জো-দড়োর রাস্তায় গোরুর গাড়ির চাকার দাগ পাওয়া গিয়েছে। দুটি চাকার ব্যবধান তিন ফুট ছ-ইঞ্চি। পাঁচ হাজার বছর পরেও এখনো পর্যন্ত সিন্ধু অঞ্চলের গোরুর গাড়ির দুই চাকার ব্যবধান এই মাপেই থেকে গিয়েছে।

হরপ্পা রাজ্য থেকে দু'হাজারেরও বেশি সীলমোহর পাওয়া গিয়েছে। মনে হয় প্রত্যেক বণিক-পরিবারেরই একটি করে সীলমোহর ছিল। সীলমোহর দু'ভাবে ব্যবহার হত—সম্পত্তির মালিকানার চিহ্ন হিসেবে আর রক্ষাকবচ হিসেবে। চৌকোনা নরম পাথরের ওপরে ছবি ও লেখা খোদাই করে তৈরি হত সীলমোহর-গুলো। ছবি আঁকা হত সাধারণত কোনো জন্তুজানোয়ারের। লেখার পাঠোদ্ধার এখনো পর্যন্ত হয় নি। পণ্ডিতদের মতে সীলমোহরের ওপরে যে-সব ছবি আঁকা হয়েছে আর যে-সব কথা লেখা হয়েছে তার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক আছে। সীলমোহর মেসোপটেমিয়াতেও পাওয়া গিয়েছে কিন্তু সেখানকার সীলমোহরের আকার সিলিণ্ডার বা নলের মতো। কাদামাটির ফলকের ওপরে এই নলাকৃতি সীলমোহরকে পাক খাইয়ে ছাপ ফেলা হত। কিন্তু হরপ্পা রাজ্যের সীলমোহরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই ঘটনাই একটি প্রমাণ যে হরপ্পা কালচারের জন্ম ভারতবর্ষের মাটিতেই, বাইরে থেকে চাপানো নয়। হরপ্পা রাজ্যের সীলমোহরে যে-সব জন্তুজানোয়ারের ছবি পাওয়া যায় তার মধ্যে আছে ষাঁড়, মহিষ, ছাগল, বাঘ ও হাতি। ছবির বিষয়বস্তু ধর্ম-সম্পর্কিত বলেই মনে হয়। ছবিগুলো আশ্চর্য রকমের জীবন্ত।

সীলমোহরের লেখাগুলো আজ পর্যন্ত পণ্ডিতদের কাছে রহস্য হয়ে রয়েছে। হরপ্পা রাজ্যে লেখার যা কিছু নিদর্শন তা এই সীল-মোহরেই। মিশরে যেমন প্যাপিরাস পাওয়া গিয়েছে, মেসোপটে-মিয়ায় যেমন মাটির ফলক—হরপ্পা রাজ্যে তেমন কোনো নিদর্শন নেই।

কোনো সীলমোহরেই কুড়িটির বেশি অক্ষর নেই। সাধারণত দশটির কাছাকাছি। পণ্ডিতদের মতে হরপ্পা লিপিতে প্রায় ২৭০টি অক্ষর আছে, অক্ষরগুলো চিত্রমূলক। অর্থাৎ, এক একটি অক্ষর হচ্ছে বিশেষ অর্থবোধক এক একটি ছবি। এই ছবিগুলোকে পর পর সাজিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করা হচ্ছে। ছবিগুলোকে অক্ষর বললে হয়তো ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে—চিহ্ন বলাই ভালো। চীনাভাষায় অক্ষর এখনো পর্যন্ত এ-ধরনের চিত্রমূলক চিহ্ন। যেমন ধরা যাক স্ত্রীলোক শব্দটি। আমরা কতকগুলো অক্ষর সাজিয়ে শব্দটি লিখি। কিন্তু একটি স্ত্রীলোকের ছবি এঁকেও শব্দটি বোঝানো যেতে পারে।

হরপ্পার লিপি সম্পর্কে বিশেষভাবে বলার কথা এই যে সাতশো বছরেও এই লিপি হুবহু একই রকম থেকে গিয়েছে। সাধারণত দেখা যায় গোড়ার দিকে অক্ষর বা চিহ্নের সংখ্যা থাকে অনেক বেশি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা কমতে থাকে। সুমের-এ লেখা শুরু হবার গোড়ার দিকে ৯০০টি চিহ্ন ব্যবহার হত, উরুক্-এ ২০০০টি। কিন্তু হরপ্পায় চিহ্নের সংখ্যা প্রায় ২৭০। তার মানে এটি গোড়ার অবস্থা নয়—অনেকখানি পরিণত। অথচ এতখানি পরিণত লিপি সাতশো বছরেও আরো পরিণত হয়ে ওঠে নি।

আর আগেই বলেছি, পণ্ডিতরা হরপ্পার লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারেন নি।

এ-প্রসঙ্গে হরপ্পার শিল্প সম্পর্কে দু'একটা কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। সুমের-এর জিগুরাট বা মিশরে পিরামিডের মতো কোনো নিদর্শন হরপ্পায় নেই। মস্ত কিছু করার দিকে হরপ্পাবাসীদের নজর ছিল না বলে মনে হয়। এমনকি হরপ্পা থেকে যে-সমস্ত মূর্তি পাওয়া গিয়েছে তাও খুব ছোট ছোট। সাহিত্য বা ধর্ম-উপাখ্যান নিশ্চয়ই কিছু ছিল কিন্তু তার কোনো হদিশ এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। আর হরপ্পাবাসীরা যে-ধরনের ঘরবাড়ি তুলত তার মধ্যে শিল্পবোধের খুব বেশি পরিচয় ছিল না। ভেতরের দেওয়ালে অবশ্য

মাটি লেপা হত কিন্তু সেই মাটির ওপরে কোনো অলংকরণ করা হত কিনা তা আর এখন জানার উপায় নেই। কিন্তু রাস্তা দিয়ে হাঁটলে ছ'পাশে শুধু ইট-বার-করা জানালাহীন খাড়া-খাড়া দেওয়াল। দৃশ্য হিসেবে আর যাই হোক চমৎকার নয়।

প্রকাণ্ড বা অতিকায় ধরনের কিছু করবার দিকে হরপ্পাবাসীদের নজর ছিল না। তাদের আসল ক্ষমতার পরিচয় রয়েছে ছোট ছোট মূর্তি গড়ার মধ্যে। এ-ব্যাপারে তাদের সমকক্ষ কেউ নেই। এই মূর্তিগুলো আশ্চর্য শিল্পকর্মের নিদর্শন। সীলমোহরের কথা আগে বলেছি। সীলমোহরের ছোট পরিসরে জন্তুজানোয়ারকে এমন জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তোলা যে কতখানি ক্ষমতার পরিচয় তা সমঝদার ব্যক্তিমাত্রই বুঝবেন।

আর শুধু জন্তুজানোয়ার নয়, মানুষের মূর্তি গড়ার মধ্যেও এই অনন্যসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় রয়েছে। হাত-পা-মুণ্ডহীন পুরুষের মূর্তিগুলোও এত বাস্তবানুগ যে অবাক হতে হয়। এগুলো পাথরের তৈরি। মাটির তৈরি মূর্তি তো অজস্র পাওয়া গিয়েছে। বিশেষ-করে নারী-মূর্তি। কিন্তু ব্রোঞ্জের তৈরি যে নারী-মূর্তিটির কথা এখানে বিশেষভাবে বলা দরকার তার নাম দেওয়া হয়েছে 'ড্যান্সিং গার্ল' বা নর্তকী। মূর্তিটির কোনো আবরণ নেই কিন্তু আভরণ প্রচুর। বাঁ হাতটি কবজি থেকে বগল পর্যন্ত বলয়ে ঢাকা, ডান হাতে কবজিতে ও কনুইয়ে বলয়, গলায় হার। কেশবিন্যাসটি অত্যন্ত জটিল কিন্তু আশ্চর্যরকমের সুন্দর। একটি হাত রয়েছে নিতম্বে আর একটি পা সামান্য একটু বাঁকানো। কারও কারও মতে এই নর্তকীর মূর্তিটি একজন দেবদাসীর। কিন্তু এ-সম্পর্কে নিশ্চিত-ভাবে কিছু বলা চলে না। দেবদাসী হওয়া তো দূরের কথা, মেয়েটি আসলে নর্তকী কিনা তা নিয়েও সন্দেহ থাকতে পারে। মূর্তিটি শিল্পকর্মের এক আশ্চর্য নিদর্শন।

শিল্পকর্মের নিদর্শন আরো আছে। পিনের মুণ্ডি বা পুঁতির মধ্যে জন্তুজানোয়ারের মূর্তি ফুটিয়ে তোলা হত। বাচ্চাদের খেলনা হিসেবেও

জন্তুজানোয়ারের মূর্তি তৈরি হত। আর মাটির তৈরি (টেরাকট্টা) অজস্র নারী-মূর্তির কথা আগেই বলেছি। এই মূর্তিগুলোর গায়ে জামাকাপড় নেই বা না-থাকার মতো, কিন্তু চুল-বাঁধার বাহার আছে, গয়নাগাটিও কম নয়। কারও কারও ধারণা, এগুলো হচ্ছে দেবী মাতৃকার মূর্তি, ঘরে ঘরে এদের পুজো হত।

এসব মূর্তি দেখে হরপ্পার মানুষদের সাজপোশাক সম্বন্ধে কিন্তু খুব স্পষ্ট ধারণা হয় না। শুধু এটুকু বোঝা যায় যে পুরুষরা ঢিলে পোশাক ব্যবহার করত আর তাদের ডান কাঁধ আদুড় থাকত। মেয়েদের মতো তাদেরও লম্বা চুল। মেয়েরা বেণী দোলাত কিংবা খোঁপা বাঁধত, গলায় হাতে ও কানে প্রচুর গয়না ব্যবহার করত আর খাটো পোশাক পরত। মেয়েদের বেলায় চুলের ও গয়নার বাহারটাই সবচেয়ে বেশি। পুরুষরা দাড়ি রাখত।

হরপ্পায় তামার ও ব্রোঞ্জের হাতিয়ার তৈরি হত, সেকথা আগে বলেছি। তবে পাথরের হাতিয়ারের ব্যবহারও একেবারে বন্ধ হয় নি। হাতিয়ারের মধ্যে ছোরা, কুড়ুল, করাত ইত্যাদি সবই পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু হরপ্পার ধাতু-কারিগরদের দক্ষতার মান সুমের-এর ধাতু-কারিগরদের চেয়ে নিচে ছিল একথা স্বীকার করতে হবে। সুমের-এ যে কুড়ুল তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে ছিল হাতল লাগাবার ফুটো, কিন্তু হরপ্পার কুড়ুলকে হাতলের সঙ্গে বাঁধতে হত। সুমের-এ যে ফলা তৈরি হয়েছিল তা হত শিরাযুক্ত, ফলে খুবই মজবুত; হরপ্পার ফলায় মাঝখানের শিরাটি না থাকাতে তা অনায়াসেই বেঁকে যেত। তবে হরপ্পার করাত ছিল সকলের সেরা; এই একটি ক্ষেত্রে তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। হালের করাতের মতো হরপ্পার করাতের দাঁতগুলোও ছিল ঢেউ-খেলানো, ফলে কাঠ কাটার সময়ে গুঁড়োগুলো আপনা থেকেই ঝরে পড়ত। হরপ্পার করাত দেখে অনেকের ধারণা হয়েছে, হরপ্পায় নিশ্চয়ই উঁচুদরের ছুতোরের কাজ হত।

হরপ্পার পোড়ামাটির পাত্র তৈরি হত খুবই সাদামাটা ধরনের।

তবে খুবই ভালোভাবে। মনে হয় পোড়ামাটির পাত্র তৈরি হত নিতান্তই একটা ব্যবহার্য জিনিস হিসেবে, কাজেই পাত্রের রঙ ও অলংকরণ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামানো হয় নি। তবে রঙ-করা পাত্রের নিদর্শন যে কটি পাওয়া গিয়েছে তার কাজ খুবই সূক্ষ্ম। লালের ওপরে কালো রং দেখে বোঝা যায় যে রানা ঘুণ্ডাই বা উত্তর বেলুচিস্তানের সঙ্গে হরপ্পার পোড়ামাটির পাত্রের কিছুটা সম্পর্ক আছে।

হরপ্পার রীতি-নীতি-আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে দু'একটা কথা বলে এ-আলোচনা শেষ করছি। আগে বলেছি, হরপ্পার শাসন পরিচালিত হত খুব সম্ভবত পুরোহিততন্ত্রের আওতায়। পশ্চিম এশিয়াতেও তাই হয়েছিল, হরপ্পাতেও তাই হওয়া স্বাভাবিক।

এই পুরোহিততন্ত্রের আওতায় রাজ্যের মধ্যে যে-সব রীতি-নীতি-আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়েছিল সে-সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে। দেবী-মাতৃকার পুজোর কথা আগেই বলেছি। মনে হয় প্রত্যেকটি পরিবারের পুজোর জায়গাতেই একটি করে দেবী-মাতৃকার আসন ছিল। পরের যুগের হিন্দুধর্মেও দেখা যায় যে গ্রামাঞ্চলে নানান ধরনের গ্রামদেবতার আসন রয়েছে এবং সে-সব গ্রামদেবতার পূজারীরা অব্রাহ্মণ। পণ্ডিতদের ধারণা, হিন্দুদের গ্রামদেবতার পুজোটি এসেছে হরপ্পার দেবী-মাতৃকার পুজো থেকে। হরপ্পায় আরেকটি নারীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে যাকে বলা হয় বসুমাতা-মূর্তি। এই নারীর গর্ভ থেকে একটি চারাগাছ বেরিয়ে এসেছে। এ-ধরনের মূর্তি গড়ার পেছনে সে-যুগের মানুষের একটি জাদুবিশ্বাস আছে। তারা বিশ্বাস করত যে মেয়েদের মা হওয়া আর মাটি ফসলা হওয়া—এ দুয়ের মধ্যে একটা গভীর যোগাযোগ আছে। আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল যে নারী-দেহ থেকেই আদি-শস্যের উদ্গম হয়েছে। হরপ্পার বসুমতী-মূর্তিটি এই বিশ্বাসেরই একটি নিদর্শন। পরের যুগের হিন্দুধর্ম থেকেও এই বিশ্বাস একেবারে মুছে যায় নি। দেবী দুর্গার অপর এক নাম শাকম্ভরী, অর্থাৎ যিনি 'আত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ'

(নিজদেহ সমুদ্ভূত) প্রাণধারক শাকের সাহায্যে জগতের পুষ্টি সরবরাহ করেন। *

হিন্দুধর্মের সঙ্গে হরপ্পা কালচারের যোগাযোগের নিদর্শন আরো আছে। সীলমোহরের মূর্তিগুলোর মধ্যে একজন পুরুষ-দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে যার মাথায় দুটি শিঙ ও তিনটি মুখ। তিনি যোগাসনে বসে আছেন আর তাঁকে ঘিরে রয়েছে একটি হাতি, একটি বাঘ, একটি গণ্ডার ও একটি মহিষ। তাঁর পায়ের কাছে দুটি হরিণ। খুব সম্ভবত এই দেবতাটি হিন্দুধর্মের শিব বা পশুপতির আদি রূপ।

ফসল ফলাবার আচার-অনুষ্ঠানের নানা নিদর্শন হরপ্পার সীল-মোহরগুলোতে আছে। তাতে দেখা যায়, কোনো কোনো পশুকে দেবতার মতো উপাসনা করা হচ্ছে। বিশেষ করে ষাঁড়কে। হিন্দুধর্মে ষাঁড় শিবের বাহন। কিন্তু হরপ্পা কালচারের পশুপতির সঙ্গে ষাঁড়ের কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। পশু-উপাসনা ছাড়াও ফুল-লতাপাতা-গাছপালার উপাসনার সাক্ষ্যও আছে। অর্থাৎ মেসোপটেমিয়ায় ও মিশরে আমরা যা দেখেছি, হরপ্পাও তার ব্যতি-ক্রম নয়। সেই আদিম টোটেম-বিশ্বাস নানাভাবে টিকে আছে।

হরপ্পার কবর দেওয়ার রীতি সম্পর্কে এখনো পুরোপুরি খবর জানা যায় নি। আজ পর্যন্ত সাতান্নটি কবর পাওয়া গিয়েছে। এখানে কবরের মধ্যে মৃতদেহের পাশে রেখে দেওয়া হত মৃতব্যক্তির গয়না-গাটি, প্রসাধনের সরঞ্জাম ও খাবারদাবার। এখানেও দেখা যাচ্ছে, মৃত্যুর পরেও জীবন ফিরে আসতে পারে—এই বিশ্বাসের সাক্ষ্য।

হরপ্পার মানুষরা কোন জাতের এ-নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ ও তর্ক আছে। এই বইয়ে আমরাও এখনো পর্যন্ত মানুষের জাত নিয়ে কোনো আলোচনা তুলি নি। চোখ-কান ইত্যাদির গড়নে ও গায়ের রঙে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে তফাত চোখে পড়ে তারই ভিত্তিতে পণ্ডিতরা সারা পৃথিবীর মানুষকে কতকগুলো জাতে ভাগ

---

* দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'লোকায়ত-দর্শন' গ্রন্থে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে (পৃঃ ৩০৮ দ্রষ্টব্য)।

করেছেন। যেমন, ককেশয়েড (ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার সাদা চামড়া), মঙ্গোলয়েড (পূর্ব এশিয়া ও আমেরিকার হলদে চামড়া), নিগ্রয়েড (আফ্রিকার কালো চমড়া) ও অস্ট্রেলয়েড (অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনির আদিবাসীরা)। এই চারটি জাতের মধ্যেই নানা ধরনের সংমিশ্রণ ঘটে অনেকগুলো মিশ্র জাত তৈরি হয়েছে। কিন্তু মানুষকে কতকগুলো জাতে ভাগ করার পরেই প্রশ্ন ওঠে, এই ভাগাভাগিটা শুরু হয়েছিল কখন? একেবারে গোড়া থেকেই কি? না, পরের কোনো সময়ে? এসব প্রশ্নের সুনিশ্চিত জবাব এখনো পাওয়া যায় নি, পণ্ডিতরা এ নিয়ে এখানো তর্ক করছেন। আমরাও এ-আলোচনার ম ধ্য যাব না।

হরপ্পা কালচারের সবচেয়ে বাড়বাড়ন্ত অবস্থা ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ সাল থেকে ১৫০০ সাল পর্যন্ত। হরপ্পা রাজ্যের শেষদিকের যে-সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তাতে মনে হয়, এই রাজ্যের নগর ছুটির ওপরে বাইরের আক্রমণকারীর হামলা হয়েছিল। হালে পণ্ডিতরা মোটামুটি এ-বিষয়ে একমত হয়েছেন যে বৈদিক আর্যদের আক্রমণেই হরপ্পা রাজ্যের পতন হয়েছিল।

নগর-বিপ্লবের আরেকটি প্রাচীন কেন্দ্র হচ্ছে চীন। তবে চীন সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা খুবই হালের। দেশটি এত বড়ো আর ভৌগোলিক দিক থেকে এত বিচিত্র যে সারা দেশ জুড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা হবার পরেই চীনের নগর-বিপ্লব সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা চলে। পিকিং মানুষ বা সিনানথ্রপাসের কথা আগেই বলেছি। পুরাতন প্রস্তরযুগের নিদর্শন চীনের অন্যান্য নানা অঞ্চল থেকেও পাওয়া গিয়েছে। নূতন প্রস্তরযুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে উত্তর চীনের বিস্তৃত এলাকায়। আর এই এলাকাতেই হোয়াং-হো নদীর উপত্যকায় পাওয়া গিয়েছে ব্রোঞ্জ-যুগের নগর-বিপ্লবের নিদর্শন। তবে চীনের নগর-বিপ্লব সুমের বা মিশর বা হরপ্পার মতো পুরনো নয়। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ সালের কিছু পরে এই বিপ্লবটি হয়েছিল। দক্ষিণ চীনে এখনো পর্যন্ত তেমন ব্যাপকভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা হয় নি।

অবশ্য চীনের পৌরাণিক উপাখ্যান ও লোককথার মধ্যে প্রাচীন যুগের অনেক বিবরণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া তাকে ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া চলে না।*

নগর-বিপ্লবের তিনটি আদি কেন্দ্রের বিবরণ আমরা দিয়েছি। দেখা গেল, তিনটি কেন্দ্রেই নগর-বিপ্লবের ভিত্তি মোটামুটি একই ধরনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ওপরে। আর যদিও নগর-বিপ্লবের বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ ছিল (প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনেই তার সাক্ষ্য আছে) কিন্তু আমাদের আলোচনা থেকেই আমরা জেনেছি যে নগর-বিপ্লব এক কেন্দ্র থেকে অপর কেন্দ্রে চালান হয়ে যায় নি—তার জন্ম দেশের মাটিতেই। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যেই আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ যেমন ছিল তেমনি ছিল বিভিন্নতা।

কিন্তু একথাও সত্যি যে কোনো একটি অঞ্চলে যদি নগর-ব্যবস্থা কায়েম হয় তবে সেই ব্যবস্থাটি সেই বিশেষ অঞ্চলেই আবদ্ধ হয়ে থাকে না—নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন আধুনিককালের শিল্প-বিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছে।

আমরা জানি যে প্রাগৈতিহাসিক কালের নগরগুলো গড়ে উঠেছিল পলিমাটির দেশে। কাজেই ধাতু বা পাথর বা এ-ধরনের কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হত বিদেশের নানা অঞ্চল থেকে। তার মানে কাঁচামালের যোগান যেখান থেকে আসে সেখানকার বসতির সঙ্গে নগরের একটা যোগাযোগ গড়ে ওঠে আর সেই নগরের একদল লোকের জীবিকাই হয়ে ওঠে কাঁচামালের যোগান দেওয়া—তারা আর সরাসরি খাদ্য উৎপাদন করে না। অন্য ভাষায়, নগরের উদ্বৃত্ত শস্যভাণ্ডারের খানিকটা ভাগ তারা পায়।

যেমন মিশরের সীডার কাঠ চালান আসত উত্তর সিরিয়ার

---

* পীত নদী ও ইয়াংসি নদীর উপত্যকা থেকে নূতন প্রস্তরযুগের প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। কৌতূহলী পাঠকরা ১৯৫৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের পিকিং রিভিউ (৩৬নং) পত্রিকাটি পড়ে দেখতে পারেন।

লেবানন থেকে। বেইরুটের কাছাকাছি একটি বন্দর থেকে এই কাঠ জলপথে চালান যেত। ফলে কাঠের কারবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যক মানুষের খাদ্য-সংস্থান হয়েছিল। এমনিতে স্থানীয় ফসলের ওপরে নির্ভর করতে হলে এই বিপুল সংখ্যক মানুষের কিছুতেই ঠাঁই হত না। কাঠের কারবার দেখাশোনা করার জন্যে মিশরীয়রা লেবাননে ঘাঁটি তৈরি করল। অর্থাৎ যা ছিল কৃষিনির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম তাই হয়ে উঠতে লাগল শিল্পবাণিজ্য-নির্ভর নগর। মিশরের শিল্পজাত পণ্য লেবাননে আসতে লাগল, লেবাননেও শিল্প গড়ে উঠতে লাগল। শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা দাঁড়াল এই যে লেবাননকেও বাণিজ্য-দল পাঠাতে হল অন্যান্য অঞ্চল থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করার জন্যে। অর্থাৎ, শুধু যে লেবাননের গ্রাম নগরে রূপান্তরিত হল তাই নয়, লেবাননকে কেন্দ্র করে সেই নগর-ব্যবস্থা আরো নতুন নতুন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

এই প্রক্রিয়াতেই খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ব্রোঞ্জ-যুগের নগর-ব্যবস্থা নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। ক্রীট্, গ্রীসের মূল ভূখণ্ড, ট্রয়, উত্তর ককেকাসের কুবান, এশিয়া মাইনর, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, ইরান, বেলুচিস্তান—এমনি নানা অঞ্চলে। এইভাবে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ সালের মধ্যে এই ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল স্পেনে, ব্রিটেনে ও জার্মানিতে, আরো পাঁচশো বছরের মধ্যেই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় ও সাইবেরিয়ায়।

নগর-বিপ্লবকে তুলনা করা চলে দাবানলের সঙ্গে। একবার শুরু হলে তাকে আর কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তা ছড়িয়ে পড়বেই।

লিপি-বিপ্লব

নগর-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের জগতেও একটা বিপ্লব হয়ে গিয়েছিল। বলা যেতে পারে লিপি-বিপ্লব। লিখতে শেখা, গুনতে শেখা ও ওজন করতে শেখার মধ্যে সূত্রপাত। আমরা আগে আলোচনা করেছিলাম, গাথা বচন ও গীতির মাধ্যমে একপুরুষের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান পরের পুরুষের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু নগর-বিপ্লব হবার পরে এমন কতকগুলো বাস্তব প্রয়োজন দেখা দিল যার ফলে মুখের কথার ওপরে পুরোপুরি নির্ভর করা গেল না। একজনের মুখের কথা অপরের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে ছবি আঁকতে হল বা দাগ টানতে হল বা চিহ্ন বসাতে হল। এভাবে চলতে চলতেই শেষ পর্যন্ত বর্ণমালার আবিষ্কার।

কিউনিফর্ম

আমরা জানি, নগর-বিপ্লবের পরে সুমেরের মন্দিরগুলোতে বিপুল পরিমাণ সম্পদ জড়ো হয়েছিল। মন্দিরের পুরোহিতকে এই সম্পদের হিসেব রাখতে হত। খুবই কড়াক্কড়ি হিসেব—কারণ সব সময়ে নজর রাখতে হত যাতে দেবতাকে কেউ ফাঁকি দিতে না পারে, যার কাছ থেকে যা-কিছু পাওনা তা যেন কড়ায়-গণ্ডায় আদায় হয়। কাজেই শুধু স্মৃতির ওপরে নির্ভর করে বা আদিম মানুষের মতো

গাছের ছালে গিঁট বেঁধে বেঁধে এই বিপুল সম্পত্তির হিসেব রাখা চলত না। অন্য কোনো উপায় আবিষ্কার করতে হয়েছিল।

সুমেরের মাটির ফলকের কথা বলেছি। কতকগুলো ফলক পাওয়া গিয়েছে যাদের গায়ে হিসেব লেখা। এই ফলকগুলো দেখে পণ্ডিতরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের আগেই সুমেরের পুরোহিতরা গুনতে ও হিসেব লিখতে শিখেছিল।

এই ফলকগুলোর গায়ে শুধু যে সংখ্যাবাচক চিহ্ন রয়েছে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে কিছু লিপিও। তবে এই লিপি বর্ণমালার হরফের মতো নয়, সাঁটে আঁকা কতকগুলো ছবির মতো। কোনোটা হয়তো কলসী, কোনোটা ষাঁড়ের মাথা, কোথাও হয়তো বা দুটো ত্রিভুজ। এভাবে ছবি এঁকে এঁকে লেখার যে পদ্ধতি তাকে বলা হয় চিত্র-লিপি।

আবার চিত্র-লিপির মধ্যেও দেখা যায় যে কখনো কখনো ছবির গায়ে একটা বা দুটো বা আরো বেশি দাগ টানা রয়েছে। এই দাগগুলো বিশেষ কতকগুলো সংকেত যার দ্বারা বিশেষ অর্থ বোঝানো হচ্ছে। যেমন, একটা ভেড়ার ছবির গায়ে এ-ধরনের দাগ টেনে টেনে বিভিন্ন জাতের ভেড়াকে বোঝানো যেতে পারে। অবশ্য এ-ধরনের সংকেত ব্যবহার করতে হলে আগে থেকেই অন্য একটি ব্যবস্থা চাই। তা হচ্ছে সংকেতের অর্থ সম্পর্কে সকলের ওয়াকিবহাল থাকা। তার মানে সংকেতচিহ্নগুলোকে সমষ্টিগতভাবে স্বীকৃতি দেওয়া।

লেখার ব্যাপারটাই একজনের একক ব্যাপার নয়। যে লিখছে তাকেও যেমন কতকগুলো সংকেত-চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে, তেমনি যে পড়ছে তাকেও সংকেত-চিহ্নগুলোর মানে জানতে হবে। লিপিকর যদি এমন সব সংকেত-চিহ্ন ব্যবহার করে যার মানে অন্য কারও জানা নেই তাহলে লিপিকরের লেখা অন্যদের কাছে হিজিবিজি মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

আক্কাদ থেকে যে-সমস্ত লিপির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যায়, আক্কাদের লিপির সংকেত-চিহ্ন সুমেরের মতোই। তার মানে সুমেরের লিপি-পদ্ধতি আক্কাদেও গ্রহণ করা হয়েছিল। তার

মানে, এই বিশেষ লিপি-পদ্ধতি সুমেরের একটি বিশেষ পুরোহিত-সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকে নি, গোটা সুমেরীয় সমাজের সম্মতির ভিত্তিতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের পরের সময়ের সুমেরীয় লিপির যে-সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যায়, সংকেত-চিহ্নগুলোর মধ্যে ছবির আদলটা আর বিশেষ নেই। চিহ্নগুলোর চেহারায় অনেক ছাঁটকাট করা হয়েছে এবং এই নতুন চেহারার মধ্যে গোড়ার দিকের ছবিটাকে আর বিশেষ টের পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, এতদিন পর্যন্ত সংকেত-চিহ্নের সাহায্যে বিশেষ একটি ধারণা বা বস্তুকে বোঝানো হত, এবারে দেখা গেল বিশেষ একটি শব্দকেও বোঝানো হচ্ছে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বুঝতে সুবিধে হবে। সুমেরীয় লিপিতে একটি সংকেত-চিহ্ন ছিল যার মানে 'দাড়িওলা মুণ্ডু' (সুমেরীয় ভাষায় 'কা')। চিত্র-লিপির আমলে এই সংকেত-চিহ্নটি সবসময়ে এই বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হত। কিন্তু এই বিশেষ সংকেত-চিহ্নটি 'কা' শব্দের বদলেও বসানো চলে। যেমন, বাংলা 'কামার' কথাটির প্রথম শব্দ 'কা'—সুমেরীয় ভাষায় এই কথাটিকে লিখতে হলে 'কা' শব্দের বদলে 'দাড়িওলা মুণ্ডুর' সংকেত-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ, এতদিন সংকেত-চিহ্নটির ব্যবহার ছিল ধারণাগত বা ভাবগত, এবারে শব্দগত। আধুনিক লিপিতে বর্ণমালার সাহায্যে আমরা এই শব্দকেই প্রকাশ করি। আমাদের শরীরের স্বরযন্ত্র থেকে যতো রকমের শব্দ বেরোতে পারে তা সবই কতগুলো ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণের সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভব। এজন্যে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের বেশি বর্ণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এক-একটি ধারণা বা ভাবকে প্রকাশ করার জন্যে যদি এক-একটি সংকেত-চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় তাহলে খুব সাদামাটা ধরনের ভাবগুলোকে প্রকাশ করতে হলেও কয়েক হাজার সংকেত-চিহ্নের প্রয়োজন হতে পারে। চীনা ভাষাতে এ-ধরনের ভাবব্যঞ্জক সংকেত-চিহ্নের প্রচলন রয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে সংকেত-চিহ্ন গোড়ার দিকে ছিল ভাবব্যঞ্জক, পরে শব্দব্যঞ্জক।

অবশ্য বহুকাল পর্যন্ত ভাবব্যঞ্জক সংকেত-চিহ্নই ব্যবহার করা হত। এমনকি যে-সব ক্ষেত্রে শব্দব্যঞ্জক সংকেত-চিহ্ন ব্যবহার করা হত সেখানেও যাতে মানে বুঝতে অসুবিধে না হয় সেজন্যে ভাবব্যঞ্জক সংকেত-চিহ্নটিও পাশে লিখে রাখা হত। এই বাড়তি জুড়ে দেওয়া ভাবব্যঞ্জক সংকেত-চিহ্নটিকে বলা হয় নির্দেশক (determiuative)। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংকেত-চিহ্নগুলোর চেহারা আরো সাদাসিধে হয়েছে। তখন আর সেগুলোকে ধরে ধরে আঁকতে হত না, একটা শক্ত ও ছুঁচলো কোনো জিনিস দিয়ে কাদামাটির ওপরে দেগে দেওয়া চলত। এই অবস্থায় পেঁ ৗছে ব্যাবিলোনিয়ার লিপির চেহারা দাঁড়িয়েছিল অনেকটা গোঁজ বা কীলকের মতো। সেজন্যেই এর নাম দেওয়া হয়েছে কীলকাকৃতি বা কিউনিফর্ম (cuneiform) লিপি। বহুকাল পর্যন্ত এই কিউনিফর্ম লিপির প্রচলন ছিল এবং এশিয়া মাইনরে আর্মেনিয়ায় পারস্যে ও অন্যান্য নানা দেশে এই লিপি ছড়িয়ে পড়েছিল।

হায়ারোগ্লিফিক

আগে বলেছি, সুমেরে লেখা হত কাদামাটির ফলকে, পরে তাকে পোড়ানো হত। ফলে পাঁচ হাজার বছর পরেও সুমেরের লেখার নিদর্শন একেবারে শুরুর সময় থেকেই রয়ে গিয়েছে। মিশরের বেলায় কিন্তু একেবারে শুরুর সময়কার লেখার কোনো নিদর্শন নেই। সম্ভবত গোড়ার দিকে লেখা হত এমন সব জিনিসের ওপরে যা টিকে থাকে নি। পরে লিপি-পদ্ধতি খানিকটা উন্নত হবার পরে পোড়ামাটির পাত্র বা সীলমোহর বা এ-ধরনের টিকে থাকার মতো জিনিসের গায়ে লেখা শুরু হয়েছিল।

মিশরে লিপির প্রচলন সুমেরের কিছু পরে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই মিশরের লিপি-পদ্ধতি সুমেরের চেয়েও উন্নত হয়ে উঠেছিল। সংকেত-চিহ্নগুলোর মধ্যে ছবির আদল খুবই স্পষ্ট। তা থেকে বোঝা যায় যে গোড়ার দিকে মিশরের লিপিও ছিল পুরোপুরি চিত্র-লিপি। এই চিত্র-লিপি থেকেই পরে ভাবব্যঞ্জক চিহ্ন। কিন্তু মিশরের প্রথম রাজা মেনেসের সময় থেকেই দেখা যায় যে শব্দব্যঞ্জক চিহ্নেরও ব্যবহার হচ্ছে, রাজাদের নাম ও উপাধি শব্দব্যঞ্জক চিহ্নের সাহায্যে বানান করে করে লেখা হচ্ছে। অবশ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একটি ভাবব্যঞ্জক শব্দ নিদর্শক হিসেবেও থাকত। মিশরে এই লিপির নাম ছিল 'দেব-ভাষা', তাই থেকে গ্রীক ভাষায় নামকরণ হয়েছে হায়ারো-গ্লিফিক। অল্পদিনের মধ্যেই হায়ারোগ্লিফিক লিপিতে ব্যঞ্জন-ধ্বনি-সূচক চব্বিশটি বর্ণের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। স্বর-ধ্বনিসূচক কোনো চিহ্ন এই লিপিতে ছিল না।

সিন্ধু উপত্যকার লিপি

সিন্ধু উপত্যকার লিপির এখনো পর্যন্ত পাঠোদ্ধার হয় নি তা বলেছি। পণ্ডিতদের মতে এই লিপি চিত্র-লিপির পর্যায় পার হয়ে এসেছিল এবং এই লিপিতে ভাবব্যঞ্জক ও ধ্বনিব্যঞ্জক দু'রকম চিহ্নেরই ব্যবহার ছিল।

বৈষয়িক প্রয়োজনের তাগিদ

নগর-ব্যবস্থা কয়েম হবার পরে কতকগুলো জরুরি বৈষয়িক প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এই বৈষয়িক প্রয়োজনের তাগিদেই লিপির আবিষ্কার। এমনকি সুমেরের যে পুরোহিতরা লিপির প্রবর্তন

করেছিল তাদের কাছেও প্রয়োজনটা ছিল নিতান্তই পার্থিব। সম্পত্তির হিসাব রাখা ও শাসনব্যবস্থা বজায় রাখা।

কিন্তু উদ্দেশ্য যাই হোক, এর ফল হয়েছিল যুগান্তকারী। মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে একটা বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। এক দেশের ও এক-কালের মানুষের অভিজ্ঞতাকে সব দেশের ও সবকালের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার একটা উপায়ের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে দেশ ও কালের সীমানা মুছে গিয়েছিল।

অবশ্য এখানে বলা দরকার যে এই উজ্জ্বল সম্ভাবনার বাস্তব রূপায়ণ সঙ্গে সঙ্গেই হয় নি। কিউনিফর্ম বা হায়ারোগ্লিফিক লিপি বক্তব্য প্রকাশের পক্ষে খুব একটি সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। কারণ দেখা যাচ্ছে, লিপি-আবিষ্কারের দু'হাজার বছর পরেও কিছু লিখতে বা পড়তে হলে পাঁচশো থেকে হাজার পর্যন্ত সংকেত-চিহ্ন মুখস্থ করা দরকার। বেশ কয়েক বছর ধরে রীতিমতো অনুশীলন না করলে কিছুতেই লেখাপড়া-জানা লোক হওয়া যেত না।

এ-অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই লেখাপড়া জানা লোকদের বা লিপিকরদের আলাদা একটা মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। লিপিকররা হয়ে উঠেছিল উঁচু মহলের মানুষ। খাওয়া-পরার জন্যে তাদের আর গতর খাটিয়ে মেহনত করতে হত না। আমরা জানি, কামার কুমোর বা ছুতোরকেও কারিগরি দক্ষতা অর্জনের জন্যে শিক্ষানবিশী করতে হয়—কিন্তু সেজন্যে তারা কায়িক পরিশ্রম থেকে রেহাই পাই না। লিপিকরের লিপি-দক্ষতার জন্যেও বিশেষ ধরনের শিক্ষানবিশী—কিন্তু তার এই বিশেষ বিদ্যা তার জাত পাল্‌টে দেয়, মেহনতী মানুষের সঙ্গে তার আর বিশেষ সম্পর্ক থাকে না।

এ-অবস্থায় কামার-কুমোর-ছুতোর-চাষীদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। আমরা জানি যে এইসব মেহনতী মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যেই উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও ভূ-বিদ্যার সূত্রপাত। ফলে বিজ্ঞানের এ-সমস্ত শাখা গোড়ার দিকে লিপি-জগতের বাইরে থেকে গিয়েছিল।

কিন্তু বিজ্ঞানের অন্য দু'একটি শাখার সঙ্গে ওপরের মহলের সম্পর্ক ছিল। যেমন, গণিত বা জ্যোতির্বিদ্যা। এই বিশেষ শাখাগুলো লিপি-জগতের আওতার মধ্যে এসেছিল। তার ফলে তৈরি হয়েছিল একটি লিখিত জ্ঞানভাণ্ডার। এই জ্ঞানভাণ্ডারের চাবিকাঠিটির নাগাল পেতে হলে লেখাপড়া জানা দরকার আর তা ছিল খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কাজেই বাস্তব জীবনের সঙ্গে এই জ্ঞানভাণ্ডারের বিশেষ কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। লেখাপড়ার দিকে যে ঝুঁকত তাকে কাস্তে বা হাতুড়ির কোনো খোঁজ রাখতে হত না।

আরো একটি ব্যাপার ঘটেছিল। অনেক বছরের অনুশীলন বা সাধনার পরেই একজন মানুষের পক্ষে মাটির ফলকে বা প্যাপিরাসে কিছু লেখা সম্ভব হত। এ-অবস্থায় অন্যদের কাছে অনায়াসেই মনে হতে পারত যে লেখাগুলো অভ্রান্ত। আর সবচেয়ে অলৌকিক ব্যাপার ঘটত তখনই যখন লিপিকরের মৃত্যুর পরেও তার লেখা বেঁচে থাকত। তখন লেখাগুলোকে মনে হত যেন দৈব-বাণী। ফলে পুরনো লেখাকে নতুন করে লিখে সমসাময়িক কালের উপযোগী করে নেওয়ার কথা কেউ ভাবত না বরং উল্‌টোটাই ঘটত। যে-লেখা যতো পুরনো সে-লেখাকে ততো অভ্রান্ত মনে করা হত। এমনকি হাল আমলেও আমরা এ-মনোভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত নই।

গণিত

নগর-ব্যবস্থা কায়েম হবার পরে বৈষয়িক প্রয়োজনের তাগিদ থেকে অপর যে বিদ্যাটির চর্চা শুরু হয়েছিল তা হচ্ছে গণিত। ঠিক মতো খাজনা আদায় করতে হলে, কাকে কি-পরিমাণ কর্জ দিতে হবে আর কার কাছ থেকে কি-পরিমাণ উস্থুল করতে হবে—এসব বৈষয়িক ব্যাপার ঠিকমতো চালনা করতে হলে তিনটি বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার। ওজন ও মাপ, সংখ্যা এবং গণনা।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে এমন সব সাক্ষ্য আছে যাতে বোঝা যায়, ব্যাবিলোনিয়ায় মিশরে ও সিন্ধু-উপত্যকায় গণিত-চর্চার প্রত্যেকটি শাখাই রীতিমতো উন্নত ছিল।

নগর-ব্যবস্থার ধরনটাই এমন যে রোজকার জীবনে অনেকগুলো জটিল সমস্যার সমাধান করতে হয়। যেমন, মস্ত এক-একটি নির্মাণ-কার্যের জন্যে বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবীকে একজায়গায় জড়ো করা। এসব ক্ষেত্রে আগে থেকেই হিসেব করা দরকার কি-পরিমাণ খাদ্যের যোগান দিতে হবে, কি-পরিমাণ কাঁচামাল চাই। নির্মাণকার্যের জন্যে কতটা সময় লাগবে সে-সম্পর্কেও ধারণা থাকা দরকার। প্রত্যেকটি হিসেবের মধ্যেই জটিলতা আছে। পিরামিডের একটি ঢালু ধার গেঁথে তুলতে হলে কতগুলো পাথর চাই বা একটি দেওয়াল গেঁথে তুলতে হলে কতগুলো ইট চাই—এসব হিসেব সাধারণ যোগ-বিয়োগের ব্যাপার নয়। শস্যের গোলা কখনো হত নলের মতো, কখনো পিরামিডের মতো। কাজেই একটা হিসেবের ব্যবস্থা থাকা দরকার যে নলাকৃতি বা পিরামিডাকৃতি গোলা থেকে কি-পরিমাণ শস্য পাওয়া যেতে পারে। মিশরে পিরামিড তৈরির ব্যাপারটার সঙ্গে অনেকগুলো কুসংস্কার জড়িত ছিল। পুরো পিরামিডটি তুলতে কোন্ আকারের ঠিক কতগুলো পাথরের চাঁই দরকার সেই সংখ্যাটি নির্ভুলভাবে হিসেব করে নিতে হত—একটি কম বা একটি বেশি হলে চলত না। আরো নানা ধরনের হিসেবের প্রয়োজন ছিল। খাজনা ধার্য করার জন্যে চাষের জমির ক্ষেত্রফল হিসেব করতে হত। চাষের জমি সবসময়ে আয়তাকার হত না, ফলে নানান ধরনের জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান করতে হয়েছিল। পোড়ামাটির পাত্রের গায়ে বা অন্যত্র যে-সব অলংকরণ করা হত তার মধ্যেও জ্যামিতিক জ্ঞানের পরিচয় ছিল। তার মানে, গণিত বলতে বোঝাত বাস্তব জীবনের কতগুলো সত্যিকারের সমস্যাকে কি প্রক্রিয়ায় সমাধান করা যেতে পারে তারই দৃষ্টান্ত—কতগুলো নিয়ম ও সূত্রের স-দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা নয়।

আবার এই বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদ থেকেই আকাশের গ্রহ-

নক্ষত্রের গতিবিধিকে খুঁটিয়ে লক্ষ করতে হয়েছিল। কৃষির তাগিদে মিশরে ক্যালেণ্ডার আবিষ্কার হয়েছিল তা আমরা আগে আলোচনা করেছি। সমুদ্রে যাতায়াত করতে হলেও গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার। তাছাড়া প্রায় প্রত্যেকটি আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে গ্রহনক্ষত্রের কোনো না কোনো সম্পর্ক ছিল।

নগর-জীবনের ধরনটাই এমন যে শুধু দিন গুনে গুনে বছরের হিসেবটা জানা থাকলেই কাজ চলে না। দিন ও রাত্রিকেও ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নিতে হয়। এই প্রয়োজনের তাগিদ থেকেই ঘড়ির আবিষ্কার। ঘড়ি মানে এমন কিছু একটা উপায় যাতে সময় সম্পর্কে ধারণা হতে পারে। দিনের বেলা হয়তো একটা ছায়ার মাপ, রাত্রিবেলা হয়তো একটা ফুটো পাত্র থেকে বেরিয়ে যাওয়া জলের পরিমাণ। যা হোক একটা উপায়।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য আরেকটি বিদ্যার চর্চাও রীতিমতো শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই বিদ্যাটিকে বলা যেতে পারে ভেষজবিদ্যা। শেকড়-লতা-পাতা থেকে ওষুধ তৈরির চেষ্টা। নানান ধরনের জাদুক্রিয়া অবশ্যই এর সঙ্গে জড়িত ছিল। কারণ সে-সময়ে যে-কোনো ধরনের শারীরিক অসুখকে মনে করা হত দুষ্ট-আত্মার নজরের ফল।

শল্যবিদ্যার (surgery) চর্চাও শুরু হয়েছিল।

এ-সমস্ত বিদ্যার অধিকারীরা এক নগর থেকে অন্য নগরে যাতায়াত করত। ফলে একদেশের বিদ্যা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।
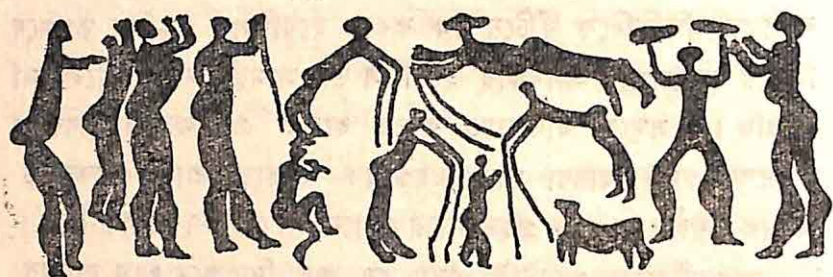
প্রাচীন সমাজ

এবার আমরা এসে দাঁড়িয়েছি লিখিত ইতিহাসের সিংহদ্বারে। মানুষের ঠিকানার হদিশ পাবার জন্যে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা প্রধানত নির্ভর করেছিলাম জীবাশ্ম-বিদ্যা (palaeontology), প্রত্নবিদ্যা (archaeology), নৃবিদ্যা (anthropology) ও ভূবিদ্যার (geology) ওপরে। পুরাবৃত্তকেও আমরা বাতিল করি নি। মানুষের ঠিকানার হদিশ পাবার জন্যে আমরা সম্ভবমতো সমস্ত বিদ্যার ক্ষেত্রে পথ হাতড়েছি। কিন্তু এই সিংহদ্বারে পৌঁছে লিখিত ইতিহাসের পাকা সড়ক পাওয়া যাচ্ছে। পথ হাতড়াবার প্রয়োজন আর নেই। আমাদের যাত্রাও আপাতত এখানে শেষ। কিন্তু তার আগে এই লিখিত ইতিহাসের সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে পেছনদিকে আরেকবার ফিরে তাকাব। মানুষের ঠিকানার যতোটুকু হদিশ আমরা পেয়েছি তার গোটা চেহারাটা আরেক বার চোখের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

আগে বলেছি, নৃবিজ্ঞানী মর্গান মানুষের কাহিনীকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন : বন্য, বর্বর ও সভ্য। বন্য ও বর্বর দশার তিনটি করে স্তর : নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ। আমরা জেনেছি যে আদিম অবস্থা থেকে মাটির পাত্র তৈরি করতে শেখা পর্যন্ত বন্য দশা আর মাটির পাত্র তৈরি করতে শেখা থেকে লিপি-আবিষ্কার পর্যন্ত বর্বর দশা। আমরা আলোচনা শুরু করব বর্বর দশার নিম্ন স্তর থেকে।

ক্লান ও ট্রাইব

আমরা আগে আলোচনা করেছি বেঁচে থাকার তাগিদেই মানুষকে জোট বাঁধতে হয়েছিল। জোট বা দল। কিন্তু কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে দল বাঁধবে? মর্গানের গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, সে-সময়ে মানুষ দল বেঁধেছিল জ্ঞাতি-সম্পর্কের ভিত্তিতে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জ্ঞাতি, একই পূর্বপুরুষ থেকে তাদের জন্ম। মর্গান এমনি এক-একটি দলের নাম দিয়েছিলেন জেন্‌স (gens)। মর্গানের পরের যুগের নৃ-বিদরা জেন্‌স শব্দের বদলে ক্লান (clan) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ক্লান শব্দটিই চলছে।

সাধারণ জন্তুজানোয়ারের নাম থেকেই ক্লানের নাম হত। যেমন, ভালুক, নেকড়ে, হরিণ, কাছিম ইত্যাদি। ফুল-লতা-পাতা থেকেও নাম হত। যেমন, সূর্যমুখী। এ-ধরনের নামকরণের মূলে যে-বিশ্বাসটি রয়েছে তাকে বলা হয় টোটেম-বিশ্বাস।

কয়েকটি ক্লান একসঙ্গে জোট বাঁধলে যে বড়ো দলটি গড়ে ওঠে তার নাম দেওয়া হয়েছে ট্রাইব (tribe)। আবার অনেকগুলো ট্রাইব মিলে আরো বড়ো একটি সংগঠন—তার নাম কন্‌ফেডারসি অব ট্রাইব্‌স।

সে-সময়ে মানুষের জীবনযাপনের ধরনটা কেমন ছিল তার একটা ছবি আঁকা চলে।

মানুষের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এক-একটি ট্রাইবের আস্তানার চারদিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে শুধু জঙ্গল। এই জঙ্গলে ট্রাইবের মানুষরা শিকার করে ও ফলমূল কুড়োয়। কাজের ভাগাভাগি বলতে এই যে পুরুষরা এক-ধরনের কাজ করে, স্ত্রীলোকেরা অন্য ধরনের। পুরুষরা শিকার করে, মাছ ধরে, দরকার পড়লে যুদ্ধ করে, হাতিয়ার বানায়। আর স্ত্রীলোকেরা করে ঘরের কাজ—রান্না, সেলাই ইত্যাদি। যার যার নিজস্ব হাতিয়ার। পুরুষরা দল বেঁধে শিকার করতে বেরোয়, কেননা দল না বাঁধলে সামান্য পাথরের হাতিয়ার নিয়ে জন্তুজানোয়ার শিকার করা কিছুতেই সম্ভব নয়। বাঁচার

তাগিদেই দল বাঁধা। কাজেই প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাহায্য করে, প্রত্যেকে প্রত্যেককে বাঁচায়। দল বেঁধে যা কিছু শিকার করে আনে তা সকলে মিলে ভোগ করে। জীবনধারণের উপায়গুলো এত প্রাথমিক ধরনের যে বাড়তি কিছুই হয় না, দিন-আনা-দিন-খাওয়ার মতো অবস্থা। আর সকলে মিলে যা কিছু তৈরি করে তা হয়ে ওঠে সকলের সম্পত্তি। যেমন, ঘর। যেমন, ডিঙি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু নেই। অবশ্য নিজের নিজের হাতিয়ার আছে সকলের। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মৃতব্যক্তির হাতিয়ারও কবরে স্থান পায়। বাস্তব অবস্থাটাই এমন নয় যে ব্যক্তিগত স্বার্থ বলে কিছু থাকতে পারে। কাজেই স্বার্থ নিয়ে দলাদলি-মারামারিও নেই। সকলেরই সমান অবস্থা—কেউ কারও প্রভু নয়, কেউ কারও দাস নয়। অন্য কোনো ট্রাইবের সঙ্গে যদি যুদ্ধ বাধে তাহলে সে-যুদ্ধ শেষ হয় যে-কোনো একপক্ষের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মধ্যে বা অন্যপক্ষের দলভুক্ত হয়ে যাওয়ার মধ্যে। কারণ দিন-আনা-দিন-খাওয়ার অবস্থায় পরাজিত শত্রুকে প্রাণে বাঁচানোর কোনো অর্থ হয় না বা মানুষকে 'দাস' করার কোনো সুযোগ নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ট্রাইবাল সমাজে প্রভু-ভৃত্য বা শাসক-শাসিত সম্পর্ক সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তিও সম্ভব নয়।

এ-ধরনের সমাজকে বলা হয় আদিম সাম্য সমাজ।

কাজের ভাগাভাগি

বর্বর দশার মধ্য স্তরটি শুরু হয়েছে চাষবাস বা পশুপালন করতে শেখা থেকে। এই স্তরে এসেই প্রথম দেখা যাচ্ছে, সকলে মিলে একধরনের কাজ আর নয়—আলাদা আলাদা দলের আলাদা আলাদা কাজ। পশুপালনের কথাই ধরা যাক। পশ্চিম এশিয়ার যে-সমস্ত ট্রাইব পশুপালন করতে শিখেছিল, তাদের সঙ্গে অন্যান্য ট্রাইবের

একটা তফাত এসে গেল। পশুপালক ট্রাইব্‌রা যেমন প্রচুর পরিমাণে দুধ পেত, তেমনি পেত মাংস, চামড়া ও পশম। দিন-আনা-দিন-খাওয়ার অবস্থা আর রইল না, ভবিষ্যতের সংস্থান হিসেবে একটা জীবন্ত ভাঁড়ার হাতের মুঠোয় এসে গেল। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে এই অবস্থার মধ্যেই এক ট্রাইবের সঙ্গে অন্য ট্রাইবের লেনদেন শুরু হয়েছিল।

পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল বাগিচা-চাষ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরো কতকগুলো বৈপ্লবিক আবিষ্কার হয়েছিল। যেমন, তাঁতে কাপড় বোনা, আকর গলিয়ে ধাতু তৈরি করা, ধাতুর হাতিয়ার তৈরির কারিগরি বিদ্যা আয়ত্ত করা। সোনা, রুপো ও মণিমুক্তোর অলংকার ব্যবহারও এ-সময় থেকে শুরু।

সব মিলিয়ে রীতিমতো একটা সমৃদ্ধির অবস্থা। কেউ পশুপালন করছে, কেউ চাষ করছে, কেউ শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি করছে। দিন-আনা-দিন-খাওয়ার অবস্থা আর নেই, এখন নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও উদ্বৃত্ত থাকে। আগে মানুষের মেহনত কোনো রকমে খাওয়া-পরার প্রয়োজনটুকু মেটাতে পারত আর এখন জীবনধারণের উপায় উন্নত হয়ে ওঠার ফলে মানুষের মেহনত শুধু খাওয়া-পরার প্রয়োজনই মেটায় না, উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে। ফলে, যুদ্ধবন্দীদের প্রাণে না মেরে দাস করে তোলার একটা অবস্থা তৈরি হয়ে যায়।

এই সময় থেকেই মানুষের সমাজে দুটি আলাদা শ্রেণী দেখা দিয়েছিল : প্রভু ও দাস, শোষক ও শোষিত। আদিম সাম্য সমাজের জায়গায় শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ।

ক্লান থেকে পরিবার

এতদিন পর্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু ছিল না। এবারে এই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে সম্পত্তির ওপরে ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম

হল। চাষবাস ও পশুপালনের যুগে মানুষের সবচেয়ে বড়ো সম্পত্তি ছিল চাষযোগ্য জমি ও গৃহপালিত পশু। এই সম্পত্তি হাতে আসার পরেই মানুষের মেহনতের উৎপাদন-ক্ষমতা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। অল্প মেহনতেই অনেক বেশি উৎপাদন হত। আগে পুরুষরা দল বেঁধে শিকার করতে বেরুত, এখন শিকার করাটা হয়ে দাঁড়াল নিতান্তই একটা বিলাসিতা। টুকরো টুকরো জমিতে আলাদা আলাদাভাবে চাষ করেও অনায়াসে সারা বছরের খাদ্য-সংস্থানের ব্যবস্থা হতে লাগল। তার ওপরে যদি দাস সংগ্রহ করা যায় তাহলে সমস্ত মেহনতের ব্যাপারটা দাসদের দিয়েই করানো চলে। আগে পশুপালন হত গোটা একটি ট্রাইবের মালিকানায়, এখন পশুপালনের ব্যাপারেও ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হল।

আর এই ব্যাপারটি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ঘরোয়া ক্ষেত্রেও স্ত্রী ও পুরুষের সম্পর্কটি আর আগের মতো থাকতে পারল না। কথাটা ব্যাখ্যা করা দরকার।

স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ককে বুঝতে হলে আসলে বিয়ের সম্পর্ককে বুঝতে হয়। বিয়ের সম্পর্ককে ঘিরেই অন্য সমস্ত সম্পর্ক। হালে আমরা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যে-ধরনের বিয়ের সম্পর্ক দেখি তা বরাবরকার নয়। প্রাগৈতিহাসিক কালে সম্পর্কটি অন্য ধরনের ছিল। তাও এক ধরনের নয়, অন্য নানা ধরনের।

প্রাগৈতিহাসিক কালের বন্য দশায় যে-ধরনের বিয়ের সম্পর্ক ছিল তাকে বলা হয় যৌথ বিয়ে বা গ্রুপ ম্যারেজ। বর্বর দশায় পেয়ারিং ফ্যামিলি, বা বাংলায় বলা যেতে পারে গান্ধর্ব বিয়ে।

আবার যৌথ বিয়ের মধ্যেও রকমফের আছে। যৌথ বিয়ে মানে একদল পুরুষের সঙ্গে একদল মেয়ের বিয়ে। কিন্তু একেবারে আদিম অবস্থায় এ-ব্যাপারে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। পুরুষ মাত্রেই স্বামী, মেয়ে মাত্রেই স্ত্রী। অন্য কোনো সম্পর্ক ছিল না।

অবশ্য যৌথ বিয়ের এই বাধানিষেধহীন পর্বটি খুব বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। পরের পর্বে এক আমলের কোনো পুরুষ বা মেয়ের সঙ্গে

পরের আমলের কোনো মেয়ে বা পুরুষের বিয়ে হতে পারত না। নইলে আর সবই আগের মতো। বাপ-মাদের আমলে পুরুষরা তেমনি স্বামী, মেয়েরা তেমনি স্ত্রী। ছেলে-মেয়েদের আমলেও আবার তেমনি সম্পর্ক। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এই পর্বে ভাই-বোন সম্পর্কটি গড়ে ওঠে নি।

ভাই-বোন সম্পর্কটি গড়ে উঠেছিল যৌথ বিয়ের তৃতীয় পর্বে এসে। যদিও ব্যাপারটা সেই একই—একদল পুরুষের সঙ্গে একদল মেয়ের বিয়ে। কিন্তু এই বিয়ের সম্পর্কটি ভাইবোনের মধ্যে কিছুতেই হতে পারত না। গোড়ার দিকে এক-মায়ের পেটের ভাইবোনদের মধ্যে, শেষের দিকে জ্ঞাতি-ভাইবোনদের মধ্যেও। অর্থাৎ, একদল পুরুষের সঙ্গে একদল মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, পুরুষরা পরস্পরের ভাই হতেও পারে নাও হতে পারে, মেয়েরা পরস্পরের বোন হতেও পারে নাও হতে পারে—কিন্তু পুরুষদের দলের কারও বোন মেয়েদের দলে নেই, মেয়েদের দলের কারও ভাই পুরুষদের দলে নেই।

যৌথ বিয়ের শেষ পর্বেই বিয়ের সম্পর্কের সীমানাটা এত ছোট হয়ে গিয়েছিল যে কোনো কোনো পুরুষ ও মেয়ে হয়তো আলাদা-ভাবে জোড় বাঁধত। বর্বর দশায় এসে দেখা গেল, এভাবে আলাদা আলাদা জোড় বাঁধাটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো পক্ষেরই বাধ্যবাধ্যকতা নেই। যে কোনো সময়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতে পারে। ছাড়াছাড়ি হবার সময়ে ছেলেমেয়েরা মায়ের ভাগে পড়ে, হাতিয়ার ও জমিজমা বাপের ভাগে।

যৌথ বিয়ের সমস্ত পর্বেই বংশ-পরিচয় হত মায়ের দিক থেকে। গান্ধর্ব বিয়ের সময়েও এই রীতি বজায় ছিল।

আমরা যে-সময়ের কথা আলোচনা করছি তখনো সম্পত্তির ওপরে ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হয় নি। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াত ? বাপের সম্পত্তি ছেলে কিছুতেই পেত না, কারণ বাপ ও ছেলের বংশ আলাদা। সম্পত্তি পেত বাপের বংশের লোক—অর্থাৎ বাপের ভাইরা বা বোনরা বা বোনের ছেলেমেয়েরা

(যেহেতু বোনের ছেলেমেয়েদের বংশ তাদের মায়ের দিক থেকে—অর্থাৎ, মামা ও ভাগনে-ভাগনীদের একই বংশ), বাপের ভাইদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু নয় (যেহেতু এই ছেলেমেয়েদের বংশ তাদের মায়ের দিক থেকে, কাজেই আলাদা বংশের)। মায়ের দিক থেকে বংশ-পরিচয় হবার ফলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারে এই যে মায়ের দিকের প্রাধান্য—এই অবস্থাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'মাদার-রাইট'। শব্দটি বাংলাতেও চলে গেছে।

সম্পত্তির ওপরে ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হবার অবস্থায় পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত প্রাগৈতিহাসিক কালের স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ককেও আমরা এই শব্দটির সাহায্যে বোঝাতে পারি। 'মাদার-রাইট'।

কিন্তু যে-কথাটা আগে বলেছি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবস্থায় পৌঁছে এই সম্পর্ক একেবারে পাল্‌টে গিয়েছিল। 'মাদার-রাইট' ঘুচে গিয়ে কায়েম হয়েছিল 'ফাদার-রাইট'।

আসলে এই সম্পর্কটি নির্ভর করে জীবনযাত্রার পদ্ধতির ওপরে। এতদিন পর্যন্ত পুরুষরা শিকার করত মেয়েরা ফলমূল কুড়োত ও ঘরের কাজ করত। ঘরের কাজ বলতে একটি বড়ো কাজ ছিল বাচ্চাদের দেখাশোনা করা, তাছাড়া ছিল রান্না, সেলাই ও পোড়া-মাটির পাত্র তৈরি করা, কাপড় বোনা এবং শেষের দিকে বাগিচা ধরনের চাষ করা। অর্থাৎ জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় অনেক-গুলো জরুরি উপকরণ তৈরি হত মেয়েদের হাতে। এ-অবস্থায় নিজস্ব এলাকায় মেয়েদের আধিপত্য ও প্রাধান্য খর্ব হবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না।

কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার অবস্থায় পৌঁছে দেখা যাচ্ছে, জীবন-ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত উপকরণ তৈরি হচ্ছে পুরুষদের হাতে। জমির মালিক পুরুষ, গৃহপালিত পশুপালের মালিক পুরুষ, পশু-টানা লাঙল চালিয়ে চাষ করে পুরুষ, কামার-কুমোর-ছুতোর সবাই পুরুষ। এমনকি দাসদের প্রভুও পুরুষ।

এ-অবস্থায় কি ঘরে কি বাইরে পুরুষই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। অবশ্য কাজ-ভাগাভাগিটা সেই আগের মতোই থেকে যায়—পুরুষরা বাইরের কাজ, মেয়েরা ঘরের। কিন্তু আগেকার মতো ঘরের কাজ করা সত্বেও মেয়েদের প্রাধান্য খর্ব হয়েছিল। কারণ, বেঁচে থাকার জন্যে যে-সমস্ত উপকরণ দরকার তা সবই তৈরি হচ্ছিল পুরুষদের হাতে। মেয়েদের সব ব্যাপারেই পুরোপুরি নির্ভর করতে হত পুরুষদের ওপরে। ফলে মেয়েদের অবস্থা হয়ে উঠেছিল অনেকটা দাসীর মতো। পুরুষদের মর্জিমতো তাদের চলতে হত।

সম্পত্তির ওপরে ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হবার পরে বিয়ের সম্পর্কটাও একটা নতুন চেহারা নিতে লাগল, যে-চেহারা এখনো পর্যন্ত বজায় আছে। এই নতুন সম্পর্ককে বলা চলে এক-বিবাহের সম্পর্ক। এই কাঠামোর মধ্যে ক্লানের অস্তিত্ব বজায় থাকা সম্ভব নয়। থাকেও নি। গড়ে উঠেছিল ফ্যামিলি বা পরিবার।

ট্রাইব থেকে রাষ্ট্র

এদিকে মস্ত মস্ত নগর গড়ে উঠছিল। ইটের বা পাথরের তৈরি বাড়ি, মস্ত মস্ত দালান, উঁচু উঁচু গম্বুজ এবং আরো অনেক কিছু। মানুষের সম্পদ ক্রমেই বাড়ছিল কিন্তু সবই ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায়। বাড়ছিল কারিগরি দক্ষতাও যার নিদর্শন হিসেবে তৈরি হচ্ছিল হরেক রকমের পোড়ামাটির পাত্র, ধাতুর তৈরি হাতিয়ার, তাঁতে বোনা কাপড় ও কাঠের তৈরি আসবাব। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছিল আরো একটা নতুন ধরনের কাজ-ভাগাভাগি। কারিগরের কাজ আর চাষের কাজ। দুয়ের মধ্যে আর কোনো সম্পর্ক রইল না। কারিগর ও চাষী—মেহনতী মানুষ দু'দলে ভাগ হয়ে গেল।

দাস-প্রথা অনেক আগেই শুরু হয়েছিল, এবার তা কায়েম হয়ে বসল। লেনদেনের ব্যবস্থা পুরোপুরি বাণিজ্যের রূপ নিল।

শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল জমি দখলের জন্যে মারামারি হানাহানি। লুটপাট সমানে চলতে লাগল। যার যতো বেশি জোর তার ততো বেশি প্রভুত্ব। এই অবস্থারই চূড়ান্ত রূপ রাজতন্ত্র। পুরনো ট্রাইবাল সমাজের আর কোনো চিহ্ন রইল না। জোর-জবরদস্তি, লুটপাট, পররাজ্য গ্রাস, পরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, মানুষকে দাসত্ব করতে বাধ্য করা—এমনি একটা অবস্থা ক্রমশ কায়েম হয়ে বসতে লাগল। একদল লোক ক্রমশই বিত্তবান হয়ে উঠতে লাগল, আরেক দল ক্রমশই বিত্তহীন। ট্রাইবাল সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সহযোগিতা ও সমান অধিকারের ভিত্তিতে, আর নগর-ব্যবস্থায় প্রভুত্ব ও দাসত্বের ভিত্তিতে।

সমাজের চেহারা এমনভাবে পাল্টে যাবার মূলে যে-ব্যাপারটি রয়েছে তা হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানা। কথাটা ভালো করে বোঝা দরকার।

বেঁচে থাকতে হলে কতকগুলো উপকরণ দরকার, এই উপকরণগুলো তৈরি করার জন্যে কতকগুলো উপায়। উপায় বলতে তীর-ধনুক-বর্শা বা এমনি ধরনের হাতিয়ারকেই শুধু বোঝাচ্ছে না, যে-জঙ্গলে পশু শিকার করা হয় সেই জঙ্গলটিকেও বোঝাচ্ছে, যে-নদীতে মাছ ধরা হয় সেই নদীটিকেও বোঝাচ্ছে, ইত্যাদি। নগর-ব্যবস্থার আমলেও তেমনি উপকরণ তৈরি করার উপায় বলতে বুঝতে হবে একদিকে নানান ধরনের হাতিয়ার অন্যদিকে চাষের জমি, গৃহপালিত পশু, আকরিক ধাতুর খনি ইত্যাদি। কিন্তু নগর-ব্যবস্থার আমলে এসে দেখা যাচ্ছে, উপকরণ তৈরি করার উপায়গুলো ব্যক্তিগত মালিকানায় চলে এসেছে।

এই নতুন ব্যবস্থার উদ্ভব হবার মতো বাস্তব অবস্থাটিও ঠিক এই সময়েই তৈরি হয়েছিল। এতদিন একজন মানুষের মেহনত যা-কিছু

উপকরণ তৈরি করত তা কোনো রকমে তার নিজের চাহিদাটুকু মেটাতে পারত মাত্র। কিন্তু কৃষি ও পশুপালন শুরু হবার পরেই দেখা গেল, মানুষের মেহনত উদ্বৃত্ত তৈরি করছে। অর্থাৎ, নিজের প্রয়োজন মেটাবার পরেও কিছুটা বাড়তি থেকে যায় এবং এই বাড়তি অংশটুকু অপর একজন আত্মসাৎ করতে পারে। এই বাস্তব অবস্থার মধ্যেই দাসপ্রথার সূত্রপাত।

ব্যক্তিগত মালিকানার ফলে একটি নতুন লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত যে-মানুষ উপকরণ তৈরি করত সে-মানুষই তা খরচ করত। কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্য শুরু হবার পরে উপকরণগুলো হয়ে উঠল পণ্য। অর্থাৎ উপকরণগুলোকে ব্যবহার করা হত অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে বিনিময়ের জন্যে। এক্ষেত্রে যে-মানুষ উপকরণ তৈরি করত, সে খরচ করার মালিক নয়। এমনকি তার পক্ষে জানাও সম্ভব হত না শেষ পর্যন্ত কোথায় কি-ভাবে তার তৈরি উপকরণ খরচ হচ্ছে। এই অবস্থা চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত মানুষের সমস্ত তৎপরতার লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল পণ্য তৈরি করা। যতো বেশি পণ্য তৈরি হত ততোই পণ্যের মালিকরা ব্যবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে বিত্তবান হয়ে উঠত, ততোই মেহনতী মানুষ বিত্তহীন হত।

এই অবস্থাটি যাতে বজায় থাকে সেজন্যে কতগুলো নিয়মকানুন তৈরি করার প্রয়োজন হয় এবং নিয়মকানুনগুলো যাতে সবাই মেনে চলে সেজন্যে বিশেষ একটা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাটির নাম রাষ্ট্র। অর্থাৎ, সৈন্যসামন্ত মজুদ রাখা, আইন-অমান্যকারীকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা রাখা, ইত্যাদি। তার মানে আমরা বলতে পারি, ব্যক্তিগত মালিকানা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের উদ্ভব ও ট্রাইবাল সমাজের বিলুপ্তি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঐতিহাসিক কালটি শুরু হচ্ছে তিনটি মূল লক্ষণ নিয়ে—পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্র। আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত এই তিনটি লক্ষণই পুরো মাত্রায় বজায় আছে।

তবে সমগ্রভাবে মানুষের ইতিহাসের দিকে তাকালে বোঝা যায়, প্রথম ও তৃতীয় লক্ষণটি এখনো বেশ কিছুকাল বজায় থাকবে কিন্তু দ্বিতীয় লক্ষণটি লোপ পেয়েছে বা পেতে চলেছে।

আমাদের এতক্ষণের আলোচনা থেকে একথাটি স্পষ্ট হয়েছে যে মানুষের সমাজ কোনো সময়েই স্থাণু হয়ে থাকে নি। অনবরত বদলেছে এবং ক্রমেই উন্নত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সমাজের এই অদল-বদল সব জায়গাতে একধরনের নয়। বইয়ের শুরুতে যখন আমরা মর্গান সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম তখন সমাজের এই ক্রম-বিকাশের তুলনা করেছিলাম সিঁড়ির ধাপের সঙ্গে। মর্গান নিজে তাঁর বক্তব্যকে যে-ভাবে উপস্থিত করেছেন তা বুঝতে হলে এই উপমাটি অ-যথার্থ নয়। কিন্তু পরবর্তীকালের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে যে সমাজের ক্রমবিকাশ সিঁড়ির ধাপের মতো এতখানি ধরাবাঁধা নয়। যদি কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করতেই হয় তাহলে তুলনা করা চলে গাছের সঙ্গে। একটি চারাগাছ যখন বড়ো হয় তখন তার মধ্যে নিশ্চয়তা শুধু এটুকু যে চারাটি বড়ো হচ্ছে। কিন্তু ঠিক কি-ভাবে বড়ো হয়ে উঠবে—কোনাকুনি না সিধে—কোথায় কোথায় ডাল মেলবে, কোথায় কোথায় পাতা—এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। তবে যেদিকেই বাঁক নিক, যেভাবেই ডালপালা মেলুক, সব কিছুর মোট ফল হচ্ছে গাছটির আরো বড়ো হয়ে ওঠা, আরো উন্নত হওয়া। মানুষের সমাজের বেলাতেও একই কথা।

কাজেই মানুষের সমাজের ক্রমবিকাশের কাহিনীটিকেও যতো বিস্তারিতভাবেই বলার চেষ্টা করা যাক না কেন, সবসময়েই তার বাইরে কিছু না কিছু বক্তব্য থেকে যাবে। এমনকি যতোটুকু বলা যাচ্ছে তার মধ্যেও সবসময়েই কিছু না কিছু ফাঁক। মানুষের সমাজ একফোঁটা জল নয় যে তাকে পুরোপুরি বিশ্লেষণ করে রসায়নের বাঁধা ফরমুলায় তুলে ধরা সম্ভব। আর আমরা আলোচনা করছি

প্রাগৈতিহাসিক কালের সমাজ নিয়ে, যে কালের হদিশ কোনো লিখিত দলিলে নেই।

প্রাগৈতিহাসিক কালের কথা বলতে গিয়ে এই বইয়ে আমরা বিশেষভাবে প্রত্নবিদ্যার ওপরে নির্ভর করেছি। এতে ভুল ধারণা হবার অবকাশ খুবই কম। কিন্তু এই বিদ্যার ভাঁড়ারেও এতবেশি মালমসলা নেই যা দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক কালের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি আঁকা চলে। যেমন ধরা যাক দাসপ্রথা। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক কালের দাসপ্রথার সমর্থনে সুনিশ্চিত সাক্ষ্য নেই। 'সুনিশ্চিত' কথাটা লক্ষ করতে বলছি। এমন নিদর্শন একাধিক আছে যাতে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কটি বোঝা যায় কিন্তু এই ভৃত্যটি সত্যিকারের 'দাস' কিনা তা সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না। লৌহযুগ শুরু হবার আগে পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে দাসপ্রথা সম্পর্কে এমনি একটা অনিশ্চয়তা। আবারও বলছি, অনিশ্চয়তা, কিন্তু অস্বীকৃতি নয়। এমনি দৃষ্টান্ত আরো আছে। যেমন, সমাজের বিশেষ এক অবস্থায় মেয়েদের আধিপত্যের ব্যাপারটি। প্রাগৈতি-হাসিক কালের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে এখনো পর্যন্ত এর সপক্ষে সুনিশ্চিত সাক্ষ্য নেই।

যে কথাটা আমরা বলতে চাইছি তা এই যে মানুষের সমাজের অগ্রগতি সরল সিধে ও জটিলতাবর্জিত নয়। বিশেষ একদল মানুষের সমাজ যে-বিশেষ রাস্তাটি ধরে এগিয়েছে, বিশেষ আরেকদল মানুষের সমাজকে হুবহু সেই রাস্তাটি ধরেই এগোতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কথাটা উলটো দিক থেকেও সত্যি। কোনো একটি সমাজ যে-বিশেষ রাস্তা ধরেই এগিয়ে চলুক না কেন, এমন কতকগুলো মোড় আছে যা তাকে পার হতেই হবে, আগের মোড়টি পার না হয়ে পরের মোড়ে কিছুতেই পৌঁছনো সম্ভব নয়। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সভ্য দশায় পৌঁছতে হলে কৃষি ও পশুপালন অবশ্যই শুরু হওয়া চাই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে নূতন প্রস্তরযুগের প্রত্যেকটি সমাজেই কৃষি ও পশুপালন মুখ্য তৎপরতা হয়ে উঠেছিল। এমন

সমাজেরও নিদর্শন আছে যারা কৃষি ও পশুপালন শুরু করার পরেও প্রধানত শিকার করা ও মাছ ধরার ওপরেই নির্ভর করত। এমনি দৃষ্টান্ত আরো আছে। যেমন, চাকাওলা গাড়ি। মিশরে সভ্যদশা শুরু হবার একহাজার বছর পরে চাকাওলা গাড়ির প্রচলন হয়েছিল। যেমন, লাঙল। এমন সমাজের নিদর্শন আছে যারা সভ্যদশায় পৌঁছবার পরেও লাঙল আবিষ্কার করতে পারে নি।

অর্থাৎ, এই বইয়ে আমরা মানুষের ঠিকানার মোটামুটি একটা ছক্ তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। বন্য-জীবন থেকে নগর-জীবনে পৌঁছতে মানুষ কোন কোন মোড় পার হয়েছে, কি কি হাতিয়ার বানিয়েছে, কেমন সব সংগঠন গড়ে তুলেছে—তার একটা হদিশ। তবে মনে রাখা দরকার যে এখনো পর্যন্ত আমাদের হাতে এতবেশি মালমসলা নেই যা দিয়ে মানুষের পুরো ঠিকানাটি মানচিত্রের মতো দেগে দেওয়া সম্ভব। তবে যতোটুকু আভাস পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে মানুষের কৃতিত্বের কথা এই যে মানুষ মানুষ হতে পেরেছে, আর সম্ভাবনার কথা এই যে মানুষ আরো বড়ো মানুষ হয়ে উঠবে।

গ্রন্থপঞ্জী

(যে-সব বই থেকে বিশেষভাবে সাহায্য নিয়ে এই বইটি লেখা)

1. Man in Search of His Ancestors—Andre Senet
2. History of the Primates—Sir Wilfrid Le Gros Clark, F. R. S.
3. The Origin of Man—Mikhail Nesturkh
4. How Man Became a Giant—M. Ilin & E. Segal
5. The Role of Labour in the Evolution from Ape to Man—F. Engels
6. Science in History—J. D. Bernal
7. Man Makes Himself - Gordon Childe
8. The Story of Tools— "
9. What Happened in History— "
10. New Light on the Most Ancient East— "
11. Social Evolution— "
12. The Wonder that was India—A. L. Basham
13. Pre-historic India—Stuart Piggot
14. The Origin of Family, Private Property and the State—F. Engels

অমল দাশগুপ্ত

মানুষের ঠিকানা